স্ব-নির্বাচিত গল্প

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

স্ব-নির্বাচিত গল্প

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ
৯৩, হারিসন রোড, কলিকাতা ৭

প্রথম সংস্করণ
৭ই শ্রাবণ, ১৩৬২

চার টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীত্রিদিবেশ বসু, বি. এ.
কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১১, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন, কলিকাতা ৬

উৎসর্গ

শ্রীমান আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়
কল্যাণীয়েষু

স্ব-নির্বাচিত আমার এই গল্প-সংগ্রহ পুস্তকের একটি ভূমিকা লিখতে হবে। গল্প লেখা হয়ত-বা সহজ, কিন্তু তার ভূমিকা লেখা শক্ত।

গল্প নির্বাচনের সকল দায়িত্ব লেখকের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রকাশক নিশ্চিন্ত হয়েছেন। এতে প্রকাশকের দায়িত্ব কমেছে, কিন্তু লেখকের দুর্ভাবনা বেড়েছে।

তবে নির্বাচন করবার সম্পূর্ণ স্বাধীনতার মূল্যও বড় কম নয়। সেখানে আর কিছু না থাক, আনন্দ আছে।

পাঠকের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে নিজেকে ধরে' দেবার আনন্দ!

আগেকার দিনে এমনি করে' ধরে' দেওয়ায় ধরা পড়ার ভয় ছিল। কারণ ঝাড়াই-করা সৎ-সাহিত্যই ছিল তখনকার দিনে সাধু সাহিত্যিকের বিচারের মাপকাঠি। বর্তমান কালে পাঠকের সে কার্পণ্য দৃষ্টির মনোবৃত্তি গেছে বদলে। পাঠকের দৃষ্টি এখন অনেকখানি স্বচ্ছ - অনেকখানি উদার।

তাই শুধু লেখা নয়, লেখার সঙ্গে
সে পড়তে চায় লেখককে। দেখতে চায় তার
সামগ্রিক রূপ। শুধু সবলতার মহিমা নয়,—
দুর্বলতার চিহ্নও।

আলোকে দেখতে হলে তার ছায়াকে
দেখতে হয়। নইলে আলোর পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না।

কাজেই নিঃসঙ্কোচ এই নির্বাচন।

বিধাতার আনন্দের সৃষ্টি এই যে জগৎ - আমাদের
চোখের সুমুখে দেখতে পাচ্ছি, তারই অনুকরণে মানুষ তার হৃদয়ের
ভাবকে বহু বিচিত্ররূপে প্রতিনিয়ত প্রকাশ করবার চেষ্টা করছে।
এই চেষ্টা বিচিত্র চেষ্টা।

কবি, শিল্পী, - মানবহৃদয়ের সেই চিরন্তন চেষ্টার
উপলক্ষ্য মাত্র। কারণ কবি শিল্পীর হৃদয়তন্ত্রীতে যে ঐক্যধ্বনি
সত্য। সৃষ্টিধর্মী সে হৃদয়বীণাতন্ত্রী যেন অন্তরের বীণা।
জগৎসৃষ্টির আনন্দসঙ্গীতের প্রতিটি মূর্ছনা সেখানে গিয়ে সহজে
স্পন্দিত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তরের মধ্যে জগৎসৃষ্টির অনুরূপ
একটি সৃষ্টির আবেগ তৈরি করে। সাহিত্য সেই আবেগের
প্রকাশ। শিল্পী-হৃদয়ের এই আনন্দসৃষ্টি ভাবাবেগের সেই

আদি সৃষ্টির প্রতিধ্বনি।

শিল্পী তার সৃষ্টিটিকে মনের রঙ দিয়ে রাঙায়, তার কল্পনা দেয় রূপ, হৃদয় দেয় রস, তারপর রূপে রসে সঞ্জীবিত হয়ে প্রকাশিত হয় সবার কাছে। যা ছিল তার নিজের, তা হয় সকলের। সামান্য হয়ে ওঠে অসামান্য। অল্পকালের বস্তু চিরকালের দিকে হাত বাড়ায়।

শিল্পী কিন্তু তার নিজের অগোচরে আপনার অন্তরের পরিচয় রাখে তার সৃষ্টির মধ্যে। ফুল যেমন তার নিজের পরিচয় দেয় গন্ধে।

সন্তান পায় পিতার চরিত্র।

বিভিন্ন শিল্পী-রচিত সাহিত্যের দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশভঙ্গী তাই ভিন্নতর রূপ পরিগ্রহ করে। এইখানেই সে স্বাধীন। এইখানেই সে স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

রাখাল-মাষ্টার

রাখাল-মাষ্টারকে লইয়া গল্প লেখা চলে কি-না কে জানে।

রাখাল-মাষ্টার ইস্কুলের মাষ্টার নয়—পোষ্টমাষ্টার।

আমি গল্প লিখি এবং সেই-সব গল্প কাগজে ছাপা হয় শুনিয়া অবধি রাখাল-মাষ্টার আমায় কত দিন কতবার যে তাহাকে লইয়া একটা গল্প লিখিয়া দিতে বলিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

একটি একটি করিয়া সে তাহার জীবনের প্রায় সমস্ত ঘটনাই আমাকে বলিয়াছে; কিন্তু সেগুলিকে পরের পর সাজাইয়া কেমন করিয়া যে গল্পের আকারে লিখিয়া ফেলিব তাহা আমি আজও ঠিক করিয়া উঠিতে পারি নাই।

এই বলিয়া গল্পটি একবার আরম্ভ করিয়াছিলাম:

দেখিতে নাদুস-নুদুস হ্যালা-ক্যাবলা গোছের চেহারা, চোখে নিকেলের ফ্রেম দেওয়া চশমা, মাথার চুলগুলি ছোট-ছোট করিয়া কাটা,—রাখালকে দেখিলে ঠিক পাগল বলিয়া মনে হয়।

এই পর্যন্ত শুনিয়াই ত' রাখাল-মাষ্টার চটিয়া আগুন!

বলিল, 'না তোকে লিখতে হবে না বাপু, যা। মিছে কথা বানিয়ে বানিয়ে···এমনি করেই লিখিস তোরা তা আমি জানি।'

বলিয়া খানিকক্ষণ মুখ ভারি করিয়া বসিয়া থাকিয়া চশমার ফাঁকে একবার চোখ দুইটি তুলিয়া বলিল, 'যা বাপু যা, তুই এখন বিরক্ত করিস্ নে। আমার হিসেব ভুল হয়ে যাবে। বেরো তুই এখান থেকে।'

বলি, 'চটো কেন মাষ্টার, শোনোই না শেষ পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ, খুব শুনেছি।' বলিয়া কলমটা মাষ্টার তাহার কানে গুঁজিয়া রাখিয়া সোজাসুজি আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'পাগল কাকে বলে জানিস? না—অমনি লিখে দিলেই হলো!'

হাসিয়া বলিলাম, 'পাগল ত লিখিনি। লিখেছি পাগলের মত।'

'ওই একই কথা।' বলিয়া হাত নাড়িয়া আমাকে সে চুপ করাইয়া দিয়া বলিল, 'পাগল বলে কাকে জানিস? পাগল বলে—তোদের গাঁয়ের

ওই নিবারণ মুখুজ্যেকে। চব্বিশ ঘণ্টা বৌ আর বৌ। সেদিন বললাম, 'বলি—ওহে নিবারণ, বোসো, তামাক-টামাক খাও।' ঘাড় নেড়ে বললে, 'না ভাই, উঠি। বেলা হয়ে গেছে,—বৌ বকবে। ওই ওদের বলে পাগল। বুঝ্‌লি ?'

বলিয়া কান হইতে কলমটি আবার তাহার হাতে লইয়া নিশ্চিন্ত মনে মাষ্টার তাহার কাজ আরম্ভ করিতেছিল, হঠাৎ কি মনে হইল, আবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, 'মিছে কথা না লিখলে তোদের গল্প লেখা হয় না। তবে কাজ নেই বাপু লিখে, মিছে কথা আমি ভালবাসি না।'

* * * *

সেই দিন হইতে কিছুই আর লিখি নাই।

ধানের মাঠের উপর দিয়া প্রায় ক্রোশ-খানেক পথ হাঁটিয়া প্রকাণ্ড একটা বন পার হইয়া গ্রামের শেষে, গুটিকয়েক আমগাছের তলায়, ছোট্ট সেই পোষ্টাপিসটিতে প্রায়ই আমাকে যাইতে হয়।

কোনো দিন হয় ত দেখি,—দরজায় খিল বন্ধ করিয়া পোষ্টাপিসের মেঝের উপর তালপাতার একটি চাটাই বিছাইয়া রাখাল-মাষ্টার তাহার হিসাব লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। চারি দিকে কাগজ ছড়ানো,—উড়িয়া যাইবার ভয়ে কোনোটার উপর প্রকাণ্ড একটা মাটির ঢেলা, কোনোটার উপর আস্ত একখানা ইঁট, কোনোটা বা পায়ের নিচে চাপা-দেওয়া, মুখে বিরক্তির ভাব ; ঝড়-বাতাসের উদ্দেশ্যে যাহা মুখে আসিতেছে তাই বলিয়া অশ্লীল ভাষায় গালাগালি দিতেছে, আর আপন মনেই কাজ করিতেছে।

হাসি আর কিছুতেই চাপিয়া রাখিতে পারি না। অবশেষে অতি কষ্টে হাসি চাপিয়া বলি, 'ওহে মাষ্টার, দরজাটা একবার খুলবে না কি ?'

আর যায় কোথা !

ভিতর হইতে মাষ্টারের চীৎকার শোনা গেল,—'তা আবার খুলব না ! সময় নেই অসময় নেই······বেরো বলছি, পালা এখান থেকে, নইলে খুন করে ফেলব।'

বাস্—চুপ।

কাগজের খুস্ খুস্ শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে ভাবিলাম, আর-একবার ডাকি ; কিন্তু ডাকিতে হইল না।

জানলার কাছে খুট্ করিয়া শব্দ হইতেই তাকাইয়া দেখি, রাখাল-মাষ্টার কোমরে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

চোখাচোখি হইবামাত্র বলিয়া উঠিল, 'সাড়ে তের আনা পয়সার গোলমাল। বুঝলি? আসুক ব্যাটা পিওন, আমি তার চাকরির মাথাটি খেয়ে দিচ্ছি—ছাখ্।'

অত-সব দেখিবার অবসর তখন আমার নাই। সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, অতখানা পথ আবার আমায় একা ফিরিয়া যাইতে হইবে ; বলিলাম, 'দরজাটা একবার খোলো মাষ্টার, চিঠিপত্রগুলো দেখেই আমি চলে' যাব।'

কেন জানি না, হঠাৎ সে প্রসন্ন হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। ভিতরে ঢুকিলাম। সেদিনের ডাকের চিঠিপত্রগুলা ছিল একটা খাটিয়ার নিচে। রাখাল-মাষ্টার আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'দেখিস যেন আর কারও চিঠি নিস্‌নে।'

অবাক্ হইয়া তাহার মুখের পানে তাকাইলাম। এমন কথা সে আমায় কোনো দিন বলে না।

মাষ্টার বলিল, 'কত সব মজার মজার চিঠি থাকে তা জানিস? তুই ত' কোন্ ছার, খাম-টাম খোলা-টোলা পেলে এক-একদিন আমিই দেখি! দেখে আবার বন্ধ করে' দিই।—শুন্‌বি তবে? একদিন একটা মেয়ে লিখেছে—'

বলিয়া সে শতছিন্ন দড়ির খাটিয়াটির উপর চাপিয়া বসিয়া হয় ত' কোনও মেয়ের চিঠির গল্প আরম্ভ করিতেছিল। আমার মাত্র দু'খানি চিঠি। হাতে লইয়া বলিলাম, 'থাক। ও-গল্প তোমার আর-একদিন শুনব, আজ উঠি।'

'তা উঠবি বই-কি! নিজের কাজ সারা হয়ে গেছে ত'! বাস্—যা।' বলিয়া সে একরকম জোর করিয়াই আমার ঘাড়ে ধরিয়া দরজাটা পার করিয়া দিয়া আবার ভিতর হইতে খিল বন্ধ করিয়া দিল।

আর একদিন অমনি চিঠির খোঁজে ডাকঘরে গিয়াছি, দেখিলাম, দরজা বন্ধ। ভিতরে স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া সুরু হইয়াছে। তুমুল ঝগড়া।

কি লইয়া যে ঝগড়ার সূত্রপাত, বাহির হইতে কিছুই বুঝা গেল না।

রাখাল-মাষ্টার ক্রমাগত নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে, আর স্ত্রী বলিতেছে,—'না, তুমি সাধু নও, তুমি ভণ্ড, তুমি বদমাশ, তুমি শয়তান।'

অবশ্য মুখ দিয়া যে ভাষা তাহাদের অনর্গল বাহির হইতেছে তাহা শুনিলে কানে আঙ্.ল দিতে হয়। দু'জনেই সমান। যেমন স্বামী, তেমনি স্ত্রী। কেহই কম যান না।

নিতান্ত অসময়ে আসিয়া পড়িয়াছি। একবার ভাবিলাম, চলিয়া যাই, আবার ভাবিলাম, এতখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়া, 'ডাক' না দেখিয়াই বাড়ী ফিরিয়া গেলে আফসোসের আর বাকি কিছু থাকিবে না। 'যা থাকে কপালে।' বলিয়া কাশিয়া গলাটা একবার পরিষ্কার করিয়া লইয়া ডাকিলাম, 'মাষ্টার!'

উভয়েরই গলার আওয়াজ তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এত সহজে বন্ধ হইবে ভাবি নাই। দরজা খুলিয়া রাখাল-মাষ্টার মুখ বাড়াইয়া বলিল, 'ও, তুই! আয়, তোর আজ মেলা চিঠি।'

মাসের প্রথম। কয়েকখানা মাসিকপত্র আসিয়াছিল। হাতে লইয়া সেদিন আর দেরি না করিয়াই উঠিতেছিলাম। রাখাল-মাষ্টার বলিল, 'বোস, কথা আছে।'

বাধ্য হইয়া বসিতে হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কথা?'

মাষ্টার বলিল, 'শুনেছিস? ঝগড়া আমাদের?'

বলিলাম, 'শুনেছি। কিন্তু বুঝতে কিছু পারি নি।'

মাষ্টার তিরস্কার করিতে লাগিলেন—'বুঝ্.তে পারিস নি কি রকম? তুই না গল্প লিখিস?—এ ত' একটা কচি ছেলেতেও বুঝতে পারে।'

কি জবাব দিব বুঝিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মাষ্টার বলিল, 'শোন্ তবে। ও-হতভাগী যদি অমনি করে ত' ওর মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দেব না ত' কী করব?'

অন্তরাল হইতে মাষ্টার-গিন্নির কণ্ঠস্বর শোনা গেল: 'হ্যাঁ, তা আবার দেবে না! আ মরি মরি, কি গুণের সোয়ামী গো!'

'ওই শোন্!' বলিয়া আঙ্.ল বাড়াইয়া মাষ্টার বলিল, 'গলার আওয়াজ শুনেছিস? কাঠে যেন চোট মারছে।'

এবারেও গৃহিনী কি যেন বলিলেন, কিন্তু কথাটা ভাল বুঝা গেল না।

মাষ্টার তখন বলিতে লাগিলেন, 'শোন্ তবে আসল কথাটাই বলি। একদিন একটা খামের চিঠি—দেখলাম, মুখটা ভাল করে' আঁটা হয়নি। সরিয়ে রাখলাম। এই গাঁয়েরই চিঠি। নিতাই গাঙ্গুলী কয়লা-খাদে চাকরি

করে ; লিখেছে তার বৌএর কাছে। নিতাইএর বয়েস…এই তোদেরই বয়েসী হবে, ছোকরা বয়েস,—বৌটিও তেমনি। ভাবলাম, পড়েই দেখি না কি লিখেছে।—আঃ! সে কি লেখা রে! হ্যাঁ, বিয়ে করা সাত্থক! বৌকে যদি অমনি চিঠিই না লিখতে পারলাম…আর ওই ত্যাখ্ আমার বাড়ীতে—' বলিয়া মাষ্টার আর-একবার তাহার গৃহিণীর উদ্দেশে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, 'ওকে চিঠি লিখব কি,—বিয়ে করা ইস্তক আজ পর্যন্ত মুখে আমার লাথি-ঝাঁটাই মারছে। যেমন প্যাঁচার মত চেহারা, তেমনি গুণ! বলে কি না, 'হতভাগা, তোর সঙ্গে আমার বিয়ে না হ'লে আমি সুখী হতাম।' বলি তাই—'যা না বাপু, যেখানে খুশী তোর, চলে' যা, যাকে খুশী বিয়ে করগে যা, আমার হাড়টা জুড়োক।' কিন্তু ক্ষেমতা নাই। হেঁ-হেঁ! তখন বলে কি না—'হ্যাঁ যাব! মেয়েমানুষের যাবার পথ যে নেই রে পোড়ারমুখো! আমি মরব। মরে' ভূত হ'য়ে এসে তোর ঘাড় মটকাব দেখে' নিস্।' এই ত' বাক্যি।—যাক্, শোন্ তবে আসল কথাটাই শোন্!'

বলিয়া মাষ্টার একটা ঢোঁক গিলিয়া একবার এদিক্-ওদিক্ তাকাইয়া বলিল, 'নিতাইএর যেমন বুদ্ধি! দেখি, না, চিঠির ভেতর একখানা দশ টাকার নোট! বৌকে পাঠিয়েছে। ভাবলাম, নোটখানা দিই মেরে! ধরবার ছোঁবার ত' কিছু নেই। তখন আমার সংসারে যা কষ্ট রে, সে আর কি বলব। পঁচিশটি টাকা মাইনে। তাই থেকে বোনের তত্ত্ব পাঠালাম দশ টাকার,—বাকি পনেরটি টাকায় আর ক'দিন চলে! বাস্, নোটখানা সরিয়ে রেখে' খেতে গেলাম। খেতে বসে' ভাত আর রোচে না, হাত যেন মুখে আর উঠতেই চায় না। খালি-খালি ওই নোটটার কথাই মনে হয়। বলি,—না বাবা, এ অস্বস্তিতে কাজ নাই। আধ-খাওয়া করে' উঠে পড়লাম। বৌ বললে, 'ওকি গো! এ আবার কি ঢং!' বললাম, 'থামো।' বাস্! তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে নোটখানা আবার তেমনি খামের ভেতর পুরে' আটা দিয়ে আঁটিয়ে নিজেই হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নিতাই গাঙ্গুলীর দরজায় গিয়ে ডাকলাম—নিতাইএর বৌকে। বৌ ছেলেমানুষ, কিছুতেই আসতে চায় না। বললাম, 'এসে ওই দরজার পাশে দাঁড়াও মা, তাহ'লেই হবে। আমি পোষ্টমাষ্টার।' নিতাইএর বৌ ঘোমটা টেনে' এসে' দাঁড়ালো। বললাম, 'এই নাও মা, তোমার চিঠি নাও। চিঠির ভেতর দশ-টাকার একটি নোট আছে।'—চিঠিখানি বৌ হাতে

করে' নিলে। বললাম, 'নিতাইকে বারণ করে' দিও বৌমা, এমন করে' টাকা পাঠালে টাকা মারা যায়।' ঘাড় নেড়ে বৌ বললে, 'বেশ'।

বাবা! বাঁচলাম! এতক্ষণে নিশ্চিন্তি হ'য়ে বাসায় ফিরে' এসে বললাম, 'দাও এবার ভাত দাও, খাব। বৌ জিজ্ঞেস করলে, 'কেন, কি হয়েছে বল দেখি!' আগাগোড়া সব কথা বললাম বৌকে।—বৌ বলে কি জানিস?'

'কি বলে?' বলিয়া মাষ্টারের মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

মাষ্টার হাসিল। বলিল, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে?'

বলিয়াই মাষ্টার আবার আরম্ভ করিল, 'পোড়ারমুখী বলে কি না,—ওরে আমার কে রে! সাধু ত্যাওড়াগাছ! টাকা তুমি নিলে না কেন?'

'বাস্! এই নিয়ে হ'লো ঝগড়া। বুঝলি এবার?'

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ'।

মাষ্টার রাগিয়া উঠিল; বলিল, 'ছাই বুঝলি। কিছু বুঝিসনি।—বুঝেও কি তুই ওই মেয়েকে নিয়ে আমায় ঘর করতে বলিস?'

হাসিয়া বলিলাম, 'কি বলব তা হ'লে?'

'কি বলবি?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে তাকাইয়া দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলিল, 'বলবি,—খ্যাংরা মেরে' বাড়ী থেকে দূর করে দিতে।'

পোষ্টাপিস ও মাষ্টারের 'ফেমিলি কোয়ার্টারে' মাত্র একটি দেওয়ালের ব্যবধান। দেয়ালের ও-পার হইতে শোনা গেল, 'হে ভগবান! হে ভগবান! এমন সোয়ামীর হাত থেকে আমায় নিষ্কৃতি দাও ভগবান! চিরজন্মের মত নিষ্কৃতি দাও—হে হরি, হে মধুসূদন!'—বলিয়া মট্ মট্ করিয়া আঙ্গুল মটকানোর শব্দ আর কান্না!

রাখাল-মাষ্টার উঠিয়া দাঁড়াইল; বলিল, 'চল্! এ আর চব্বিশঘণ্টা আমি কত শুনব? চল—তোকে খানিকটা এগিয়েই দিয়ে আসি। চল্।'

তখন সূর্যাস্ত হইতেছে। বাড়ী ফিরিতে হয় ত' রাত্রি হইবে।

বাহিরে আসিয়া দেখি, অস্ত-সূর্যের স্তিমিত রশ্মি মেঘে-মেঘে প্রতিফলিত হইয়া সারা আকাশটাকে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। সম্মুখে হরীতকী, শাল ও মহুয়ার বন। তখন ফাল্গুন মাস। সুচিক্কণ মসৃণ পত্রভারাবনত বৃক্ষশ্রেণী। শাল ও মহুয়া ফুলের গন্ধে-ভরা বাতাস। ঢেউ-খেলানো অসমতল ভূমিখণ্ডের উপর সুমুখে কয়েক ঘর সাঁওতালের বস্তি।

তাহারই পাশ দিয়া সংকীর্ণ একটি পথ-রেখা আঁকিয়া-বাঁকিয়া বনে গিয়া প্রবেশ করিয়াছে।

সেই পথ ধরিয়াই নীরবে চলিতেছিলাম। রাখাল-মাষ্টার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হাঁ রে, লিখেছিস কিছু ?'

'কি ?'

'বা-রে ! ভুলে গেলি এরই মধ্যে ? সেই যে বলেছিলাম।'

হাসিয়া বলিলাম, 'তোমার গল্প ?'

মাষ্টার শুধু ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

বলিলাম, 'না, তোমার গল্প আমি আর লিখব না।'

মাষ্টার সে কথায় কান দিল না। বলিল, 'কেন লিখবি না ? লিখবি, লিখবি। তবে সত্যি কথা লিখিস বাপু। এই ধর্—আমার বৌটার কথা লিখবি আগে। লিখবি যে, ওর মত খারাপ মেয়ে আর দুনিয়ায় নেই। মাগীটার কাছ থেকে পালাতে পেলে আমি বাঁচি। নিজের চোখেই ত' সব দেখে এলি,—তোকে আর বেশি কি বলব।'

বলিলাম, 'আচ্ছা। তুমি এবার যাও, নইলে ফিরতে তোমার রাত হবে।'

'হোক না।' বলিয়া রাখাল-মাষ্টার আমার কাঁধে হাত দিয়া ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'অন্ধকারে সাপে কামড়াবে ? কামড়াক না। বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই, মাইরি বলছি, বৌটার জ্বালায় এক একদিন মনে হয় আমি মরি।'

বলিয়াই সে ফিরিয়া যাইবার জন্য পিছন ফিরিল। বলিল, 'আসি তবে। লিখিস কিন্তু।'

* * * *

সম্মতি দিয়া ত' বাড়ী ফিরিলাম।

লিখিবার চেষ্টাও যে করি নাই তাহা নয়।

লিখিয়াছিলাম :

'পঁচিশটি টাকা মাত্র বেতন। রাখাল-মাষ্টারের পোষ্টমাষ্টারী করিবার কথা নয়। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা।

'বড়লোকের ছেলে নয়। ছেলে নিতান্ত গরীবের। তাও যদি বাবা বাঁচিয়া থাকিতেন।

'শৈশবে পিতৃহীন মাতৃহীন বালক—মামার বাড়ীতেই মানুষ। মামা মস্ত বড়লোক। প্রকাণ্ড অট্টালিকা, দাসদাসী, লোকজন,—তিন তিনটি মোটরকার। তাহারই একটিতে চড়িয়া প্রত্যহ বৈকালে রাখাল বেড়াইতে যায়। যেমন পোশাক, তার তেমনি চেহারা। লোকে দেখে আর বলে, 'ব্যাটার কপাল ভাল।'

'মামা বিবাহ দিলেন। গরীবের ঘরের অমনি অনাথা একটি মেয়ে।'

'মেয়ের অভিভাবিকা ছিলেন এক পিসি। মামা নিজে মেয়ে দেখিতে গিয়াছিলেন। মেয়ের পিসি বলিলেন, 'তাই ত' বাছা, ছেলেটির মা নেই বাপ নেই, তার ওপর মামার কাছে মানুষ···'

মামা বলিয়াছিলেন, 'সেজন্যে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন বেয়ান, মামা তার অর্ধেক সম্পত্তি ভাগ্নেকে দিয়ে যাবে।'

'হয়ত দিতেন। কিন্তু এমনি রাখালের অদৃষ্ট যে, তিনি না দিয়াই মরিলেন।

রাখাল—মেয়ের ছেলে, সুতরাং বলিবার কিছুই নাই।

কিছুদিন পরেই দেখা গেল সে তাহার স্ত্রীকে লইয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—নিরবলম্ব, নিঃসহায়, নিঃসম্বল রাখাল!

তাহার পর সে সব অনেক কথা। বলিতে গেলে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হয়।

পথে পথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া শেষে বহুদিন পরে রাখাল একটি চাকরি পায়—পোষ্টাপিসের পিওন। তাহার পর পিওন হইতে—হয় পোষ্টমাষ্টার।

'কিন্তু এই যে দুঃখ-দুর্ভোগ ইহাও হয় ত' সে নীরবে সহ্য করিতে পারিত—যদি সঙ্গিনীটি হইত তাহার মনের মত।

'রাখাল বলে, 'সে দুঃখের কথা আর বোলো না ভাই, মেয়েটা আমায় ভালবাসে না। ভালবাসলে এত ঝগড়াঝাঁটি, এত কথা কাটাকাটি হয় না কখনও।'

এই পর্যন্ত লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

লেখা কাগজগুলা প্রায় প্রত্যহই সঙ্গে লইয়া যাইতাম। ভাবিতাম, মেজাজ ভাল থাকিলে মাষ্টারকে একদিন পড়িয়া শোনাইব। কিন্তু পড়া আমার আর কোনোদিনই হইয়া উঠিল না।

ভাল মেজাজে রাখাল-মাষ্টারকে পাওয়া বড় কঠিন।

যেদিন যাইতাম, শুনিতাম, কেহ না কেহ তাহাকে বড় বিরক্ত করিয়া গেছে।

বিরক্ত করিবার লোকের অভাব নাই। কেহ একখানা পোষ্টকার্ড কিনিতে আসিলেও মাষ্টার তাহাকে দাঁত খিঁচাইয়া তাড়িয়া মারিতে ওঠে। অথচ পোষ্টাপিসে নানা প্রয়োজনে লোকজন আসিবেই।

গ্রামে তাহার দুর্নামের একশেষ। সবাই বলে, 'এমন বদমেজাজী লোক বাবা আমরা জীবনে কখনও দেখি নি। ওর নামে সবাই মিলে একটা দরখাস্ত না করলে আর উপায় নেই।'

কথাটা শুনিয়া বড় দুঃখ হইয়াছিল। মাষ্টারকে একদিন বলিয়াছিলাম,— 'ছাখো মাষ্টার, পোষ্টাপিসের কাজে যে-সব লোকজন আসবে, তাদের সঙ্গে তুমি ওরকম-ধারা ব্যবহার কোরো না। এতে তোমার ক্ষতি হবে।'

'ক্ষেতি? কি বললি,—ক্ষেতি?' বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া জবাব দিয়াছিল, 'না। ক্ষেতি আমার কেউ করতে পারবে না তা তুই দেখে' নিস্। অনেকে অনেক চেষ্টাই করেছিল কিন্তু পারে নি। উল্টো পিওন থেকে পোষ্টমাষ্টার! ভগবান আমার সহায় আছেন।'

এই বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিল। বলিল, 'ভগবান সহায় না থাকলে··· ছাখ্, আমি যে কারও ক্ষেতি কোনো দিন করি নি রে, আমার ক্ষেতি কেউ করবে না দেখিস। ক্ষেতি যা কিছু আমার করবার, তা ওই উনি করেছেন।' বলিয়া সে তাহার অন্তঃপুরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিল, 'চুপ! শুনতে পেলে কিছু বাকি রাখবে না।'

চুপ করিয়াই ছিলাম।

মাষ্টার কিন্তু চুপ করে নাই। বলিতে লাগিল, 'গাঁয়ের লোক আমার বদনাম করে। না? তা ত' করবেই, ব্যাটারা নিমকহারাম! আমি সাচ্চা মানুষ কি-না! ওই ছাখ্—ওই রেজেষ্টারী চিঠিখানা ফেলে রেখেছি। কেন রেখেছি জানিস? ওই অবিনাশ-ব্যাটার কাছে সেদিন আমি চাল কিনতে গেলাম, শুনলাম, না কি ব্যাটা টাকায় দশ সের করে' চাল বেচছে। আমায় দেখে' বলে কি না, 'না ঠাকুর, চাল আমি আর বিক্রি করব না। টাকায় দশ সের করে' ত' নয়— টাকায় আট সের।' অনেকক্ষণ চেঁচামেচির পর বললাম, 'তাই আট সেরই দে না রে বাপু, ঘরে যে এদিকে গিন্নি আমার জল চড়িয়ে বসে আছে।'

অবিনাশ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না ঠাকুর, মিছে বকাবকি—আমি দেবো না।' আচ্ছা, দাঁড়া রে ব্যাটা অবিনাশ, তোকে কি আমি একদিনও পাব না!—বাস্, পেয়েছি। রেজেষ্ট্রী চিঠি একখানা এসেছে ব্যাটার নামে। আজ দু'দিন হলো—ওইখানেই পড়ে' আছে। থাক্ ব্যাটা ওইখানে পড়ে!'

বলিলাম, 'কিন্তু এ তোমার অন্যায় মাষ্টার।'

'অন্যায়?' বলিয়া মাষ্টার আমার মুখের পানে কটমট করিয়া তাকাইয়া বলিব, 'তবে আর তুই লেখক কিসের রে?"

কি আর বলিব। চুপ করিয়া রহিলাম।

কিন্তু রেজেষ্ট্রী চিঠি ফেলিয়া রাখা যে অন্যায়, সে কথা বোধ করি রাখাল-মাষ্টার ভুলিতে পারিল না; তাই সে আবার আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিল, 'অন্যায় কিসের শুনি? সে যে-অন্যায় করলে সেটা বুঝি অন্যায় হলো না? আমার অন্যায়টাই অন্যায়?'

কি যে বলিব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমার চিঠি কয়খানি লইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছি, মাষ্টার ধরিয়া বলিল, 'ওসব চলবে না, তুই বলে যা!'

বলিলাম, 'চাল সে না দেওয়ায় তোমার ক্ষতি কিছু হয় নি, কিন্তু এতে যদি তার ক্ষতি হয়?'

মাষ্টার অন্যমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসে ক্ষতি হয়?'

'চিঠিখানা ফেলে রাখায়!'

'তাও ত' বটে।' বলিয়া মাষ্টার নীরবে বারকয়েক মাথা নাড়িয়া চুপ করিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, 'ঠিক বলেছিস। লেখক-মানুষ কি না, বুদ্ধি-সুদ্ধি একটু আছে।'

উভয়েই চুপ।

মাষ্টার সহসা বলিয়া উঠিল, 'আচ্ছা!'

বলিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইল।—'হয়েছে তোর চিঠি নেওয়া?'

ঘাড় নাড়িয়া আমিও উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

অবিনাশের চিঠিখানা হাতে লইয়া মাষ্টার বলিল, 'চল্ তবে নিজেই দিয়ে আসি। কাজ কি বাপু, রেজেষ্ট্রী চিঠি, দরকারীও ত' হ'তে পারে! চল্।'

দু'জনে একসঙ্গেই বাহির হইতেছিলাম, বাহিরে দরজার কাছে, একজন হৃষ্টপুষ্ট লম্বা-চওড়া সাঁওতাল-ছোকরা দাঁড়াইয়া আছে, মাথায় বাবরি চুল, গলায় লাল কাটির মালা, হাতে একটা বিড়ালের বাচ্চার মত মেটে-রঙের মরা খরগোশ। সাঁওতাল ছোকরাটিকে দেখিবামাত্র রাখাল-মাষ্টারের মুখখানি শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। চৌকাঠের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া বলিল, 'কে···মুংরা···তুই আজও এসেছিস··· ?'

বলিয়া দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে কামড়াইতে মাষ্টার কি যেন ভাবিতে লাগিল।

মুংরা বলিল, 'ধেৎ তেরি! রোজ রোজ পুইসা নাই পুইসা নাই, আনতে তবে তুঁই বলিস কেনে?'

অনুমানে ব্যাপারটা কতকটা বুঝিলাম। মুংরাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত দাম ?'

মুংরা দাম বলিবার আগেই মাষ্টার বলিয়া উঠিল, 'নিবি তুই? আহা খরগোশের মাংস—বুঝলি কি না—ভারি সুন্দর। আমার বৌ খুব ভালবাসে। দু'তিন মাস ধরে' আমায় বলছে, কিন্তু ছাই এমন দিনে মুংরা আসে যে আমার হাতে পয়সাই থাকে না। আরও দু'বার দুটো এনেছিল, তা ওই যে বললাম, এমন দিনে আসে হতভাগা···। দাম? দাম আর বেশি কোথায়? দাম দু' আনা।'

পকেট হইতে একটি দু'আনি বাহির করিয়া মুংরার হাতে দিয়া বলিলাম, 'দে, ওটা আমাকে দিয়ে যা।'

মুংরা অত্যন্ত খুশী হইয়া হাসিতে-হাসিতে দু'আনিটি হাত পাতিয়া গ্রহণ করিল।

'দাঁড়া তবে, দাঁড়া।' বলিয়া মাষ্টার তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকিয়া লোহার একটি লম্বা ছুরি আনিয়া বলিল, 'বেশ করে' কেটে ওকে কুটে দিয়ে যা মুংরা, বাবু ছেলেমানুষ, কুটতে পারবে না—বুঝলি? সেই তোরা যেমন করে' কুটিস। যা—আগে ওই ছোট তালগাছটা থেকে একটা 'বাগ্‌ড়ো' কেটে আন, তারপর তালের ওই পাতা দিয়ে বাবুকে জিনিসটে বেশ ভাল করে' বেঁধে দিবি, বুঝলি? বাবু হাতে করে' ঝুলিয়ে বাড়ি নিয়ে যাবে।'

সুমুখের ছোট তালের গাছ হইতে একটা 'বাগ্‌ড়ো' কাটিয়া আনিয়া মুংরা খরগোশ কাটিতে বসিল।

মাষ্টারের রেজেষ্ট্রী চিঠি দিতে যাওয়া আর হইল না। বলিল, 'থাক্, পিওনের হাতে পাঠালেই চলবে।' বলিয়া চৌকাঠের উপর চাপিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল, 'মামার বাড়ী যখন ছিলাম, বন্দুক নিয়ে প্রায়ই শিকার করতে যেতাম। যেতাম বটে, কিন্তু একটা পাখীও কোনো দিন মারতে পারি নি, বুঝলি? গুলি ছুঁড়তাম। ছোঁড়বার সময় মনে হতো—আহা, কেন মারব। বাস্, হাত যেতো কেঁপে, আর শিকার যেতো ফসকে'। একদিন একটা কুকুর মেরেছিলাম। মামার ছিল পায়রার সখ। বুঝলি?'

বলিয়া মাষ্টার চোখ বুজিয়া চুপ করিল। বিগত দিনের সুখৈশ্বর্যের স্মৃতি বোধ করি তাহার মনে পড়িল।

কিয়ৎক্ষণ পরে চোখ চাহিয়া বলিল, 'বাড়ীতে অনেকগুলো পায়রা ছিল। নানান রকমের পায়রা। একদিন একটা পায়রাকে বুঝি বেড়ালে ধরেছিল। পায়রাটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতো, ভাল করে' উড়তে পারত না। পাশের বাড়ীর সুরেশের পোষা কুকুরটা একদিন ঝপ্ করে' এসে' তার ঘাড়ে ধরে' ঝাঁকানি দিয়ে—দিলে পায়রাটাকে মেরে'। আমার রাগ হয়ে গেল। জানিস ত' আমার রাগ! বাস্, তৎক্ষণাৎ বন্দুক বের করে' চালালাম গুলি। দড়াম্ করে' লাগলো গিয়ে কুকুরটার পেটে। কাঁই কাঁই করে' সে কী তার কান্না! ছুটে পালাবার চেষ্টা করছিল। আবার গুলি! বাস্! খতম! কুকুরটা ছটফট করতে করতে গোঁ গোঁ করে' আমার চোখের সুমুখে মারা গেল। উঃ! সে কী দৃশ্য!'

বলিয়া মাষ্টার একবার শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বলিল, 'সেই যে বন্দুক ছেড়েছি, জীবনে আর কোনো দিন...'

এই বলিয়া সেই যে সে মুখ ঢাকা দিয়া চুপ করিয়া রহিল, অনেকক্ষণ অবধি সে আর কথা কহিল না।

তাহার গল্পটা আমার পকেটে-পকেটেই ফিরিত। ভাবিলাম ইহাই উপযুক্ত সময়। বাহির করিয়া বলিলাম, 'গল্প তোমার খানিকটা আমি লিখেছি। শোনো।'

মুখের ঢাকা খুলিয়া মাষ্টার বলিল, 'পড়।'

পড়িলাম।

খানিকটা শুনিয়াই নাড় নাড়িয়া বলিল, 'নাঃ, গল্প লিখতে তোরা জানিস না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন ?'

মাষ্টার খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'নাঃ', দুঃখু তুই নিজে পাস নি কোনো দিন, দুঃখুর কথা তুই লিখবি কেমন করে' ? আমি যদি লিখতে জানতাম ত' দেখিয়ে দিতাম কেমন করে' লিখতে হয়।—আচ্ছা পড়। শুনি শেষ পর্যন্ত।'

শেষ পর্যন্ত শুনিয়া কি একটা কথা যেন সে বলিতে যাইতেছিল, হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—মুংরার দিকে। মাংস কুটিয়া সে তখন দু'জায়গায় ভাগ করিতেছে। মাষ্টার জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কি রে ? দু'জায়গায় কেন ?'

বলিলাম, 'আমি বলেছি। একটা তোমার, একটা আমার।'

'আমার ?' বলিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'বললাম আমার কাছে পয়সা নেই···তুই আচ্ছা বোকা ত! চারটে পয়সাই বা এখন আমি পাই কোথায় ?'

বলিলাম, 'পয়সা তোমাকে দিতে হবে না।'

মাষ্টার সকরুণ দৃষ্টিতে একবার তাকাইল, তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'চারটে পয়সা খরচ করবার ক্ষমতাও আজ আমার নেই।' বলিতে বলিতে চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

ভাগ-দুইটার মধ্যে একটা ভাগ বেশি করিয়া দিয়া ছোট ভাগটা, মুংরা মাঝিকে তালপাতায় মুড়িয়া বাঁধিয়া দিতে বলিলাম।

মাষ্টার বলিল, 'দাঁড়া, গিন্নিকে দেখিয়ে আনি।'

বলিয়া একটা ভাগ সে দু'হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া ভিতরে গিয়া হাঁকিতে লাগিল, 'গিন্নি! ও গিন্নি!'

সেই অবসরে আমার ভাগটা লইয়া আমি পলায়ন করিলাম।

যথাসম্ভব দ্রুতপদে আগাইয়া গিয়া অনেকখানি পথ চলিয়া আসিয়াছি, এমন সময় পশ্চাতে ডাক শুনিয়া তাকাইয়া দেখি, রাখাল-মাষ্টার ছুটিতে ছুটিতে আমার পিছু ধরিয়াছে।

সারাপথ ছুটিয়া আসিয়া হাঁপাইতে লাগিল। বলিল, 'পালিয়ে এলি যে?

আয়। তোকে একবার আসতে হবে।' বলিয়া সে আমার হাতখানা চাপিয়া ধরিল।

'কেন ?' বলিলাম, 'না, রাত হয়ে যাবে, আমি আর যাব না।'

মাষ্টার কিছুতেই ছাড়িবে না। বলিল, 'উঁহু, যেতেই হবে তোকে।'

ব্যাপার কিছু বুঝিলাম না। বাধ্য হইয়া ফিরিতে হইল।

হাতে ধরিয়া আমাকে পোষ্টাপিসের ভিতর লইয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে মাষ্টার হাঁকিল :

'ধরে নিয়ে এসেছি গিন্নি, ওগো ও শ্রীমতী, কোথায় গেলে ?'

মাথায় একটুখানি ঘোমটা টানিয়া শ্রীমতী আসিয়া দাঁড়াইল।—একহাতে এক গ্লাস জল আর একহাতে ছোট একটি পাথরের বাটিতে খানচারেক বাতাসা।

মাষ্টার বলিল, 'একটু জল খা।'

পাছে দুঃখ পায় বলিয়া বাতাসা-কয়টি চিবাইয়া জল খাইলাম।

মাষ্টার হাঁকিল, 'পান ? পান কোথায় ?' বলিয়াই সে নিজের ভুল শুধরাইয়া লইল। বলিল, 'ও, পান ত' নেই বাড়ীতে। পান আমরা দু'জনেই খাই না। আচ্ছা দাঁড়া, দেখি।'

বলিয়া কি যেন আনিবার জন্য মাষ্টার ভিতরে যাইতেছিল, কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল না, পিতলের একটি রেকাবির উপর চারিটি কাটা সুপারি ও কতকগুলি মৌরি লইয়া হাসিতে হাসিতে তাহার স্ত্রী আবার ঘরে ঢুকিল। রেকাবি হইতে সুপারি লইতে গিয়া একবার চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম—আয়ত দুইটি চক্ষু, ম্লান একটুখানি হাসি। গৌরবর্ণ কৃশাঙ্গী যুবতী,—দেখিলে সুন্দরী বলিয়া ভ্রম হয়। তবে সৌন্দর্য যে তাহার একদিন ছিল তাহাতে আর কোনও সন্দেহ রহিল না। দুঃখে দারিদ্র্যে সে সৌন্দর্য আজ তাহার ম্লান হইয়া গেছে।

ভাবিলাম, গল্পে যে জায়গায় তাহাকে কুৎসিত লিখিয়াছি সে জায়গাটা কাটিয়া দিব।

হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বলিলাম, 'নমস্কার। আজ আসি।'

মাষ্টার-গৃহিণী প্রতি-নমস্কার করিল না, কোনও কথা বলিল না, ম্লান একটু হাসিয়া মাত্র তাহার জবাব দিল।

এ মেয়ে যে কেমন করিয়া মাষ্টারের জীবন দুর্বহ করিয়া তুলিতে পারে, তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বাহির হইয়া আসিলাম। মাষ্টারও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল।

কিয়দ্দূর আসিয়া মাষ্টার হাসিয়া আমার কাঁধে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখলি ?'

কি দেখিলাম সে প্রশ্ন করিবার প্রয়োজন বোধ করিলাম না। ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, 'হ্যাঁ'।

মাষ্টার বলিল, 'ছাখ, আমার গল্পের মধ্যে সেই যে এক জায়গায় লিখেছিস —ও আমাকে ভালবাসে না, ওটা কেটে দিস।'

বলিলাম, 'নিশ্চয়ই।'

ভাবিলাম, গল্পটা আগাগোড়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া লিখিব।

পোড়ারমুখী

বিড়াল পুষিবার কল্পনাও কোনোদিন করি নাই, তবু একটা বিড়াল জুটিয়া গেল।

স্ত্রী বলিতে লাগিল, 'আদর করে খেতে দিয়েছ, এখন তার মজাটি বোঝো! ও আর আমাদের বাড়ী ছাড়বে না—এই আমি বলে' রাখলাম দেখো।'

কিন্তু কবে যে তাহাকে আদর করিয়া খাইতে দিয়াছি মনে পড়িল না।

হয়ত' দিয়াছি।

হয়ত' কোনোদিন খাইবার সময় আমার কাছে আসিয়া বসিয়াছিল, হয়ত'-বা এক টুক্‌রা মাছের জন্য মিউ মিউ করিয়া তাহার সকরুণ প্রার্থনা জানাইয়াছিল, দিয়াছিলাম হয়ত' একটা মাছের কাঁটা তাহার মুখের কাছে ছুঁড়িয়া।

কিন্তু কে জানিত, শুধু তাহারই জন্য সে আমার বাড়ী ছাড়িবে না!

বলিলাম, 'থাক না, একটা বেড়াল বই-ত না। বাড়ীতে বেড়াল থাকা ভালো।'

স্ত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ ভাল, খুব ভাল। চুরি করে কাল খেলে মাছ, আর আজ দিয়েছে দুধটুকু খেয়ে। হরিয়াকে আবার দুধ আনতে পাঠালাম।'

'দু'সের দুধ—সব খেয়েছে?'

স্ত্রী বলিল, 'খায়নি, কিন্তু মুখ ত' দিয়েছিল। বেড়ালের এঁটো দুধ তুমি খাবে?'

'কেন, হয়েছে কি তাতে?'

'না কিছু হয় নি! এমনি বুদ্ধি না হ'লে উকিল হয় কখনও!'

হাসিতে হাসিতে বলিলাম, 'ঠিক বলেছ। কিন্তু কি হবে অতটা দুধ? ফেলে দেবে?'

স্ত্রী বলিল, 'ফেলে কেন দেবো? আমি খাব।'

'বা-রে। তোমার খেতে দোষ নেই? আর আমার বেলা—'

'তোমার সঙ্গে কত আর বক্‌বো বল। আমি জানি না যাও!' বলিয়াই সেখান হইতে সে পলায়ন করিল।

বুঝিলাম, বিড়ালটার উপর গৃহিণী রাগ করিয়াছে। এ রাগ হয়ত' বেশি দিন নাও থাকিতে পারে!

শেষ পর্যন্ত হইলও তাই। রাগ তাহার থাকিল না।

বিড়ালটা দেখি সারাদিন আমার স্ত্রীর পিছু পিছু ঘুরিয়া বেড়ায়। খাইবার সময় চুপটি করিয়া থালার কাছে বসিয়া থাকে। রাত্রে গরম উনানের পাশে ঘুমায়।

চুরি-চামারি যে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে তাহা নয়। সুযোগ-সুবিধা পাইলেই লোভ আর সে কিছুতেই সম্বরণ করিতে পারে না। এক-আধ টুক্‌রা মাছ হয়ত' মুখে লইয়া ছুটিয়া পালায়। গৃহিণীর নজর যদি এড়াইতে পারে ত' ভালই, আর তাহা যদি না পারিয়াছে ত' আর রক্ষা নাই! দেখিতে পাইবামাত্র বঁটি, খুন্তি, জুতা, হাতের কাছে যাহা পায় তাহাই ছুঁড়িয়া মারে, আর সারাদিন ধরিয়া বকিতে থাকে, 'দেখেছ? পোড়ারমুখীর স্বভাব দেখেছ? চুরি করে' না খেলে ওদের পেট ভরে না—আমি জানি যে!'

কিন্তু ওই পর্যন্তই।

আগে যেমন তাহাকে তাড়াইবার জন্য গৃহিণী আমার উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল এখন আর তাহা করে না। বলে,—'এঁটো কাঁটা খেয়ে যদি বেঁচে থাকতে পার ত' থাকো, চুরি করে খেয়েছ কি তোমায় আমি বিদেয় করব।'

সংসারে সন্তানাদি নাই। এই লইয়া দিন তাহার মন্দ কাটে না।

কথাটাকে টানিয়া বাড়াইবার চেষ্টা করি। বলি, 'কেমন করে' বিদেয় করবে? ও গেলে ত'!'

স্ত্রী বলিল, 'কেন? বস্তার ভেতর পুরে গঙ্গার ধারে ছেড়ে দিয়ে আসব।'

'বস্তায় পুরে কেন?'

'ও, তাও বুঝি জানো না? চোখে যদি দেখতে পায় কোন্ রাস্তা দিয়ে এলো, তা'হলে যেখানেই ছেড়ে দাও ঠিক চলে আসবে।'

'বস্তায় পুরে ওকে নিয়ে যাবে কে?'

'কেন, তুমি!'

'ওরে বাপ্‌রে! বস্তায় পুরলেই হাঁজোর-পাঁজোর কর্‌বে, না বাপু, তা আমি পারব না।'

'না পারো, গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে আমি নিজে দিয়ে আসব।'

এই প্রসঙ্গে গৃহিণী তাহার বাল্যকালের একটি গল্প বলিল। এমনি একটা চোরা বিড়ালকে কিছুতেই তাহারা তাড়াইতে পারিতেছিল না। চোখে কাপড় বাঁধিয়া কতবার কত জায়গায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া আসা হইল, কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেল সে ফিরিয়া আসিয়াছে। বাড়ীতে একদিন একটা বড় মাছ আসিয়াছিল, বিড়ালটা কোন্ সময় চুরি করিয়া প্রায় অর্ধেকেরও বেশি মাছ খাইয়া ফেলিল। গৃহিণী তখন দশ-বারো বৎসরের কিশোরী। বলিল, 'দাঁড়াও, তোমাকে দেখাচ্ছি মজা!'

বলিলাম, 'কি মজা দেখালে?'

গৃহিণী বলিল, 'একগাছা দড়ি নিয়ে হতভাগীর গলায় আচ্ছা-করে বাঁধলাম। বেঁধেই মনে হলো বঁটি দিয়ে দিই ওকে বলিদান করে। হিড়হিড় করে' টেনে নিয়ে গেলাম পুকুরের পাড়ে। পুকুরের পাড়ে ছিল লম্বা এক ঝাড় বাঁশ। ভাবলাম ঠিক হয়েছে। প্রকাণ্ড লম্বা একটা বাঁশ অতি কষ্টে হাত দিয়ে নোয়ালাম। নুইয়ে তার ডগায় দড়ি দিয়ে আচ্ছা করে বাঁধলাম বেড়ালটাকে। বেঁধে বাঁশটা দিলাম ছেড়ে! বাস্, যেই ছেড়ে দেওয়া, সটাং করে বাঁশটা গেল উঠে। আর হতভাগী ঝুলতে লাগলো সেই লম্বা বাঁশের ডগায় আকাশ-পিদিমের মত। বললাম, 'কেমন, আর খাবি মাছ? থাক্ ঐখানে।' বলে বাড়ী চলে এলাম।

বলিলাম, 'ছি ছি, ওইখানে মরলো-ত' বেড়ালটা না খেয়ে-খেয়ে?'

গৃহিণী বলিল, 'হ্যাঁ, মলো! মরবার ইয়েটি কেমন! খানিক পরে ভাবলাম, আহা, নামিয়ে দিইগে যাই। ও মা, গিয়ে দেখি,—হতভাগী নেই সেখানে। সন্ধ্যেবেলা দেখলাম, পোড়ারমুখী আবার আমাদের হেঁশেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। গলার দড়িটা দাঁত দিয়ে কেটে নেমে এসেছে সেখান থেকে।'

বলিলাম, 'বেড়ালের ওপর তাহ'লে তোমার ছোটবেলা থেকেই আক্রোশ?'

গৃহিণী হাসিতে লাগিল।

বিড়ালটা যখন আমাদের বাড়ীতেই রহিয়া গেল তখন যাহোক-একটা নাম ত' তাহার দিতে হইবে।

গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'হ্যাঁগা, কি নাম ধরে' ডাকি বল ত' ওকে ?'

গৃহিণী বলিল, 'ওর আবার নাম! আমি ত' ওকে পোড়ারমুখী বলে' ডাকি।'

তাহাই হইল। আমিও তাহাকে পোড়ারমুখী বলিয়াই ডাকিতে লাগিলাম।

কোনোদিন দেখি, সকালে উনানে আগুন দিতে গিয়া বাসি-আখার তলা হইতে পোড়ারমুখীকে টানিয়া বাহির করিয়া গৃহিণী বলিতে থাকে, 'শোবার আর জায়গা পেলে না হতভাগী! আগুনে যেদিন মরবি পুড়ে সেইদিন বুঝবি মজা!'

পোড়ারমুখী মাছ-ভাত ভাল করিয়া খায় না, তাই এক-একদিন দেখি, গৃহিণী তাহার জন্য দুধ দিয়া ভাত মাখিতেছে।

আদর-যত্ন পাইয়া দেখিতে দেখিতে পোড়ারমুখী বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিল। আগে যেমন সে হাত তুলিলেই ছুটিয়া পালাইত, আজকাল আর তাহা করে না। দুপুরে আহারাদির পর গৃহিণী যখন সেলাইএর কল চালায়, পোড়ারমুখী তখন তাহার কোলের কাছটিতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। রাত্রে এক-একদিন লেপের তলায় আসিয়া ঢোকে।

গৃহিণী বলে, 'দেখেছ ? খেয়ে-দেয়ে কেমন হ'লো দেখেছ ?'

বলি, 'ভাল করে' খেতে পেলেই হয়।'

'কই, তুমি হচ্ছ না যে ? তুমি কি খেতে পাও না নাকি ?'

'খেতে পাই। কিন্তু ওর মত আদর পাই কই ?'

'যাও!' বলিয়া হাসিয়া গৃহিণী চলিয়া যাইতেছিল, দরজার কাছে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিয়া গেল, 'নিমকহারাম।'

গৃহিণীর সেদিন ভাল করিয়া খাওয়া হইল না। না হইবার কারণ—পোড়ারমুখী সেই যে সকালে উঠিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গেল এখনও বাড়ী ঢুকিল না। অথচ যেখানেই যাক আজ পর্যন্ত একটি দিনের জন্যও খাইবার সময় সে অনুপস্থিত হয় নাই।

গৃহিণী বলিল, 'কোথায় গেল কে জানে! ভোজ-টোজ আছে হয়ত' কারও বাড়ীতে, নইলে এতক্ষণ আসতো ঠিক।'

সেদিন আর তাহার সেলাইএর কল খোলা হইল না, কোনও কাজেই মন বসিল না, পোড়ারমুখী কোথায় গেল তাহাই শুধু ভাবিতে লাগিল।

বলিল, 'এত যে খেতে দিচ্ছি তবু পরের বাড়ী চুরি করে' খেতে যাওয়া কেন বল ত'? ধরা যদি পড়ে, দেবে হয়ত' খুন করে'। তাই দিলে কিনা তাই-বা কে জানে!'

মাখানো একবাটি দুধ-ভাত পড়িয়া রহিল। গিন্নি বলিল, 'ওগো, যাও না একবারটি দেখে এসো বেড়াতে বেড়াতে।'

'কোথায় দেখব?'

'ছাখো না কোন্ বাড়ীতে লোকজন খাওয়ানো হচ্ছে! পথে বেরুলেই বুঝতে পারবে।'

'তা না হয় বেরোলাম, কিন্তু তোমার পোড়ারমুখীকে পাব কেমন করে'?'

সেকথাও সত্য। কিন্তু তবু তাহার মন মানিল না। বলিল, 'পাবে, পাবে। তুমি যাও। তোমাকে দেখলেই সে চলে আসবে।'

বাধ্য হইয়া বাহির হইয়া গেলাম। কিন্তু কোথায় পোড়ারমুখী! রাস্তায় রাস্তায় খানিকক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

কি জবাব দিব ভাবিতে ভাবিতে ঘরে ঢুকিয়াই দেখি, গায়ে একটা চাদর ঢাকা দিয়া খাটের উপর গৃহিণী শুইয়া পড়িয়াছে।

বলিলাম, 'কি গো, পোড়ারমুখীর শোকে যে শয্যা নিলে দেখছি!'

তেমনি শুইয়া শুইয়া গিন্নি জিজ্ঞাসা করিল, 'পেলে?'

বলিলাম, 'ক্ষেপেছ? মানুষ হ'লেও বা খুঁজে আনতাম। এ তোমার কোথায় আছে—

কথাটা আমার শেষ হইবার আগেই গিন্নি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

'হাসছো যে?'

'এই ছাখো।' বলিয়া গায়ের চাদরটা সে খুলিয়া ফেলিল। দেখিলাম তাহার বুকের কাছে পোড়ারমুখী চুপ করিয়া শুইয়া আছে।

বলিল, 'তুমি বেরিয়ে যেতেই দেখি না রান্নাঘরে হতভাগী মিউ মিউ করছে।'

পোড়ারমুখী ছাড়া অন্য কোনও বিড়াল গৃহিণীর দু'চক্ষের বিষ! অথচ প্রায়ই দেখা যায়, পাড়ার আরও দু'একটা বিড়াল পোড়ারমুখীর সঙ্গে বেড়াইতে আসে। গৃহিণী তাহাদের মারিয়া মারিয়া তাড়াইবার চেষ্টা করে। বলে, 'দেখেছ? পোড়ারমুখী আবার বন্ধু জোটাতে আরম্ভ করেছে।' বলে, হয়ত',

'আয় আমাদের বাড়ী খাবি আয়! মরণ আর-কি! যাদের বাড়ী আছিস্ তাদের বাড়ীতেই খেগে যা না!'

পোড়ারমুখীকে কোলের কাছে শোয়াইয়া এক-একদিন সে বুঝাইতে থাকে, 'বলি হ্যাঁ লা, একা-একা বুঝি ভাল লাগে না? খবরদার বলছি, এবার থেকে আর-কাউকে ডেকেছ কি তোমাকেও আমি বিদেয় করে' দেবো। তোমাকে খেতে দিচ্ছি এই যথেষ্ট, আবার তোমার বন্ধুদের আমি খেতে দিতে পারবো না। বুঝলে?'

পোড়ারমুখী কি যে বুঝে কে জানে, গিন্নির মুখের পানে মিটমিট করিয়া তাকাইয়া বলে, 'মিউ।'

গিন্নী বলে, 'মিউ নয়, শুনে রাখো, নইলে তোমাকে-সুদ্ধ্ খ্যাংরা মেরে দূর করে' দেবো। আমি বাবা সে রকম মেয়ে নই, বেশি আব্দার আমার কাছে চলবে না।'

কি আর করিব। আদালত যাওয়া পরিত্যাগ করিয়াছি। সারা দুপুরবেলাটা এই-সব শুনি আর মনে-মনে হাসি।

শীত সে-বৎসর খুব বেশি পড়িয়াছিল।

সবে তখন কার্তিক পার হইয়া অগ্রহায়ণ চলিতেছে।

সকালে সেদিন তরকারির চুপ্‌ড়ি হইতে তরকারি আনিতে গিয়া গৃহিণী একেবারে চীৎকার করিয়া লাফাইয়া সেখান হইতে সরিয়া গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হ'লো কি গো? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলে যে?'

হাসিতে হাসিতে গৃহিণী বলিল, 'এসো, দেখবে এসো।'

'কি দেখব?'

'দেখবে এসো পোড়ারমুখীর কাজ! তাই ত' বলি, হতভাগী যখন-তখন যায় কোথায়!...সেই যে তখন বন্ধু ডেকে আনার কথা বলতাম না...দেখে যাও, দেখে যাও, কেমন একটা বাচ্চা হয়েছে দেখে যাও।'

গেলাম। গৃহিণী বলিতে লাগিল, 'ছি ছি মা, কালো-কুচ্ছিৎ, যমের অরুচি, দেখলে ভয় করে! নিজের এমন সাদা ধপধপে সুন্দর চেহারা, আর বাচ্চা হয়েছে ছ্যাখো না!'

বলিলাম, 'কই? কোথায়?'

আঙুল বাড়াইয়া তরকারির ঝুড়িটা সে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'ওই ছ্যাখো

ওর ভেতরে। আমি দেখাতে পারব না বাবা, পোড়ারমুখী যা ফোঁস্ ফোঁস্ করছে, দেবে হয়ত' কামড়ে।'

ঝুড়িটা টানিতে গিয়া দেখিলাম, পোড়ারমুখী আগলাইয়া বসিয়া আছে, আর ঝুড়ির ভিতর এতটুকু একটা কালো রঙের বাচ্চা মিউ মিউ করিতেছে। কালো বিড়াল অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এত কালো কখনও দেখি নাই। গৃহিণী ঠিকই বলিয়াছে। বাচ্চাটার সর্বাঙ্গের মধ্যে কোথাও সাদার এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নাই। আগাগোড়া মিশমিশে কালো, বিশ্রী চেহারা, দেখলে ভয় করে।

গিন্নি বলিল, 'চুপি-চুপি কাপড়ের তলায় লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে—দিয়ে এসো ওটাকে রাস্তার ধারে ফেলে!'

গিন্নিকে বুঝাইয়া বলিলাম, 'ছাখো, সাহেবরা এই কালো বেড়াল বড় ভালবাসে।'

গিন্নি বলিল, 'তা বাসুকগে, ওদের সবই উলটো।—মা গো মা, অন্ধকারে ওটাকে দেখলে ভয় করবে, ওরকম বেড়াল আমি রাখব না বাড়ীতে। যাও বাপু যাও—এক্ষুণি ওটাকে ফেলে দিয়ে এসো।'

বিড়ালের বাচ্চাটাকে রাখিবার অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু গৃহিণী আমার কোনও কথাই শুনিল না। বলিল, 'ওকে রাখলে বাড়ীর অমঙ্গল হবে তুমি দেখে নিও।'

কাজেই বাধ্য হইয়া বিড়ালের বাচ্চাটাকে অতিকষ্টে তুলিয়া লইয়া রাস্তার ধারে ফেলিয়া দিয়া আসিলাম।

ঘণ্টাখানেক পরেই দেখি, পোড়ারমুখী বাচ্চাটাকে মুখে করিয়া আবার তুলিয়া আনিয়াছে।

গিন্নি আবার চীৎকার করিতে লাগিল, 'যেমন তোমার কাজ! এমন জায়গায় দিয়ে এলে যে আবার নিয়ে এলো! না বাপু, তোমায় কিছু কাজ করতে বলা অন্যায়।'

কাজেই সেই বাচ্চাটাকে লইয়া আবার আমাকে যাইতে হইল। এবার গেলাম পোড়ারমুখীকে না জানাইয়া নিতান্ত সন্তর্পণে। অতিকষ্টে তাহাকে বাজারের থলের ভিতর পুরিয়া বহুদূরের একটা বস্তির কাছে ছাড়িয়া দিয়া আসিলাম।

বাড়ী ফিরিয়া দেখিলাম, পোড়ারমুখী কিছুই জানিতে পারে নাই। সে তখন এ-ঘর ও-ঘর করিয়া বাচ্চাটাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।

গৃহিণী বলিল, 'খুঁজুক। খেতে পেলেই এক্ষুণি ভুলে যাবে।'

কিন্তু খাইবার সময় পোড়ারমুখীকে দেখিতে পাওয়া গেল না।

গৃহিণী বলিল, 'বাচ্চাটাকে হয়ত' খুঁজতে বেরিয়েছে। ত্যাখো না একটু-খানি বেরিয়ে। পাও ত' ওকে তুলে নিয়ে এসো।'

দেখিলাম সত্যই তাই। গতবার যেখান হইতে বাচ্চাটাকে মুখে করিয়া তুলিয়া আনিয়াছিল সেইখানেই সে মিউ মিউ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। 'আয়!' বলিয়া ডাকিতেই সে আমার পায়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। দু'হাত দিয়া তুলিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া আসিলাম। গিন্নি তাহাকে আদর করিয়া খাইতে দিল। পোড়ারমুখীও খাইল বটে, কিন্তু পেট ভরিয়া ভাল করিয়া খাইল না, দুধ দিয়া মাখানো ভাত অর্ধেকের বেশি পড়িয়া রহিল।

গিন্নি তাহাকে সারাদিন ধরিয়া বুঝাইল। বলিল, 'কালো-কুচ্ছিৎ ওই বিশ্রী ছেলেটার জন্যে দুঃখু করিসনে পোড়ারমুখী, ছেলে তোর আবার হবে—দুধুমুখী বাচ্চা হবে—সাদা ধপধপে কেমন সুন্দর, দেখবি তখন আমি তোর ছেলে মানুষ করে দেবো। বুঝলি?'

পোড়ারমুখী বোধহয় বুঝিল। দেখিলাম, গিন্নির পিছু-পিছু আবার সে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই পোড়ারমুখীর সে কি কান্না!

কত পুত্রহীনা জননীর ব্যাকুল ক্রন্দন শুনিয়াছি, কিন্তু সামান্য একটা বিড়ালও যে ঠিক তেমনি করিয়া কাঁদিতে পারে—সে কথা আমার জানা ছিল না। সারারাত ধরিয়া বাড়ীর আনাচে-কানাচে বিড়ালটা শুধু কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল। খাবার ধরিয়া দিলে খাইল না। ডাকিলে কাছে আসিল না।

বিড়ালটাকে খাওয়াইবার জন্য গৃহিণী অনেক চেষ্টা করিল। ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান হইয়া গিয়া শেষে দুধের বাটি রাগ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, 'আর পারি না বাপু, একটা বেড়ালের জন্যে কত আর করতে পারি বল!'

বিড়াল কাঁদিলে নাকি গৃহস্থের অমঙ্গল হয়। তাই পাড়ার লোকে তাহার কান্না শুনিয়া দূর দূর করিতে লাগিল। কেহ-বা দোষ দিতে লাগিল আমাকে,

কেহ-বা আমার স্ত্রীকে। বলিতে লাগিল, 'ছেলেপুলে হয়নি, তাই একটা বেড়াল পুষে সাধ মেটাচ্ছে।'

কথাটা যাহাতে আমার স্ত্রী না শুনিতে পায় তাহার জন্য অন্য কথা বলিয়া তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া দিলাম। শেষে বুঝিলাম, কথাটা সে শুনিতে পায় নাই। তাহার মন পড়িয়া ছিল পোড়ারমুখীর দিকে। সারাটা রাত্রি আমাদের কাহারও ভাল ঘুম হইল না। পোড়ারমুখীও বোধ করি ঘুমায় নাই। যখনই ঘুম ভাঙিয়াছে, তখনই তাহার কান্নার শব্দ শুনিয়াছি।

রাত্রি তখন বোধকরি প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, স্ত্রী ডাকিল, 'ওগো শুনছো?'

'কি?'

'কই আর ত' কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না!'

আমিও কিয়ৎক্ষণ কান পাতিয়া রহিলাম।

বলিলাম, 'শীতে আর কতক্ষণ বাইরে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে বল। এবার বোধ হয় ঘুমিয়েছে।'

তাহার পরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। আবার স্ত্রীর ডাকে আমার ঘুম ভাঙ্গিল। বলিল, 'ওই শোনো!'

আবার শুনিলাম তাহার সেই বুকফাটা আর্তনাদ। বাড়ীর ছাদে বসিয়া বসিয়া আবার সে কাঁদিতে সুরু করিয়াছে।

স্ত্রী বলিল, 'বড় অন্যায় করেছি, বুঝলে? কাল সকালেই বাচ্চাটাকে তুমি খুঁজে এনে দাও। থাক, আর কি করব বল, এ কান্না আমার সহ্য হয় না।'

ঘুমে তখন চোখ আমার জুড়িয়া আসিতেছে। বলিলাম, 'বেশ তাই হবে। এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।'

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙিতে আমার একটু দেরি হইয়া গেল। দেখিলাম, গৃহিনী অনেক আগেই শয্যাত্যাগ করিয়াছে।

হাত-মুখ ধুইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কই গো, কোথায় তুমি?'

দেখিলাম, ছাদ হইতে সে নীচে নামিতেছে। বলিল, 'ভিজে কাপড়টা মেলতে গিয়েছিলাম।'

ভিজা কাপড় কোনদিন তাহাকে ছাদে মেলিতে দেখি নাই। এত প্রত্যূষে

ছাদে কাপড় মেলিবার প্রয়োজন আজ যে তাহার কেন হইল বুঝিলাম। বলিলাম, 'কোথায় সে? ছাদে রয়েছে নাকি এখনও?'

স্ত্রী শুধু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

তাড়াতাড়ি চা তৈরি করিয়া স্ত্রী ডাকিল, 'চা খাবে এসো।'

প্রতিদিনের অভ্যাসমত চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজটা সবেমাত্র মেলিয়া ধরিয়াছি, গৃহিণী আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'তাড়াতাড়ি চা'টা খেয়ে একবার—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই বলিলাম, 'যাই।'

'কাগজটা তুমি এসে পড়বে, লক্ষ্মীটি। বাচ্চা বেড়াল, কতদূর আর যাবে, যেখানে ফেলে এসেছ সেইখানেই আছে হয়ত', স্যাখোগে। ভাল করে' খুঁজে দেখো, বুঝলে?'

চায়ের পেয়ালাটা শেষ করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'পোড়ারমুখী কোথায় গেল? সারারাত ত' ছাদেই ছিল।'

'গেছে হয়ত' বাচ্চাটাকে খুঁজতে।'

গলার আওয়াজটা কেমন যেন ভারি-ভারি বলিয়া মনে হইল। মুখের পানে ফিরিয়া তাকাইতেই দেখি, চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

কিন্তু কোথায় সে বিড়ালের বাচ্চা? যেখানে ফেলিয়া আসিয়াছিলাম, দেখিলাম সেখানে নাই। বস্তির প্রত্যেকটি বাড়ীতে তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কেহই তাহার সংবাদ ঠিক দিতে পারিল না।

একটা ছেলে বলিল, 'বেড়ালের বাচ্চা? কালো রঙের? কাল দেখেছিলাম ময়লা-ফেলা ওই টিনটার পাশে বসেছিল।'

ডাস্ট-বিন্‌টার চারিদিকে ভাল করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিতেছিলাম, জনকতক ছোট ছোট ছেলে ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিল, ঢিল মারিয়া মারিয়া মদ্‌না তাহাকে আধমরা করিয়া ফেলিয়াছিল। এতক্ষণ হয়ত' সে মরিয়া গিয়াছে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'মদ্‌না কার নাম? কোথায় সে?'

'এই ত'!' বলিয়া একটা ছেলে আঙুল বাড়াইয়া দেখাইয়া দিতেই কালো-রঙের একটা আট-দশ বছরের ছেলে প্রাণপণে ছুটিয়া পলাইল।

ছেলেটা ভাবিল, বুঝি-বা আমি তাহাকে শাস্তি দিবার জন্যই আসিয়াছি।

বাচ্চাটাকে পাওয়া গেল না। পাইবার কথাও নয়। ছেলেটা ঠিকই বলিয়াছে,—এতক্ষণ সেটা বাঁচিয়া আছে কি-না সন্দেহ।

নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলাম। সুমুখে পথের উপর কিসের যেন একটা গোলমাল উঠিল। তাড়াতাড়ি সেই দিকেই আগাইয়া গেলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিসের গোলমাল মশাই ?'

'কি জানি মশাই, বাচ্চা একটা কুকুর নাকি মোটরের তলায় চাপা পড়েছে।'

কলিকাতা শহরের পথ। পোড়ারমুখীর বাচ্চাটাও ঠিক এমনি করিয়াই মরিয়াছে কি-না তাই-বা কে বলিতে পারে!

যে-জায়গাটায় গোলমাল উঠিয়াছিল সেখানে পৌঁছিতেই চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা দেখিবার কল্পনাও আমি করিতে পারি নাই। যে নিরীহ প্রাণীটির উপর দিয়া মোটরের চাকা চলিয়া গিয়াছে, দেখিলাম সেটা কুকুরের বাচ্চা নয়, সে আমাদের পোড়ারমুখী! হতভাগী তাহার বাচ্চার সন্ধানে পথের উপর হয়ত' পাগলের মত ঘুরিতেছিল, পিছনে মোটর আসিতেছে তাহা হয়ত' সে লক্ষ্যও করে নাই!

পিছনের একটা পায়ের উপর দিয়া চাকা চলিয়া গিয়াছে, সেবা-শুশ্রূষা করিলে হয়ত' বাঁচিতেও পারে। দু'হাত দিয়া পোড়ারমুখীকে কোলে তুলিয়া লইলাম। হতভাগী একদৃষ্টে আমার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল।

বাড়ী ফিরিতেই স্ত্রী ছুটিয়া আসিল :—'পেলে ?'

'না। এই ছাখো, তোমার পোড়ারমুখীর পায়ের ওপব দিয়ে মোটর চলে গেছে।'

বাচ্চাটার কথা ভুলিয়া গিয়া পোড়ারমুখীকে লইয়া পড়িলাম। টিঞ্চার আইডিন দিয়া পায়ে তাহার ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম।

একবাটি দুধ খাইয়া হতভাগী একটুখানি সুস্থ হইয়াছে, পিছনে হঠাৎ মিউ মিউ শব্দ শুনিয়া তাকাইয়া দেখি, যাহার জন্য এত কাণ্ড, তাহার সেই কালো বাচ্চাটি আপনা হইতেই আসিয়া হাজির হইয়াছে। বাড়ী চিনিয়া কেমন করিয়া কোথা হইতে সে আসিল সেই জানে।

আনন্দে তখন আমার গৃহিণীর চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল গড়াইতেছে। ধূলি-ধূসরিত বিড়ালের বাচ্চাটাকে দু'হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়া পোড়ারমুখীর কোলের কাছে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'কাল নিজেও যত কেঁদেছিস আমাকেও তত কাঁদিয়েছিস, এই নে মা তোর খোকন নে।'

স্ত্রীর মুখের পানে তাকাইয়া হাসিয়া বলিলাম, 'মোটরের চাকাটা আর-একটুখানি ওপরে উঠে গেলেই—বাস্, নিতো খোকন। ট্র্যাজিডির চরম হয়ে যেতো।'

গৃহিণীর মুখে হাসি ফুটিল। হাত দুইটি কপালে ঠেকাইয়া বিধাতার উদ্দেশে একটি প্রণাম করিয়া বলিল, 'ভগবান বাঁচিয়েছেন।'

নিরাশ্রয়

প্রথমে ভাবিয়াছিলাম লোকটা উন্মাদ।

সমস্ত ট্রামগুলা চলিয়া গিয়াছে। টালিগঞ্জের ট্রামডিপোয় ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছি, হঠাৎ একটা লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'এখানে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায়, বলতে পারেন?'

শীতের সন্ধ্যা। হিল্ হিল্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। এদিকে ট্রামের দেখা নাই। প্রশ্নটা বিশেষ প্রীতিকর মনে হইল না। বলিলাম, 'আমাকে দেখে কি আপনার বাড়ীর মালিক বলে মনে হলো নাকি?'

লোকটি বোধ হয় একটুখানি অপ্রস্তুত হইয়া গেল। মুখের পানে তাকাইয়া দেখিলাম, মাথার চুল, চোখের ভ্রূ, গোঁপ দাড়ি—পাকিয়া সব সাদা হইয়া গিয়াছে, আপাদমস্তক মুড়ি দিয়া শীতে বোধকরি নিতান্ত কাতর হইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কথাটা বলা আমার উচিত হয় নাই। ভদ্রলোককে বিপন্ন বলিয়াই মনে হইল।

বলিলাম, 'ওইদিকে সোজা চলে' গিয়ে দেখুন একটু খোঁজাখুঁজি করে', বাড়ী নিশ্চয় পাবেন।'

'নিশ্চয়ই পাব?'

'পাবেন বই-কি। বলিয়া তাঁহার আপাদমস্তক একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম। দরিদ্র হইলেও শিক্ষিত ভদ্রলোক বলিয়াই মনে হইল। বলিলাম: 'আজ রাত্রি হয়ে গেছে; আপনি বরং কাল আসবেন।'

'কাল! আমি আপনাকে এইখানে দেখতে পাব?'

তা আর বলি কেমন করিয়া!

বলিলাম: 'আমাকে না-ই বা পেলেন? আমি বলছি—রাত্রে বাড়ী ত' ভাল দেখতে পাবেন না! কাল দিনের বেলায় আসবেন।'

'তার মানে? আপনি বলতে চান আমার বয়েস হয়েছে, আমি চোখে ভাল দেখতে পাইনা? খুব ভাল দেখতে পাই মশাই!'

আমি কিন্তু তাহা বলিতে চাই নাই, ট্রামও আসিয়া দাঁড়াইল। উঠিয়া বসিলাম।

দেখি, তিনিও উঠিয়া আমার পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। বলিলেন : 'তাহলে আপনি আমাকে কাল আসতে বলছেন ? বাড়ী ঠিক পাওয়া যাবে এখানে, না কি বলেন ?'

বলিলাম : 'আমার এক বন্ধু এখানে থাকেন, তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করতে পারি।'

ট্রাম তখন ছাড়িয়া দিয়াছে। কণ্ডাকটার আসিয়া টিকিট চাহিল।

ভদ্রলোক দুখানা টিকিটের দাম দিয়া আমার হাত দুখানা চাপিয়া ধরিলেন। অনুনয় করিয়া বলিলেন : 'আপনাকে একবার নামতে হবে।'

'কেন ?'

'আপনার সেই বন্ধুর বাড়ী আমাকে একবার—'

বুঝিলাম, বাড়ী তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন। অসহায় বৃদ্ধের মিনতি এড়াইতে পারিলাম না। নামিয়া পড়িলাম।

বন্ধুর বাড়ী বেশি দূরে নয়। দু'জনে পাশাপাশি পথ চলিতেছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম : 'আপনি কি করেন ?'

তিনি বোধকরি রাগ করিলেন। বলিলেন : 'কি করি আপনার জেনে কি হবে মশাই ?—বাঁশী বাজাই।'

থিয়েটারে সিনেমায় বাঁশী বাজানো এমন-কিছু মন্দ কাজ নয়, তবু তিনি রাগ করিলেন কেন বুঝিলাম না। আর কোনও প্রশ্ন করিতে ভয় করিতেছিল, হঠাৎ তিনিই আমাকে প্রশ্ন করিয়া বসিলেন : 'আপনার বন্ধুর নিজের বাড়ী ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সপরিবারে বাস করেন ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'তা দেখুন, এমনও ত' হতে পারে—ওঁরই বাড়ীর একখানা ঘর আমাকে ছেড়ে দেবেন, আমি একা মানুষ, দিব্যি কেমন বাড়ীর লোকের মতন থাকবো।'

আমি জানিতাম, বন্ধুর নিজেরই তেমন স্থান সঙ্কুলান হয় না। বলিলাম, 'আজ্ঞে না, তা বোধ হয় হবে না।'

'কি হবে না ?'

'তাঁর বাড়ীতে জায়গা।'

তিনি বলিলেন : 'কেন ? বাড়ীর মেয়েরা আমার সুমুখে বেরুতে লজ্জা পাবে ?'

বলিলাম : 'আজ্ঞে না। বাড়ী তাঁর ছোট। ভাড়া দেবার মত ঘর নেই।'

'তাই বলুন।' বলিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন :

'আচ্ছা, এসময় ত' কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীতে বসে থাকবার কথা নয়। আপনার বন্ধু ত বাড়ীতে নাও থাকতে পারেন !'

বলিলাম : 'থাকবে। সম্প্রতি তার চাকরি গেছে। বাড়ীতেই বসে থাকে।'

ভদ্রলোক যেন আঁতকিয়া উঠিলেন।—'চাকরি গেছে ? তাহলে বলুন অত্যন্ত কষ্টেই আছেন তিনি ?'

'তা একটু আছেন।'

'চলুন আর যেতে হবে না।' বলিয়া তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

বলিলাম : 'কেন ?'

তিনি বলিলেন, 'না মশাই, দুঃখু কষ্টের কথা শুনতে শুনতে এখুনি প্রাণ বেরিয়ে যাবে। আমি মশাই একটুখানি আনন্দে থাকতে চাই।'

কিছুতেই আর তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিলাম না। ভদ্রলোক আবার আর-এক আপত্তি তুলিয়া বসিলেন। বলিলেন : 'এ-পাড়ায় মশা রয়েছে দেখছি।'

'তা টালিগঞ্জে দু'চারটে মশা থাকবে না ?'

'দু'চারটে কি মশাই, এইটুকু পথ আসতে আসতে অন্তত পঁচিশটে মশা আমাকে কাম্‌ড়েছে। এই দেখুন ফুলে উঠলো। জ্বালা করছে।'

এই বলিয়া তিনি তাঁহার হাতটা দেখাইতে দেখাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'আসুন, এখানে আমার থাকা চলবেনা। মানুষের চেয়ে মশাকে আমি বেশি ভয় করি।'

বাধ্য হইয়া আমাকেও ফিরিতে হইল।

ট্রামে চলিয়াও নিস্তার নাই। রাত্রি হইয়া গিয়াছে। বালিগঞ্জে তাঁহাকে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিতে হইবে। এবং তাহার জন্য আমাকে তিনি খরচ কিছুতেই করিতে দিবেন না। ট্রামের টিকিটটা তিনিই করিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'চার আনা পয়সা এখনও আছে আমার কাছে। আপনি ভয় পাবেন না।'

ভয় আমি পাই নাই। পকেট হইতে একটা বিড়ি বাহির করিয়া ধরাইতে যাইতেছিলাম। তিনি বলিলেন, 'বিড়িটা ফেলে দিন।'

বুড়ার বোধ হয় ধোঁয়া সহ্য হইবে না। ফেলিয়াই দিলাম।

দেখিলাম, পকেট হইতে তিনি এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিলেন: 'নিন্, খান। বিড়িটা ভাল নয়। সিগ্রেট্ খাবেন।'

হাসিয়া বলিলাম, 'খরচ বেশি।'

তিনি বলিলেন, 'আনন্দও বেশি। আমি বেশ আনন্দেই থাকি মশাই, আমার কোনও কষ্ট নেই।'

এতক্ষণে তাহাই মনে হইতেছিল বটে। ট্রাম হইতে নামিয়াই ভদ্রলোক আপন মনেই গুণ গুণ করিয়া গান ধরিলেন। খানিকদূর গিয়াই কিন্তু গান তাঁহার থামিয়া গেল। একটা মোড়ের মাথায় দাঁড়াইয়া বলিলেন: 'আর আপনাকে আসতে হবে না, যান্। ওই যে দেখছেন লাল রঙের বাড়ীটা, ওইখানে আমি থাকি।'

'নমস্কার!'

চলিয়া আসিতেছিলাম। আবার তিনি আমাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। বলিলেন: 'অনেক কষ্ট দিলাম। কিন্তু আবার আপনাকে আমি কষ্ট দেবো।'

'কি বলুন!'

'কাল যদি আপনি একবার—'

'কাল আমাকে আবার আসতে হবে?'

'যদি পারেন ত বড় ভাল হয়।'

'ক'টার সময় আসব বলুন।'

'তিনটের সময়। একটু সকাল-সকাল বেরুবো দুজনে।'

কথা দিলাম। বলিলাম: 'আসব।'

ভদ্রলোক খুশী হইলেন। বলিলেন: 'বাড়ী আমার চাই-ই। তা না হলে আপনাকে আমি বিরক্ত করতাম না।'

কাজকর্ম নাই। কাজেই আমার বিরক্ত হইবার কথাও নয়।

পরদিন ঠিক তিনটার সময় বালিগঞ্জের রাস্তায় ট্রাম হইতে নামিলাম।

ভদ্রলোকের নাম জানি না, উপাধি জানি না, বাড়ীর সুমুখে গিয়া কি বলিয়া ডাকিব ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, হঠাৎ দেখিলাম, হাসি-হাসি মুখে ঠিক সেই মোড়ের মাথায় বৃদ্ধ আমারই জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

বলিলাম: 'আজকালকার ছোকরারা কথার ঠিক বড় একটা রাখে না। আপনি কিন্তু রেখেছেন। একখানা ঘরের জন্যে বড়ই কষ্ট পাচ্ছি মশাই। দুঃখু কষ্ট যত তাড়াতাড়ি নিবারণ করতে পারা যায় ততই ভালো। চলুন!'

চলিতে চলিতে আর বাড়ী দেখিতে দেখিতে অনেকদূর চলিয়া গেলাম। কিন্তু কিছুই তাঁহার পছন্দ হইল না।

বলিলেন: 'আমি চাই বেশ একটু ফাঁকা-ফাঁকা পল্লীগ্রামের মত দেখতে। কলকাতার এই সব বড়-বড় বাড়ীর গোলমাল আমার ভাল লাগে না।'

বলিলাম: 'তাহলে আপনাকে বস্তিতে যেতে হবে।'

তিনি বলিলেন: 'বেশ ত' তাই যাব।'

'কিন্তু বস্তিতে মশা আছে।'

'থাকলে আর কি করছি বলুন! মশা নেই কোথায়?'

কাল যিনি মশা সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াছেন, আজ হঠাৎ তাঁহার মত বদলাইল কেন বুঝিলাম না। রাস্তার দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড একটা বস্তি দেখিতে পাইয়া ঢুকিয়া পড়িলাম।

পল্লীগ্রামের মতই আবহাওয়া। গাছপালা গরু-বাছুর সবই রহিয়াছে। আবার জলের কলও আছে, ইলেক্‌ট্রিকের আলোও আছে।

কল-তলায় একটি আধাবয়সী মেয়ে জল ধরিতেছিল। ওপাশ দিয়া আর একটা রাস্তা বস্তির ভিতরে গিয়া ঢুকিয়াছে। তিনি বলিলেন, 'আমি এইদিকটা দেখি, আপনি ওইদিকটা দেখে আসুন।'

তাঁহাকে সেইখানেই রাখিয়া আমি বস্তির ভিতরে চলিয়া গেলাম। মনের মত ঘরের অভাব সেখানে নাই। ভাড়াও যথেষ্ট কম। কিন্তু বস্তির বাসিন্দা যাহারা, তাহাদের দেখিয়া আমার তেমন ভাল লাগিল না। নানা রকমের নানা-বয়সী মেয়ের সংখ্যাই বেশি। সকলেই কেমন যেন—

সেই কল-তলার কাছে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সুমুখের একটা বাড়ী হইতে হাসিতে হাসিতে তিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন। পেছনে সেই মেয়েটি।

আমি কিছু বলিবার আগেই তিনি বলিয়া বসিলেন : 'পেয়ে গেছি। এঁর এই বাইরের ঘরখানা আমি ভাড়া নিলাম। চমৎকার ঘর! ঠিক আমি যেমনটি চেয়েছিলাম তেমনি। বাইরের দিকেও দরজা আছে, ভেতরের দিকেও দরজা আছে। দেখবেন ঘরখানা?'

সেইখান হইতেই দেখিতে পাইয়াছিলাম। কাজেই বলিলাম : 'থাক্, আর দেখতে হবে না।'

তিনি কিন্তু বলিয়াই চলিলেন : 'ভাড়াও সস্তা। মাসে মাত্র দশ টাকা।'

বস্তির একখানা মাটির ঘর, ভাড়া মাসে দশ টাকা, সস্তা যে কেমন করিয়া হইল তিনিই জানেন।

বলিলেন : 'তা ছাড়া এই মেয়েটি বড় ভালমানুষ, আমাকে যত্ন-আত্যি করবেন বলেছেন। বাড়ীতেও লোকজনের ঝামেলা কিছু নেই—'

আরও কি যেন তিনি বলিতে যাইতেছিলেন। মেয়েটি আমার মুখের পানে তাকাইয়া হাসিয়া বলিল, 'আমি আর আমার বোনঝি।'

বলিতে বলিতেই দরজার কাছে তাহার বোনঝি আসিয়া দাঁড়াইল। পূর্ণাঙ্গী ষোড়শী যুবতী। যৌবন ও স্বাস্থ্য যেন রেশারেশি করিয়া তাহার সর্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। মুখখানিও দেখিতে মন্দ নয়। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল : 'কি আনতে বললে আমি ভুলে গেলাম মাসীমা।'

মাসীমা বোধ হয় তাহাকে তিরস্কার করিল। বলিল : 'কি রকম আক্কেল মা তোর! ভদ্দরলোকের সঙ্গে কথা বলছি আর এই সময়—ভুলে গেলাম মাসীমা? এক পয়সার পান আর এক পয়সার দোক্তা আনতে বলেছি, আর-কিছু বলিনি।'

বোনঝি আবার তেমনি হাসিতে হাসিতে বোধ করি রাগ করিয়াই সশব্দে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

মাসী বলিল : 'ওই আমার বোনঝি।'

বুঝিতে পারিয়াছি। বলিবার প্রয়োজন ছিল না।

প্রয়োজন এখন সেখান হইতে চলিয়া আসিবার।

বড় রাস্তায় আসিয়া বলিলাম : 'বাড়ী আপনার হয়ে গেল। এবার তাহলে আমি আসি।'

ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন : 'উঁহু, আসবেন কি রকম! এখনও আপনাকে আমার বাঁশী শোনানো হয়নি। কাল আমি এইখানে উঠে আসব। কাল আসবেন যেন।'

'আসব।' বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম : 'কিন্তু দেখুন এখনও পর্যন্ত আপনার নাম আমি জানি না। কি বলে ডাকব ?'

তিনি বলিলেন : 'নাম ? আচ্ছা, আমাকে আপনি মিত্তিরমশাই বলেই ডাকবেন, ওই বলেই আমাকে সবাই ডাকে।'

বলিলাম : 'কিন্তু দেখুন, আমার কি মনে হচ্ছে জানেন ? এখানে ঘরভাড়া নেওয়া আপনার উচিত হলো না।'

'কেন ?'

'মেয়েগুলোর হাব-ভাব আমার ভাল লাগলো না।'

'কি মনে হলো ?'

'মনে হলো কেমন যেন ইয়ে—'

'ইয়ে ? ইয়ে মানে ?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে বলিতে প্রথমে সংকোচ বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া বলিয়া ফেলিলাম। বলিলাম : 'ইয়ে মানে খারাপ। মানে ঢংঢাং ঠিক বেশ্যার মত।'

'বেশ্যা।' বলিয়া মিত্তিরমশাই যেন লাফাইয়া উঠিলেন। ভাবিলাম রাগ করিয়া হয়ত এখানে আসা তিনি বন্ধ করিবেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহাকে বলিতে শুনিলাম : 'তাতে আর আমার ক্ষতি কি বলুন! আহা ওরাও ত মানুষ।'

ট্রাম পর্যন্ত তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন।

সারা রাস্তা সেই এক কথা।—'বেশ্যাদের কেউ বিশ্বাস করে না, না ? কিন্তু ওরাও ত মানুষ! ওরাও ভালবাসা চায়, অথচ পায় না। কি কষ্ট বলুন ত ?'

আমি জবাব দিলাম না।

মিত্তিরমশাই কিন্তু বলিয়াই চলিলেন : 'তাতে আমার কি ক্ষতি! না, কি বলেন, এঁ্যা ? আমি আপনার একধারে পড়ে থাকবো, আমার কি ক্ষতি ?'

তা ক্ষতি যখন তাঁহার কিছুই নাই, আমারই-বা এত মাথাব্যথা কেন ?

নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সেদিন সন্ধ্যায় হঠাৎ মনে হইল মিত্তিরমশাই কি করিতেছেন একবার দেখিয়া যাই।

বস্তিতে ঢুকিয়া মিত্তিরমশাই-এর ঘরের সুমুখে গিয়া দেখি—এক হুলুস্থুল কাণ্ড। বাড়ীর ভিতরের দিকে মনে হইল একটা মেয়ে যেন প্রাণপণে চীৎকার করিতেছে, আর এদিকে ঘরের শুধু মেঝের উপর মিত্তিরমশাই বিষণ্নমুখে বসিয়া।

আমাকে দেখিবামাত্র মিত্তিরমশাই বলিলেন : 'আসুন। আমি এসেছি।'

'এসেছেন তা ত দেখতেই পাচ্ছি।'

চৌকাঠের কাছে মিটমিট করিয়া একটা লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, সেটাকে তুলিয়া আনিয়া সারা ঘরখানার দিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া দেখিলাম—কোথাও একটা আসবাবের এতটুকু চিহ্ন পর্যন্ত নাই, এমন কি একটা মাদুর পর্যন্ত পাইলাম না যে, চাপিয়া বসি।

অথচ দেখিলাম, মিত্তিরমশাই আসিয়াছেন। হাতে একটা বাঁশের বাঁশী, এতক্ষণ দেখিতে পাই নাই, লণ্ঠনের আলোতে দেখা গেল, জামার দুই পকেটে আরও ডজন খানেক বাঁশীর মাথা দেখা যাইতেছে।

মিত্তিরমশাই বলিলেন : 'না, এখানে আর থাকা হলো না দেখছি। চলুন আপনাকে দুঃখের কথা বলি সব বাইরে।'

এই বলিয়া মিত্তিরমশাই উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ওদিকের চৌকাঠ ডিঙাইয়া রণরঙ্গিণী মূর্তিতে ঘরে প্রবেশ করিল মাসীমা। বলিল : 'না, বাইরে যেতে হবে না, এইখানেই বলি।'

বুঝিলাম মাসীমার লক্ষ্য আমারই দিকে।

'বলি—কি রকম লোক দিয়ে গেলে গো সেদিন? ঘর ভাড়া করে' গিয়ে, তিন দিন দেখা নেই। আমি ত আইঢাই করে' মরি। তারপর আজ এলেন সকালে। এলেন একেবারে ঝাড়া হাত-পা। একটা চৌকি নেই, মাদুর নেই, বিছানা নেই, বালিস নেই, জলখাবার একটা গেলাস পর্যন্ত নেই। তার ওপর সারাদিন পোঁ পোঁ করে ভেঁপু বাজিয়ে বাজিয়ে দিলে আমাদের কানগুলো ঝালাপালা করে'। সারাদিন খাওয়া নেই, দাওয়া নেই—'

মিত্তিরমশাই বলিয়া উঠিলেন : 'দিনের বেলা আমি খাই না।'

মাসী বলিল : 'আহা হা—খাই না। বুড়ো মিথ্যে কথা বলছে ছাখো। খায় না।'

মিত্তিরমশাই বলিলেন : 'আমাকে বুড়ো বুড়ো ক'রো না বলছি, আমি বুড়ো নই।'

মাসী বলিল : 'না, বুড়ো নয়! পাকা দাড়ি, পাকা চুল, বলে কিনা তোর চোখের ভুল! আবার বলে—খাই না! শুনবে তবে বাছা, খায় কি না শুনবে?'

মিত্তিরমশাই এবার হাত তুলিয়া তাহাকে নিষেধ করিতে যাইতেছিলেন, মাসী কিছুতেই নিষেধ শুনিল না। আমাকে সে বলিবেই।

এবং শেষ পর্যন্ত হাত পা নাড়িয়া যাহা সে বলিল, শুনিয়া একটুখানি অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিল, তাহার সেই বোনঝিটি নাকি দোকান হইতে ঠোঙায় করিয়া তেলেভাজা কিনিয়া আনিতেছিল, মিত্তিরমশাই হাতের ইশারায় তাহাকে ঘরে ডাকিয়াছেন, ডাকিয়া তেলেভাজাগুলো তাহার হাত হইতে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া খাইয়া ফেলিয়াছেন।

মিত্তিরমশাই বলিলেন : 'তার বদলে আমি পয়সা—'

মাসী তাহাকে চুপ করাইয়া দিল। বলিল, 'রাখো পয়সা! তারপর বলেছে —বোসো এইখানে, আমার বাঁশী শোন।'

মিত্তিরমশাই বলিলেন : 'বলেইছি ত! কেষ্ট ঠাকুরের—'

মাসী এইবার তাঁহার মুখের কাছে হাতটা নাড়িয়া দিয়া বলিল : 'ওরে আমার কেষ্ট ঠাকুর রে! সাধ যায় বোরেগী হতে, প্রাণ যায় মচ্ছব দিতে!'

এমন সময় দরজার কাছে কে যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাকাইয়া দেখি—যাহাকে লইয়া এত কাণ্ড, চমৎকার সাজিয়া-গুজিয়া তাহার সেই বোনঝিটি দরজার দুই চৌকাঠে দুই হাত রাখিয়া আমাদেরই দিকে তাকাইয়া হাসিতেছে।

মাসীর নালিশ তখনও শেষ হয় নাই। বলিল, 'আরও কি বলেছে শোনো! বলেছে—নাতনী, আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিবি?'

মিত্তিরমশাই তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ, বলেইছি ত! তার জন্যে আমি ওকে—'

'চার আনা পয়সা দিতে চেয়েছিলে জানি। চাল নেই চুলো নেই, পয়সার মুরোদ তোমার বুঝে নিয়েছি, মনমনসিঙ্গির জমিদার চারশো টাকা নগদ দিতে চেয়েছিল, আমি নিইনি।'

মিস্তিরমশাই বলিলেন : 'না, এখানে আর থাকা হলো না। এই নাও তোমার এক মাসের ভাড়া।' বলিয়া পকেট হইতে একখানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মাসীর পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

মাসীর মুখের কথা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। নোটখানি কুড়াইয়া লইয়া মাসী কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একবেলা বাস করিবার জন্য নগদ দশটি টাকা এমন করিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইবার ক্ষমতা যে বুড়ার থাকিতে পারে, মাসী তাহা কোনদিন কল্পনাও করে নাই। মাসীর মুখ দেখিয়া মনে হইল সে যেন বুড়াকে আবার ডাকিয়া ফিরাইতে চায়।

কিন্তু তিনি তখন অনেক দূরে। রাস্তার উপর হইতে আমাকে ডাকিতেছেন : 'চলে আসুন মশাই, চলে আসুন ওখান থেকে।'

আমি আসিতেই মিস্তিরমশাই বলিলেন : 'শুনলেন ত সব ?'

'শুনলাম।'

মিস্তিরমশাই কি যেন আমাকে বলিতে গিয়াও বলিতে পারিলেন না। 'হুঁ' বলিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

আমি চলিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আমাকে কিছুতেই ছাড়িলেন না, বলিলেন : 'আপনাকে আমার বাঁশী শোনাব—আসুন!'

বাঁশী শুনাইবার জন্য তিনি আমাকে যেখানে লইয়া গেলেন, রাত্রি হইলেও চিনিতে পারিলাম, প্রথম পরিচয়ের দিন দূর হইতে লালরঙের যে-বাড়ীটা দেখাইয়াছিলেন, সেই বাড়ী। ফটক পার হইয়া মিস্তিরমশাই আমাকে বাড়ীর ভিতরে লইয়া গেলেন। আধুনিক ধরণে সুসজ্জিত চমৎকার বাড়ী। এখানে বোধ হয় তিনি চাকরি করেন। সবাই দেখিলাম তাঁহার চেনা। একটা চাকর তাঁহাকে দেখিবামাত্র তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ির কাছে গিয়া একটা ছবি দেখিয়া আমি থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। মিস্তিরমশাই বলিলেন : 'ও কি দেখছেন ? আসুন, ও আমারই ছবি।'

অবাক্ হইয়া তাঁহার মুখের পানে তাকাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম : 'এ বাড়ী কি তাহ'লে—'

মিস্তিরমশাই বলিলেন : 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার। এ-সব আমার ভাল লাগে না মশাই, আসুন আমার সঙ্গে।'

এই বলিয়া দোতলার একটেরে গিয়া নিজের পকেট হইতে চাবি বাহির করিয়া তালা খুলিয়া যে-ঘরটায় তিনি আমাকে লইয়া গিয়া বসাইলেন, দেখিয়া মনে হইল, এ ঘরখানা যেন এ বাড়ীর নয়। মাটিতে একটা বিছানা পাতা, চারিদিকে খবরের কাগজ ছড়ানো, একটা ষ্টোভ, কেট্‌লি ও কয়েকটা চায়ের কাপ এদিক ওদিক গড়াগড়ি যাইতেছে। আসবাবপত্রের চিহ্নমাত্র নাই।

মিত্তিরমশাই বলিলেন: 'এ ঘরে আমি কাউকে ঢুকতে দিই না মশাই, এ হচ্ছে গিয়ে একেবারে নিজস্ব আমার। বসুন, সিগ্রেট খান।'

এই বলিয়া তিনি তাঁহার পকেট হইতে বাঁশীর গাদা বাহির করিতে লাগিলেন।

বাহিরে বারান্দার উপর কাহার যেন ভারি পায়ের শব্দ পাইয়া পিছন ফিরিয়া তাকাইতেই দেখি, বিশালকায় এক ভদ্রমহিলা আমাকে দেখিয়াই সরিয়া গেলেন।

মিত্তিরমশাই বলিলেন: 'দেখলেন ত'? আমার স্ত্রী।'

বাহিরে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বোধ হয় চাকরকে বলিতেছেন: 'জিজ্ঞাসা কর ত, কোথায় ছিল সারাদিন!'

মিত্তিরমশাই চীৎকার করিয়া উঠিলেন: 'যেখানেই থাকি তোমার কি?—নবদ্বীপ গিয়েছিলাম, এবার বৃন্দাবন চলে যাব।—আমার সঙ্গে কারও কোনও সম্বন্ধ নেই মশাই, আমি একা।'

বাহিরে আবার তাঁহার স্ত্রীর গলার আওয়াজ!—'আমার ঘর থেকে দশটা টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে কি না জিজ্ঞেস কর্!'

মিত্তিরমশাই বলিলেন: 'নিয়েছি বেশ করেছি! কই, আপনিই বলুন ত' মশাই, রোজ আটগণ্ডা পয়সায় মানুষের চলে?'

'আচ্ছা!' বলিয়া পায়ের শব্দে বুঝিলাম তাঁহার গৃহিণী তাঁহাকে শাসাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম: 'আপনার আর কে আছে বাড়ীতে? ছেলেপুলে?'

'আমার কেউ নেই মশাই, বললাম না? আমি একা।'

চুপ করিয়াই রহিলাম। মিত্তিরমশাই কি যে ভাবিলেন কে জানে! হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, 'একটা মেয়ে আছে। দশ হাজার টাকা খরচ

ক'রে বিলেতফেরত জামাই-এর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হলো। এই বাড়ীতেই থাকে, কিন্তু—'

বলিয়া তিনি ঘাড় নাড়িলেন। চুপি চুপি বলিলেন, 'দুজনের বনিবনাও নেই।'

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম : 'ছেলে নেই ?'

'না, আমার কেউ নেই মশাই, আমি একা। আমি আপনার বেশ আনন্দেই থাকি, আমাকে ও-সব কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।'

আমার আর কিছু জিজ্ঞাসা করিবার ছিলও না।

কেমন করিয়া এখান হইতে উঠিব তাহাই ভাবিতেছি, এমন সময় তিনি তাঁহার বাঁশীতে ফুঁ দিলেন।

বস্তির মাসী মিথ্যা বলে নাই। মনের আনন্দে মানুষ অনেক কিছু করে শুনিয়াছি, কিন্তু এরকম অদ্ভুত বাঁশী বাজাইয়া আনন্দলাভ করিতে আমি এই মিত্তিরমশাইকেই প্রথম দেখিলাম।

বাঁশীতে ফুঁ পড়িবার আগেই আমার উঠিয়া যাওয়া উচিত ছিল, এখন যদি একটার পর একটা করিয়া ওই এতগুলো বাঁশীর উপর তাঁহার কসরত চলিতে থাকে, তাহা হইলে সারা রাত্রেও আজ আর আমার যাওয়া হইবে না। এই ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাইতেছি, এমন সময় ভগবান রক্ষা করিলেন। একটা চাকর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল : 'বাবু, আপনার খাবার—'

বাঁশী বন্ধ হইয়া গেল। মিত্তিরমশাই হাতের বাঁশীটা তাহার গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিলেন : 'ফের যদি এ-ঘরে ঢুকবি ত' তোর পা আমি খোঁড়া করে দেবো। বুঝলেন মশাই, রোজ এমনি। ঠিক আমার বাঁশীটি যে সময় জমে আসে সেই সময় ওরা আমাকে বাধা দেয়। এখানে মানুষ থাকে মশাই ? ছিঃ!'

এই অবসরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম : 'আমি চলি। আমার কাজ আছে।'

'যাবেন ?' বলিয়া তিনিও উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

এক সঙ্গেই নিচে নামিয়া আসিলাম। ফটকের কাছে আসিয়া মিত্তিরমশাই বলিলেন : 'আপনি কিছু জানেন না মশাই ?'

বলিলাম : 'কি জানি না ?'

'সেই যে সেদিন বললেন, ওরা সব ইয়ে।'

কথাটা ভাল বুঝিতে পারি নাই। বলিলাম: 'কারা?'

'ওই যে মশাই, বস্তিতে—'

হাসিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, 'ইয়েই ত।'

মিস্তিরমশাই বলিলেন: 'তা হোক গে, না কি বলেন? আমার কিন্তু বিশ্বাস হলো না।'

নমস্কার করিয়া বলিলাম, 'আসি।'

তিনি বলিলেন: 'কিন্তু দেখুন, ঘর আমার একখানা চাই-ই। কাল আমি আবার খুঁজতে বেরুবো।'

ঘর তাঁহার একখানি চাই বুঝিলাম। আবার যে তিনি খুঁজিতে বাহির হইবেন তাহাও জানি। ঘরের সন্ধানে কে যে তাঁহাকে ঘরছাড়া করিল কে জানে! বাহিরে সে-রকম ঘর একখানি কোথায় আছে জানি না বলিয়াই কোন রকমে মুখ বুজিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলাম।

পরে আর তাঁহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই।

রাজ-যোটক

বিবাহ বিনোদ কিছুতেই করিবে না।

সর্বনাশ! এ বলে কি!

বয়স মাত্র পঁচিশ, স্বাস্থ্য ভাল, দেখিতে চমৎকার, কলিকাতা শহরে নিজের একখানি বাড়ী, চাকরি করে, একশ' টাকা বেতন, তাহার উপর না আছে বাপ-মা, না আছে আত্মীয়-স্বজন। অথচ বলে, বিবাহ করিবে না!

কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা যাঁহারা, তাঁহারা ত অবাক্!

কেহ বলেন, 'রোগ-টোগ আছে।'

কেহ বলে, 'দাঁও মারিতে চায়।'

এমনি করিয়াই কাটিল কিছুদিন।

তাহার পর সে-বৎসর তখন বসন্তকাল, কলিকাতা শহরেও কোকিল ডাকিতেছিল, প্রজাপতি উড়িতেছিল এবং শুধু সেইজন্যই কি-না জানি না, হঠাৎ শোনা গেল বিনোদ বিবাহ করিয়াছে।

বিবাহ করিয়াছে, অথচ বৌটি তেমন ভাল নয়, অর্থাৎ সুন্দরী নয়। মনের মিল হইয়াছে কিনা কে জানে, কিন্তু নামের মিল হইয়াছে চমৎকার।

বিনোদের নাম বিনোদ, আর তার বৌ-এর নাম বিনোদিনী।

বিনোদ বলে, 'তা হোক। ওর কাছে আমি যাব না। ও রইলো ওর বাপের বাড়ীতে।'

বিনোদিনীর বাপের বাড়ী কলিকাতার কাছাকাছি ছোট্ট একটি গ্রামে।

বিবাহ হইয়াছে বসন্তকালে, তাহার পরেই আসিল গ্রীষ্ম, এবং তাহার পরেই বর্ষা। কবিরা বলেন, বর্ষায় বিরহিণীদের নাকি বড় কষ্ট হয়। বিনোদের দয়ার শরীর। কষ্ট সে কাহারও সহ্য করিতে পারে না।

সেদিন শনিবার। সকাল সকাল আপিসের ছুটি। বৃষ্টির জলে ভিজিতে ভিজিতে দেখা গেল, বিনোদ চলিয়াছে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। তাহার পর কেমন করিয়া না জানি অন্যমনস্কভাবে সন্ধ্যার অন্ধকারে সে গিয়া দাঁড়াইল বিরহিণী বিনোদিনীর বাপের বাড়ীর দরজায়।

চার মাস আগে যাহাকে সুন্দরী বলিয়া মনে হয় নাই, সেদিন বাদলরাত্রে লণ্ঠনের আলোকে তাহাকেই সহসা অসামান্যা সুন্দরী বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সারাটি রাত্রি চোখে ঘুম আসিল না। প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত পূর্ণযৌবনা বিনোদিনীকে লইয়া হাসিতে, গল্পে রাত্রিটা তাহার কাটিল মন্দ নয়।

পরদিন রবিবার। সকাল হইতে বৃষ্টির বিরাম নাই। খড়ো চালের ছাঁচ গড়াইয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল ঝরিতেছে, আর ঘরের ভিতর খোলা জানালার পাশটিতে বিনোদ আর বিনোদিনী মুখোমুখি শুইয়া। কি আনন্দে যে দিনটা তাহাদের কাটিল তা তাহারাই জানে।

আজিকার রাত্রিটি ফুরাইলেই—বাস্, কাল সোমবার, বিনোদকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। কথা যেন আর তাহাদের শেষই হয় না।

বিনোদ হঠাৎ বলিয়া বসিল, 'আচ্ছা, বিনোদিনী, আমাদের এত সুখ সইবে ত ?'

বিনোদিনী বলিল, 'ও কি কথা গো ! কেন, সইবে না কেন ?'

'ধর, হঠাৎ যদি আমি মরে যাই !'

'ছিঃ !' বলিযা বিনোদিনী দু'হাত দিয়ে বিনোদের মুখখানা চাপিয়া ধরিল।

বিনোদ বলিল, 'ছাড় !'

বিনোদিনী বলিল, 'আর বলবে ?'

'বলব না।'

বিনোদিনী তখন ছাড়িয়া দিল। বলিল, 'না, ও কি কথা ! ছিঃ !'

বিনোদ বলিল, 'ভাল তুমি তাহ'লে আমাকে বাসো !'

বিনোদের মুখের পানে তাকাইয়া সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া সে মাথা হেঁট করিল।

বিনোদ তাহাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'জানি'।

শনিবার আপিস ছুটির পর বিনোদকে আজকাল আর কলিকাতায় দেখা যায় না।

প্রতি শনিবার সে বিনোদিনীর কাছে যায়, রবিবার থাকে, আবার সোমবার ফিরিয়া আসে।

এমনি করিয়া একটি বৎসর কাটিল।

তাহার পর দ্বিতীয় বৎসরটাও আরম্ভ হইয়াছিল ঠিক তেমনি করিয়াই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহা আর টি কিল না।

বিনোদিনী হইল একটি সন্তানের জননী।

যৌবনের উচ্ছলতা তখন অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

বিনোদ বলিল, 'চল, এবার কলকাতায় চল।'

কথাটা বিনোদ অনেকবার বলিয়াছে, কেন জানি না, বিনোদিনী কোনোবারেই রাজি হয় নাই। এবার আর সে না বলিতে পারিল না। ছেলে কোলে লইয়া বিনোদিনী তাহার কলকাতার বাড়ীতে আসিয়া প্রবেশ করিল।

ফাঁকা বাড়ী। নিজেই গৃহিনী, নিজেই সব।

রান্না করিবার জন্য বিনোদ একজন লোক ডাকিয়া আনিল, ছেলে ধরিবার জন্য একটা ঝি রাখিল। বিনোদিনীর কোনোরকম কষ্ট যাহাতে না হয় বিনোদ তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, দু'দিন পরেই দেখা গেল, রাঁধুনী এবং ঝি—বিনোদিনী দু'জনকেই ছাড়াইয়া দিয়াছে।

বিনোদ বলিল, 'ওদের ছাড়ালে কেন?'

বিনোদিনী বলিল, 'মিছামিছি টাকা খরচ। তার চেয়ে তোমার মাইনেটা আমার হাতে এনে দিও—যেমন করে' হোক্ আমি চালিয়ে নেবো।'

বিনোদ বলিল, 'কচি ছেলে নিয়ে কষ্ট হবে না?'

বিনোদিনী বলিল, 'তা হোক্। কষ্ট হয়, আমার হবে।'

বিনোদ এ কৃপণতা পছন্দ করে না, তবু সে চুপ করিয়া রহিল। প্রতিবাদ করিবার প্রবৃত্তি হইল না।

মাসের প্রথমেই বিনোদিনী হাত পাতিয়া বসে, 'মাইনে পেলে? কই, দাও।'

টাকাটা হাতে তুলিয়া বিনোদকে দিতে কোনোদিনই হয় না। বিনোদিনী আদায় করিয়া লইতে জানে।

কিছুদিন পরেই ছেলেটা পড়িল অসুখে।

বিনোদ ডাক্তার ডাকিয়া আনিল, ঔষধের ব্যবস্থা করিল, অথচ বিনোদিনীর কাছে একটি পয়সাও সে চাহিল না।

ছেলেটা সারিয়া উঠিলে বিনোদিনী একদিন মুখভার করিয়া বলিল, 'তুমি আমাকে মিছে কথা বলেছ।'

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কখন ?'

বিনোদিনী বলিল, 'মাইনে তুমি আরও বেশি পাও, নইলে ডাক্তার ওষুধের টাকা কোথায় পেলে ?'

বিনোদ বলিল, 'ব্যাঙ্কে আমার কিছু টাকা আছে।'

সংবাদটা শুভ। শুনিয়া বিনোদিনী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, 'কত টাকা ? কই, আমাকে ত' কোনোদিন বলনি ?'

বিনোদ বলিল, 'আমাকে ত কোনোদিন জিজ্ঞাসা করনি।'

কিন্তু জিজ্ঞাসা আবার করিতে হয় নাকি ? স্ত্রীর কাছে স্বামী সব কথা খুলিয়া বলিবে, কপটতা, ছল-চাতুরি কিছুই করিবে না, ইহাই ত নিয়ম। বিনোদিনী খুশী হইয়াও যেন খুশী হইতে পারিল না। তাহার বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী বলিতে লাগিল, 'মিছিমিছি ডাক্তারে-ওষুধে অতগুলো টাকা খরচ করলে। কালীঘাটের মা-কালীর কাছে আমি মানত করেছিলাম, ছেলে আমার তাইতে সেরেছে, তা জানো ?'

বিনোদ বলিল, 'তা হবে।'

বিনোদিনী বলিল, 'তা হবে নয়। কাল রবিবার। চল, কাল সকালে মানতটা শোধ করে' আসি।'

মানত এমন বিশেষ কিছুই নয়। খরচ সামান্যই। সওয়া পাঁচ আনার সন্দেশ, এদিক-ওদিক দু'চারটে পয়সা, আর যাওয়া-আসা রিক্‌শা ভাড়া।

গঙ্গাস্নান এবং পূজা শেষ করিয়া সন্দেশের ঠোঙা হাতে লইয়া রিক্‌শায় চড়িয়া তাহারা বাড়ী ফিরিতেছিল। মোড়ের মাথায় গাড়ীঘোড়ার ভিড়ের জন্য রিক্‌শাওয়ালা দাঁড়াইয়া পড়িল। বিনোদের কোলে ছেলে, বিনোদিনীর হাতে সন্দেশের ঠোঙা।

ছোট একটি ছেলে রিক্‌শার পাশে আসিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল। মিনতিকাতর কণ্ঠে বলিল, 'কিছু খেতে দাও মা, বড় ক্ষিদে পেয়েছে।'

বিনোদিনী গম্ভীরভাবে মুখটা ফিরাইয়া লইল। বিনোদ বলিল, 'দাও না ওই ঠোঙ্গা থেকে কিছু।'

কথাটা বিনোদিনী যেন শুনিতেই পাইল না।

ভিখারী ছেলেটা আবার ডাকিল, 'মা!'

বিনোদ দেখিল ক্ষুধার্ত ছেলেটার চোখদুটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে। তাহার নিজের কাছে কিছুই নাই। বিনোদিনীর দিকে তাকাইয়া সে আবার বলিল, 'দাও না গো ওই থেকে দু'টো—'

কথাটা তাহার শেষ হইল না। বিনোদিনী বলিল, 'না।'

গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ছেলেটা পিছু-পিছু ছুটিয়াছে বোধ হয়। বিনোদের কানে আসিয়া বাজিল: 'মা গো!'

তাহার পর রিক্শার ঠুং ঠুং শব্দ ছাড়া আর যেন কিছুই সে শুনিতে পাইল না। চোখের সুমুখে একফালি রৌদ্রধূসর আকাশ, রাস্তার দু'পাশে বড় বড় বাড়ী, মুদির দোকান, স্যাকরার দোকান, পানের দোকান, চায়ের দোকান, সব-কিছু পার হইয়া রিক্শা যে কখন তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বিনোদ কিছুই বুঝিতে পারে নাই।

বিনোদিনীর ডাকে তাহার চমক ভাঙ্গিল।—'নামো! ঘুম পাচ্ছে নাকি?'

বিনোদ গাড়ী হইতে নামিল।

ঘরে ঢুকিয়া বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'জানি আমি, ঠাকুর-দেবতায় তোমার বিশ্বাস নেই, জোর করে' ধরে নিয়ে গিয়েছিলাম, তাই বুঝি তোমার ঘুম পাচ্ছে, না?—দ্যাখো ত আবার বলে কি-না—এই ঠোঙ্গা থেকে রাস্তার ওই ভিখিরীটাকে······নাও, খাও!'

বলিয়া ঠোঙ্গা হইতে গোটাকতক সন্দেশ সে বিনোদের হাতের কাছে ধরিয়া দিল।

বিনোদ তাহার টেবিলের ড্রয়ার টানিয়া মণিব্যাগটা বাহির করিয়া লইয়া বলিল, 'আসছি।'

'ঠাকুরদের ইয়ে ফেলে এই অসময়ে—'

আর কিছু না শুনিয়া বিনোদ বাহির হইয়া গেল।

মোড়ের মাথায় যেখানে তাহাদের রিক্শাটা দাঁড়াইয়াছিল বিনোদ

সেইখানে গিয়া দাঁড়াইল। এদিক্-ওদিক্ তন্নতন্ন করিয়া বহুবার খুঁজিল কিন্তু সেই ভিখারী-ছেলেটার দেখা সে পাইল না। ক্ষুধার্ত বালক আবার কাহার পিছু পিছু কোথায় চলিয়া গিয়াছে কে-জানে।

তাহারই সন্ধানে বিনোদ রাস্তায় রাস্তায় বৃথাই খানিকটা ঘুরিয়া মরিল। অবশেষে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী যখন সে ফিরিল, বেলা তখন অনেক হইয়াছে। দেখিল, উনানে আগুন দিয়া বিনোদিনী রান্না করিতে বসিয়াছে, আর ছেলেটা উঠানে নর্দমার কাছে গড়াগড়ি দিয়া চীৎকার করিতেছে।

ব্যাপার দেখিয়া বিনোদের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া আপনমনেই বলিতে লাগিল, 'কি রকম স্বভাব যে কে জানে! একটা লোক রাখলে—'

কথাটা শেষ হইবার আগেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, 'কি বললে?'

ভিখারী ছেলেটাকে না পাইয়া একেই তাহার মনের অবস্থা খারাপ হইয়াই ছিল, তাহার উপর খোকা কিছুতেই চুপ করিতেছে না, বিনোদ বলিল, 'বলছি তোমার মাথা! একটা লোক রাখলে কী এমন ভাগবত অশুদ্ধ হ'য়ে যেতো?'

বিনোদিনী বলিল, 'না না, ওই যে স্বভাব না কি বললে?'

বিনোদ বলিল, 'হুঁ, তোমার স্বভাব বড় খারাপ।'

বিনোদিনী বলিল, 'হ্যাঁ, শহুরে মেয়ের মত খুব যদি খরচ করিয়ে দিতে পারতাম তাহ'লে স্বভাব আমার ভাল হ'তো।—এসো, খাবে এসো তাড়াতাড়ি।'

বিনোদ খাইতে বসিল। কিন্তু বসিল আর উঠিল। খাইতে সে পারিল না কিছুই।

বিনোদিনী ভাবিল সে রাগ করিয়া খাইল না। এবং তাহার জন্য সারাদিন ধরিয়া বিনোদিনী গজ্ গজ্ করিতে লাগিল—'আমি সে রকম মেয়ে নই বাবা! স্বামীর একা-ঘর পেয়ে দু'দিনে সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দেবো—আমার দ্বারা তা চলবে না। তার জন্যে যদি স্বভাব খারাপ বল ত বল—আমার বয়েই গেল।'

বিনোদ দেখিল বাড়ীতে আজকাল দুধ আসে না, ঘি আসে না, মাছ আসে না—নিতান্ত গরীবের মত খাওয়া-দাওয়া চলিতেছে। ছেঁড়া কাপড় পরিয়া

বিনোদিনী ঘুরিয়া বেড়ায়। ভাল কাপড় জামা আনিয়া দিলে সে-সব সে বাক্সে তুলিয়া রাখে। ভাল খাবার আনিয়া দিলে চীৎকার করিতে থাকে।

বিনোদ বলিয়া বলিয়া হয়রান হইয়া গিয়াছে। বেশি কিছু বলিতে গেলে বিনোদিনী ভাবে তাহার বাপ-মা গরীব, স্বামী বোধ হয় তাহারই ইঙ্গিত করিতেছে, এবং এই লইয়া শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত বিশ্রী হইয়া ওঠে।

বিনোদ তাই চুপচাপ বাড়ীতে ঢোকে, আবার চুপচাপ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যায়। স্বভাবের পরিবর্তন যে বিনোদিনীর কোনোদিনই হইবে না তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে। হোটেলে রেষ্টুরেণ্টে খাইয়া বেড়ায়। বাড়ীতে দু'বেলা না খাইলে নয়, তাই সে নামমাত্র একবার করিয়া খাইতে বসে।

মাসের প্রথম। বিনোদের বেতনটা সেদিন বিনোদিনীর হাতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মনের অবস্থা বোধকরি তাহার ভাল ছিল। আহারাদির পর ঘর-সংসারের কাজকর্ম সারিয়া বিনোদিনী হাসিতে হাসিতে বিনোদের ঘরে আসিয়া ঢুকিল। শুইয়া শুইয়া বিনোদ একটা বই পড়িতেছিল। মুখ তুলিয়া বিনোদিনীর দিকে তাকাইল। মন্দ লাগিল না। কি যেন সে বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বিনোদিনী বলিয়া বসিল, 'দিয়েছি আজ আচ্ছা করে' শুনিয়ে!'

বিনোদ জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে?'

বিনোদিনী বলিল, 'ওই যে গো, ও-বাড়ীর সেই বৌটাকে। রোজ আসবে আর রোজ হাত পাতবে—দিদি, চারটি চিনি দেবে? চারটি আলু দেবে? একটু দুধ দেবে? একটা পান দেবে? কেন, আমি কি দানছত্র খুলেছি নাকি? আজ আমি এমন বলা বলেছি, লজ্জা থাকে ত' আর আসবে না।'

বিনোদ বলিল, 'হুঁ'।

আবার সে বই-এ মন দিয়াছিল, বিনোদিনী বলিল, 'কথাটা বুঝি তোমার ভাল লাগলো না?'

বিনোদ বোধকরি অন্যমনস্কভাবেই বলিয়া বসিল, 'না।'

বিনোদিনী বলিল, 'কেন, না কেন?'

বিনোদ বলিল, 'দিলেই পারতে।'

'রোজ? রোজ চাইবে আর রোজ দেবো?'

বিনোদের কোনও জবাব পাওয়া গেল না। সে চুপ করিয়া রহিল।

'তার বেলা চুপ করে রইলে যে? জবাব দাও!'

বিনোদ নিরুত্তর।

বিনোদিনী বোধ হয় রাগ করিল। বলিল, বুঝেছি। তাই ত বলি সুন্দরী মেয়ে—এত ঘন ঘন আমাদের বাড়ী আসে কেন? ও-সব চাওয়া তাহ'লে ওর ছল!'

বিনোদ বলিল, 'তার মানে?'

বিনোদিনী বলিল, 'ওর মতলব খারাপ। তোমারও নজর পড়েছে ওর দিকে।'

বিনোদ এইবার রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'ছোটলোক!'

এই 'ছোটলোক' কথাটি বিনোদিনী অনেকবার শুনিয়াছে। আজ আর তাহার সহ্য হইল না। এই লইয়া শেষ পর্যন্ত একটা তুমুল কাণ্ড করিয়া বসিল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'আমি ছোটলোক, আমার স্বভাব খারাপ, আমি তোমার সব উড়িয়ে পুড়িয়ে দিলাম, আমাকে বিয়ে করে তোমার মান-সম্মান সবই গেল, বেশ তাহ'লে আমি বিদেয় হই, আমাকে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে নিজে একটি বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করে' সুখে থাকো!'

বিনোদও প্রথম দিকে উত্তেজিত হইয়া দু'চার কথা বলিয়াছিল, শেষের দিকে তাহার নীরবতা, বিনোদিনীকে যেন আরও বেশি নাচাইয়া তুলিল। বলিল, 'আমি পুরনো হয়ে গেছি কিনা, আর আমাকে ভাল লাগছে না। কিন্তু এখন আমি মরব না, বাপের বাড়ী গিয়ে বেঁচে থেকে সব দেখবো। দেখবো—কত বড়লোকের মেয়ে কত তোমাকে সুখে রাখে!'

বিনোদিনীর একটা কথা বিনোদের বড় সত্য বলিয়া মনে হইল। মনে হইল বিনোদিনী সত্যই হয়ত তাহার কাছে পুরাতন হইয়া গিয়াছে। কিছুদিনের জন্য তাহাকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিলে মন্দ হয় না।

সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। বিনোদিনী অনেকদিন বাপের বাড়ী যায় নাই, এইবার কিছুদিনের জন্য সে পল্লীগ্রামে তার মা-বাপের কাছে গিয়া থাকিবে। এখন পৌষমাস। পৌষমাসে যাইতে নাই। যাইবে মাঘ মাসের প্রথমেই।

কিন্তু এদিকে একটা ভারি খারাপ ব্যাপার ঘটিয়া গেল। কিছুদিন হইতে বিনোদের শরীরটা বেশ ভাল চলিতেছিল না, কিছু খায় না অথচ

খাইবার ইচ্ছাও নাই, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, প্রত্যহ সন্ধ্যার দিকে মনে হয় যেন একটু একটু জ্বর হইতেছে, শীতকালের রাত্রে ঘাম যে কেন হয় বুঝিতে পারে না।

এতদিন ব্যাপারটাকে বিনোদ গ্রাহ্যই করে নাই। ভাবিয়াছিল এ-সব ঘটিতেছে শুধু মানসিক দুশ্চিন্তার দরুণ। জ্বরটা হঠাৎ একদিন একটু বেশি হওয়ায় সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। তাহার এক বন্ধু ডাক্তারের কাছে গিয়া পরামর্শ চাহিল।

ডাক্তার-বন্ধু পরীক্ষা যাহা করিবার করিলেন। প্রথমে শুধু পরিশ্রম করিতে নিষেধ করিয়া ও চেঞ্জে যাইবার উপদেশ দিয়া আসল কথাটা তিনি গোপন করিতেছিলেন। কিন্তু বিনোদের কেমন যেন সন্দেহ হইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'বল না টি-বি হয়েছে কিনা ? আমি বুঝতে পারছি।'

ডাক্তার বলিলেন, 'হ্যাঁ। দিন-দশেক পরে আমি আবার দেখবো। স্ত্রীপুত্রকে সরিয়ে দাও, নইলে নিজে কোনও সানাটোরিয়ামে চলে যাও।'

বিনোদের বুকের ভিতরটা কেমন যেন দুরদুর করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত যক্ষ্মাই হইল তাহার! এ রোগে মানুষ বড়-একটা বাঁচে না। নিজে ত মরেই, এমন কি কাছে যাহারা থাকে তাহাদেরও মারিয়া যায়। কিন্তু কেন? এ মারাত্মক ব্যাধি তাহার কেন হইল? ইহার জন্য কি তাহার স্ত্রীই দায়ী? এমনি সব নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে বিনোদ বাড়ী ফিরিল। বাড়ী ফিরিয়াই সে তাহার নিজের ঘরে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে বলিল, 'এ-ঘর থেকে তোমার জিনিসপত্র সব সরিয়ে নিয়ে যাও। এ-ঘরে আজ থেকে আমি একা থাকবো।'

বিনোদিনী বলিল, 'পারবো না। সারাদিন খেটেখুটে এই সব রাজ্যির জিনিস পত্তর আমি এখন টেনে টেনে সরাই! কেন, মাসের ত আর তিনটি দিন বাকি আছে, তিন দিন পরেই ত' আমি বিদেয় হব, এই তিনটে দিন আর সইছে না তোমার?'

বিনোদ বলিল, 'থাক্ তবে আমিই ওই সিঁড়ির পাশের ঘরটায় চলে যাচ্ছি।'

বিনোদিনী বলিল, 'আমি তোমার এত বিষ হয়ে গেলাম? এত চক্ষুশূল?'

মুখে কিছু না বলিয়া নিজের বিছানাটা তুলিয়া লইয়া বিনোদ ঘর হইতে চলিয়া গেল।

দোসরা মাঘ বিনোদিনীর যাইবার দিন স্থির হইয়াছে। বিনোদিনীর ছোট ভাই আসিবে। আসিয়া তাহাদের লইয়া যাইবে। বিনোদ মনে মনে ঠিক করিয়াছে, বিনোদিনীকে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া, হয় সে একলা এই বাড়ীতেই থাকিবে, আর নয় ত কোথাও কোনও সানাটোরিয়ামে চলিয়া যাইবে।

কিন্তু বিধাতা বোধ করি বাদ সাধিলেন।

যাইবার আগের দিন বিনোদিনী ঢুকিয়াছিল বিনোদের ঘরে তাহার সঙ্গে ঝগড়া করিবার জন্য।—'তাই বলে' মনে ক'রো না যে আমি জন্মের মতন যাচ্ছি।'

'আবার তুমি ঘরে ঢুকেছ?'—বিনোদ চীৎকার করিয়া বলিতে গেল, 'বেরোও!'

এবং বলিতে গিয়াই কাশি। আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে মুখ দিয়া খানিকটা কাঁচা রক্ত!

বিনোদিনী কাছে আগাইয়া আসিল। বলিল, 'ও কি? রক্ত?'

বিনোদ বলিল, 'হ্যাঁ, চলে যাও এখান থেকে, নইলে তুমিও মরবে।'

বিনোদিনী একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। দুইচোখ দিয়া দরদর করিয়া জল গড়াইয়া আসিল। ঠোঁট দুইটা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কি যেন বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না।

বিনোদ বলিল, 'এখনও দাঁড়িয়ে রইলে?'

বিনোদিনী তাহার বিছানার উপর ভাল করিয়া চাপিয়া বসিল। নিজেকে খানিকটা সামলাইয়া লইয়া বলিল, 'এ বেয়ারাম তোমার কবে থেকে হ'লো?'

বিনোদ বলিল, 'এ কী—তুমি জানো?'

বিনোদিনী বলিল, 'জানি। আমাদের গাঁয়ের তিনু কাকার হয়েছিল। কেউ তার পাশ ঘেঁষতো না। মরে গেল।'

শেষের কথাটা বলিতে গিয়া আবার তাহার চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

'দিদি!'

ডাক শুনিয়া বিনোদিনী তাকাইয়া দেখিল, তাহার ছোট ভাই হারু দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে নিতে এলি হারু ?'

হারু বলিল, 'জামাইবাবু লিখেছিল যে !'

বিনোদিনী বলিল, 'যাওয়া আমার হ'লো না হারু। আমি একখানা চিঠি লিখে দিই, তুই এক্ষুনি বাড়ী চলে যা। গিয়ে মাকে আর মেজদাকে পাঠিয়ে দিগে। বুঝলি ?'

বিনোদ ডাকিল, 'শোনো !'

বিনোদিনী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, 'কি ?'

'ও আবার কি করছ ? সবাইকে মারবে নাকি ?'

বিনোদিনী বলিল, 'মেয়েরা সহজে মরে না। তুমি থামো। খোকাকে বাঁচাতে হবে ত ?'

গ্রাম হইতে বিনোদিনীর মা আসিলেন। মেজদাদা আসিল। ফাঁকা বাড়ী, এই কয়জন মানুষেই আবার গমগম করিতে লাগিল।

মা রহিলেন খোকাকে আগলাইয়া, মেজদা ডাক্তার এবং ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন, আর বিনোদিনী কাহারও কোনও নিষেধ-বারণ না শুনিয়া বিনোদের কাছে পড়িয়া রহিল।

ডাক্তার আসিলে বিনোদিনীকে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতে হয়। নিউমোথোরাক্সের সময় তাহাকে সেখানে থাকিতে দেয় না।

দরজার কাছে তখন সে কান পাতিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। ডাক্তারের প্রত্যেকটি কথা উদ্‌গ্রীব হইয়া শুনিবার চেষ্টা করে। কিন্তু সেখান হইতে কিছুই সে শুনিতে পায় না।

মাসখানেক পরে দেখা গেল, বিনোদের জ্বর বন্ধ হইয়াছে, রক্ত কাশি সবই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার তখনও আসেন। রীতিমত চিকিৎসা চলিতে থাকে। বিনোদিনী কিছুই বুঝিতে পারে না।

একদিন সে তাহার মেজদাকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ডাক্তার কি বলে মেজদা ? উনি কেমন আছেন ?'

মেজদা বলিল, 'ভাল।'

বিনোদিনী বলিল, 'ভাল ত আমি চোখেই দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু

শুনেছি নাকি এ-রোগ হ'লে মানুষ বাঁচে না। সেই কথাটা ডাক্তারকে একবার তুমি জিজ্ঞাসা করতে পারো ?'

'না, তা আমি পারবো না।' বলিয়া মেজদা চলিয়া গেল।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রোগী দেখিয়া ডাক্তার সেদিন সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিতেছিলেন, লজ্জা-শরম পরিত্যাগ করিয়া বিনোদিনী নিজেই তাঁহার সুমুখে গিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'উনি কেমন আছেন ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'ভালই আছেন।'

বিনোদিনী বলিল, 'ওরকম মন-রাখা কথা আমি অনেক শুনেছি। আপনি বলুন—উনি আর কতদিন বাঁচবেন !'

ডাক্তার ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, 'আপনার স্বামী সেরে গেছেন।'

বিনোদিনী বলিল, 'এ ব্যারাম হ'লে মানুষ সারে ?'

ডাক্তার বলিলেন, 'সারে। তাড়াতাড়ি জানতে পারলে নিশ্চয়ই সারে।'

'সত্যি বলছেন ?'

'হ্যাঁ, সত্যি বলছি।'

বিনোদিনী খুশী হইয়া বিনোদের ঘরে গিয়া ঢুকিল। সিঁড়ির পাশেই বিনোদের ঘর। সে যে শুইয়া শুইয়া সব কথা শুনিয়াছে তাহা সে বুঝিতে পারে নাই। আজকাল মেজাজ তাহার একটুখানি রুক্ষ হইয়া গিয়াছে। বিনোদিনীকে দেখিয়াই সে বলিয়া উঠিল, 'আর বুঝি সেবা করতে পারছো না ?'

বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কেন ?'

বিনোদ বলিল, 'লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে ডাক্তারকে তাই জিজ্ঞাসা করতে গিয়েছিলে—আমি কবে মরব !'

দাঁতে দাঁত চাপিয়া বিনোদিনী বলিল, 'হ্যাঁ।'

বলিয়াই সে হুমহুম করিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল। বুকের ভিতরটা তাহার তোলপাড় করিতে লাগিল। সারা পৃথিবীটা মনে হইল যেন ঘুরিতেছে। —না না, সব মিথ্যা, সব ছলনা। সকলেই তাহাকে স্তোকবাক্য দিয়া ভুলাইতে চায়। এ-রোগে মানুষ কখনও বাঁচে না। তাহাদের গ্রামের তিনুকাকাকে সে স্বচক্ষে মরিতে দেখিয়াছে। ময়না-বৌএর বাবা

মরিয়াছে, মা মরিয়াছে, দুটি ভাই মরিয়াছে এই রোগে। কাহাকেও সে বাঁচিতে দেখে নাই। ডাক্তার, ঔষধ, পথ্য, কিছুই নয়। ডাক্তারদের শুধু টাকা লইবার ফন্দী। হরদম তাহাদের টাকা লইতে হয় বলিয়া মুখে তাহারা সান্ত্বনা দেয়—ভাল আছে। শিবের অসাধ্য এ ব্যারাম সারাইবার সাধ্য মানুষের নাই।

বিনোদিনী তাই আশ্রয় লইল দৈবের। নির্বিচারে চলিল ব্রত-উপবাস, পূজা-অর্চনা, আর নিজের উপর অমানুষিক অত্যাচার। সময় নাই, অসময় নাই, স্নান আর ঠাকুর-দেবতার কাছে মাথা কুটিয়া কুটিয়া প্রার্থনা,—এই হইল তাহার সারাদিনের কাজ।

মা নিষেধ করিলেন, মেজদা নিষেধ করিল। কিন্তু কাহারও নিষেধ-বারণ সে শুনিল না। এমন-কি বিনোদের ঘরে যাওয়া পর্যন্ত সে বন্ধ করিয়া দিল।

বিনোদ এক-একদিন জিজ্ঞাসা করে, 'কোথায় সে ?'

মেজদা বলে, 'ডেকে দেবো ?'

বিনোদ বলে, 'না, থাক্।'

মনে-মনেই ঈষৎ হাসিয়া বলে, আরোগ্য-আশাহীন এই পরিচর্যায় নিশ্চয়ই সে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহা ছাড়া নিজের মরিবার ভয় ত' একটা আছে। এতদিন পরে হয় ত' সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছে।

বিনোদকে দেখিয়া ডাক্তার বলিলেন, 'আর ভয় নেই। এবার তুমি চেঞ্জে যাও!'

তাহাই স্থির হইল। চেঞ্জে যাইবার সমস্ত ব্যবস্থাই ঠিক। জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদা চলিতেছে, এমন সময় মা আসিয়া বিনোদকে খবর দিলেন, বিনোদিনীর ভয়ানক জ্বর আর কাশি।

আর কিছু বলিবার প্রয়োজন হইল না। সকলেই বুঝিল, তাহার যক্ষ্মা হইয়াছে। হইবার কথাই।

বিনোদের চেঞ্জে যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। বিনোদিনীর বাপের বাড়ী যাইবার আগের দিন বিনোদও ঠিক এমনি করিয়াই তাহার যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল।

ডাক্তার আসিলেন। রোগিনীকে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া গেলেন, যক্ষ্মা নয়, নিমোনিয়া।

তবু রক্ষা। সকলেই আশ্বস্ত হইল। মা বলিলেন, 'যখন-তখন চান করতে আমি কত বারণ করেছিলাম। কিন্তু বারণ শোনবার মেয়ে ও নয় বাছা!'

যাই হোক্, চিকিৎসা চলিতে লাগিল। অক্সিজেন দেওয়া হইল।

এবং কয়েকদিন চিকিৎসার পর সেদিন সন্ধ্যায় বিনোদিনী অচৈতন্য অবস্থায় ক্রমাগত ভুল বকিতেছিল। বিনোদ শিয়রের পাশে বসিয়া আছে, এদিকে মা দাঁড়াইয়া আছেন তাহার ছেলেটিকে কোলে লইয়া। বিনোদিনী হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় ক্ষীণকণ্ঠে কি যেন বলিতে লাগিল। এমন সে আজ কয়েকদিন ধরিয়া কতই বলিতেছে, সেদিকে কান দেওয়া কেহই প্রয়োজন মনে করিল না। কিন্তু বিনোদ ছিল কাছেই বসিয়া। সে-ই শুধু স্পষ্ট শুনিতে পাইল, বিনোদিনী বলিতেছে: 'আমি ছোটলোক। বড়লোকের মেয়ে একটি এনো! সুখে থেকো। আমি দেখবো।'

তাহার পরেই সব চুপ! বিনোদ তাহার মুখের পানে একাগ্রদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ডাকিল, 'বিনোদিনী!'

সে ডাক সে শুনিতে পাইল কি না কে-জানে! দেখা গেল তাহার স্তিমিত দুইটি চোখের কোণ বাহিয়া ক্ষীণ দুইটি অশ্রুর ধারা গড়াইয়া পড়িতেছে।

ডাক্তার ঘন-ঘন নাড়ী দেখিতেছিলেন। হঠাৎ এক সময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'শেষ।'

বিনোদের বাড়ীখানি আবার তেমনি আগেকার মতই ফাঁকা। বিনোদিনী চলিয়া গিয়াছে, ছেলেটিকে লইয়া তাহাব মাও চলিয়া গিয়াছেন।

বিনোদিনীর সঙ্গে তাহার বোধকরি শুধু নামের মিলই হইয়াছিল, মনের মিল হয় নাই। এবং সেইজন্যই কিনা জানি না, বিনোদিনীর শেষ অনুরোধ বিনোদ কিছুতেই রক্ষা করিল না।

আবার সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, বিবাহ সে জীবনে কোনো দিনই করিবে না।

সেতু বন্ধন

বুড়ী তাহার ছেলের সঙ্গে ঝগড়া করে। বলে, 'আচ্ছা ছেলে বাবা তুই। একটা ভাড়াটে ডেকে আনতে পারিস না?'

কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলে কানাই। চাকরি করে কোথায় কোন্ একটা কারখানায়। সকাল সকাল চারিটি ভাত খাইয়া খাঁকি রঙ-এর একটা হাফ্-প্যাণ্ট পরিয়া শোলার টুপি মাথায় দিয়া বাহির হইয়া যায়। ফিরিয়া আসে সন্ধ্যায়। বলে, 'আমার অবসর কোথায় মা?'

বুড়ী বলে, 'অবসরও নেই, টাকাও নেই। সংসার আমি কেমন করে' চালাই বল্ দেখি।'

তা সে কথা সত্যি।

কানাই চাকরি করে অথচ একটি পয়সাও কোনোদিন মা'র হাতে আনিয়া দেয় না। নিচের তলার দু'ঘর ভাড়াটের কাছ হইতে যাহা পাওয়া যায়, তাই দিয়া সংসার চলে। মা ও ছেলের সংসার। খরচ অবশ্য বেশি নয়।

কিন্তু খরচ যেমন বেশি নয়, তেমনি আবার বারো মাস ভাড়াটেও থাকে না। দক্ষিণ দিকের ঘর দু'খানা ভাল। সেদিকের ভাড়াটে আজ প্রায় এক বৎসর রহিয়াছে। কিন্তু উত্তর দিকের ঘর দু'খানা ছোট এবং একটুখানি চাপা। ভাল করিয়া আলো-বাতাস খেলে না। কাজেই ভাড়াটে যাহারা আসে, দু'এক মাস থাকিয়াই চলিয়া যায়। আশ্বিন মাসে সেই যে গিয়াছে, এখন বৈশাখের প্রথম, বৎসর ঘুরিয়া গেল, তবু ভাড়াটে আসিল না।

বুড়ী দিবারাত্রি কান খাড়া করিয়া থাকে। বাহিরের দরজায় কড়া নড়িলেই ভাবে বুঝি ভাড়াটে আসিয়াছে। তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দেয়।

ঘর দু'খানা যদি কেহ দেখিতে আসে, বুড়ী তাহাকে প্রথমেই বলে, 'দেখতে মনে হচ্ছে চাপা, কিন্তু ওই যে দেখছো বাবা, দুটো ঘুল্‌ঘুলি, ওই পথে এত হাওয়া আসে, হাওয়ায় একেবারে উড়িয়ে নিয়ে যায়।'

ভাড়াটের জন্য বুড়ী যেন একেবারে পাগল হইয়া গিয়াছে।

এদিককার ভাড়া আগে পাওয়া যাইত বারো টাকা, বুড়ী এখন দশ টাকাতেই রাজী। বলে, 'তা দু'টো টাকা না-হয় কমই দিয়ো বাছা। আমার অভাব কিছু নেই। ছেলে আমার চাকরি করে।'

কিন্তু চাকরি না ছাই, আসলে বুড়ী চায় ভাড়াটে।

ভাড়াটে চাহিবার দুইটা কারণ আছে। প্রথম কারণ—টাকা, সেকথা সবাই জানে। দ্বিতীয় কারণ যে কি, সেকথা এক বুড়ী জানে—আর আমরা জানি।

দক্ষিণ দিকের ভাড়াটে যতীন বছরখানেক আগে প্রথম যখন এখানে আসে, সঙ্গে আসিয়াছিল তাহার দিব্যি ফুটফুটে সুন্দরী একটি স্ত্রী আর তিনটি ছোট ছোট ছেলে। দু'টি বড় আর একটি কোলে।

যতীনের স্ত্রী রাধাকে দেখিয়াই কি জানি কেন বুড়ীর বড় ভাল লাগিয়াছিল। বলিয়াছিল: 'আহা, এই কম বয়সে তিন-তিনটি ছেলে হয়েছে মা তোমার?'

সলজ্জ একটুখানি হাসিয়া মাথা হেঁট করিয়া রাধা বলিয়াছিল, 'হ্যাঁ মা।'

তাহার পর সেই যে তাহাকে সে মা বলিয়া ডাকিল, একটি দিনের জন্যও মা বলা সে আর পরিত্যাগ করে নাই। বুড়ী যেন সত্য সত্যই রাধার মা হইয়া উঠিল। ঠিক মায়ের মতই যত্ন করে, ভক্তি করে, ভাত রাঁধিয়া দেয়, কাপড় কাচিয়া দেয়, উপর নিচে দুইটা সংসারের কাজ—

রাধা বলে, 'ভারি ত দু'টো মানুষের সংসার মা, তার আবার কাজ, তার আবার কথা!'

বুড়ী বলে, 'সত্যি রাধা, তুই আমার মেয়ে ছিলি আর জন্মে।'

রাধা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসে। বলে, 'তুমি আমার এই কোলের ছেলেটাকে নিয়ে খেলা কর মা ততক্ষণ, আমি নিচে থেকে জল ধরে' আনি।'

বলিয়া সে দুই হাতে দুইটা বড় বড় বালতি লইয়া দুমদুম করিয়া সিঁড়ি ভাঙিয়া নিচে নামিয়া যায়।

বুড়ী বলে, 'তা ওইটুকু মেয়ে হ'লে কি হবে, বাঁধন আছে মেয়ের! নইলে এই বয়সে তিন-তিনটে ছেলে, অন্য মেয়ে হ'লে মরে যেত।'

আর একটি সন্তান প্রসব করিয়া আজ মাস দুই-তিন হইল রাধা তাহার মরিয়া গিয়াছে। এবং মরিয়াছে সিঁড়ির নিচের ওই ঘরটায়।

সুতরাং শুধু যে টাকার জন্যই বুড়ী ভাড়াটে চায় তাহা নয়, সন্ধ্যার অন্ধকার

নামিলেই গা'টা তাহার কেমন যেন ছমছম করিতে থাকে। প্রত্যহই আচমকা মনে হয় রাধা যেন তাহার কাছেই দাঁড়াইয়া আছে। মরিতে সে চায় নাই তবু তাহাকে মরিতে হইয়াছে। মরিবার সময় তাহার নাবালক শিশুগুলিকে দেখিবার জন্য বুড়ীকে সে তাহার সকরুণ মিনতি জানাইয়া গিয়াছে। বুড়ীর চোখের সামনে এক-একদিন হঠাৎ তাহার সেই মুখখানি ভাসিয়া ওঠে। ছুটিয়া কোথাও পালাইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু কোথায় যাইবে? যতীনের বড় ছেলেটি পাঁচ ছ' বছরের, মেজটির বয়স বছর চারেক, তার পরেরটি দু'বছরের এবং সর্বকনিষ্ঠের এখনও একটি বছরও ফিরিয়া আসে নাই।

বড় ছেলেটির উপর বাকী তিনটির তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া, হোটেল হইতে ভাত আনিয়া নিজে খাইয়া ছেলেদের খাওয়াইয়া, ছোটটার জন্য দুধ রাখিয়া দিয়া যতীন সেই যে সকালে আপিসে চলিয়া গিয়াছে, ফিরিয়া আসিবে রাত্রি দশটায়। বুড়ীর নিজের ছেলে কানাইয়ের নাকি রাত্রেও এক-একদিন কাজ পড়ে এবং এই হাড়ভাঙা খাটুনি বরদাস্ত করিবার জন্য প্রত্যহই তাহাকে একটু করিয়া মদ্যপান করিতে হয়। মাত্রা বেশি হইয়া গেলে সেদিন আর বাড়ী ফেরে না।

কিন্তু কোথায় থাকে ছেলেকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করিবার জো নাই! জিজ্ঞাসা করিলেই সে বুড়ীকে তাড়িয়া মারিতে আসে। বলে, 'চোখে ভাল দেখতে পাই যে, রাত্তিরে বাড়ী ফিরবো? রাত্তিরে বাড়ী ফিরতে গিয়ে একদিন যদি গাড়ীচাপা পড়ি, তাহ'লেই ব্যস্।'

বুড়ী বলে, 'ষাট্ ষাট্। কাজ নেই বাবা তোর বাড়ী এসে। আমি শুধু বলছিলাম—'

কথাটাকে শেষ করিতে না দিয়া কানাই বলে, 'কেন মা, তোমার যতীন কি করে? তাকে বলতে পারো না?'

বুড়ী বলে, 'তাকে বলব কখন? সে-ই সকালে বেরিয়ে যায়, আর বাড়ী ফেরে রাত্রে। ছেলেগুলোর কষ্ট দেখলে চোখে জল আসে।'

কানাই খানিকক্ষণ কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'ওকে আর একটা বিয়ে করতে বল।'

বুড়ী বলিল, 'সেদিন এক ঘটকীকে বলেছি, কানাই। বলেছি—আমাকে দু'টি ভাল ভাল মেয়ে দেখে দাও। একটি যতীনের জন্যে, আর-একটি

তোর জন্যে। আমারও আর বৌ না-হ'লে ঘর মানায় না, আর যতীনের ত' সংসার অচল।'

বিবাহের নাম শুনিয়া কানাই বোধকরি মনে মনে অত্যন্ত খুশী হইল। ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'এবার তাহ'লে তোমাকে আর ভাত রাঁধতে হবে না মা। কি বল?'

বুড়ী বলিল, 'হ্যাঁ বাছা, এইবার আমার বৌমা এসে রাঁধবে।'

কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, বৌমা আর আসে না!

ঘটকীর দোষ নাই। প্রতি সপ্তাহেই সে দু'একজন করিয়া মেয়ের বাপকে ধরিয়া আনিয়াছে। কিন্তু তাহাদের না-পছন্দ হইয়াছে যতীনকে, না-কানাইকে। যতীনের এতগুলি ছোট ছোট ছেলে, তাহার উপর না-আছে বাড়ী ঘর, না-আছে কোনও সংস্থান, পছন্দ তাহাকে না-হইবার কথাই।

এদিকে কানাই কিন্তু চীৎকার করিয়া মরে। বলে, 'ব্যাটাদের সব বুজরুকি। মেয়ে ওদের কারও নেই।'

ঘটকী বলে, 'তাই কি আর হয় বাছা! মেয়ে আমি নিজে দেখে এসেছি যে! পরমা সুন্দরী মেয়ে।'

কানাই বলে, 'পরমা সুন্দরী ত আমাকে পছন্দ হ'ল না কেন? যতীনের না হয় চাল-চুলো কিছু নেই, আমার ত রয়েছে।'

বুড়ীমা কথাটা শেষ করে। বলে, 'কলকাতা শহরে দোতলা বাড়ী রয়েছে, ছেলের মা রয়েছে, তার উপর ছেলে আমার সাহেবের কাছে চাকরি করে, এতেও যদি পছন্দ না হয় ত মিনসেদের মুখে ঝাঁটা!'

এমনি করিয়াই দিন চলিতেছে, এমন দিনে বুড়ীর বাড়ীর নিচের তলার যে-অংশটা খালি পড়িয়াছিল সেইখানে একঘর ভাড়াটে আসিল। —বৃদ্ধ বাপ, বাপের এক বিধবা বোন, আর একটি পনেরো-ষোলো বছরের সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির নাম—কানন। বামুনের মেয়ে। বাপ অবিনাশ চাটুজ্যে—কাশ্যপ গোত্র, কুলীন। সে-সব কথা বুড়ী আগেই জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছে। কানাই-এর সঙ্গে বিবাহ দিয়া মেয়েটিকে বৌ করিতে কোনও বাধা নাই। কিন্তু ছেলের মা হইয়া সে-কথা তাহাদের আগে হইতে বলা চলে না।

বুড়া অবিনাশ চাটুজ্যের মাথার চুল সব সাদা হইয়া গিয়াছে, মুখের দু'পাটি দাঁতই বাঁধান, কিন্তু শরীরে শক্তি বোধহয় এখনও আছে। অতি প্রত্যুষে

শয্যা-ত্যাগ করিয়াই বাজারের জিনিস-পত্র আনিয়া দেয়, পিসি-ভাইঝিতে রান্না করিতে বসে, তাহার পর সকাল সকাল স্নান করিয়া যাহা পায় তাহাই চারিটি মুখে দিয়া কাছারি চলিয়া যায়। সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেচারা কি-যে রোজগার করে সে-ই জানে, সন্ধ্যায় পর বাড়ী ফিরিয়া আপন মনেই বিড়বিড় করিয়া বকে, আবার কখনও বা জোরে জোরে চীৎকার করিয়া বকে, আবার কখনও বা ঝাঁঝালো সুরে চেঁচাইয়া কাহাকে যেন গালাগালি করিতে থাকে।

তাহার এই গালাগালি শুনিয়া বুড়ী সেদিন ভাবিল, বুঝি বা মেয়েটাকে বকিতেছে। তাই সে তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া আসিয়া কাননের কাছে গিয়া চুপি-চুপি জিজ্ঞাসা করিল, 'বাবা তোমায় বকছে কেন মা? কি, করেছ কি?'

কানন তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'আমাকে নয়। বাবার এক সৎ-ভাই আছেন দেশে, সেই তাঁকে।'

বুড়ী বলিল, 'ওমা, তাই নাকি? রোজই অমনি বকে শুনতে পাই।'

অবিনাশ বোধহয় বুড়ীর কথাটা শুনিতে পাইল। বলিল, 'বকবো না? একশ'বার বকবো। বকবো, গালাগাল দেবো, মারবো, খুন করবো। আমাকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়-সম্পত্তি তুই একা ভোগ করবি? আর আমি এখানে বুড়ো বয়স পর্যন্ত খেটে মরবো?'

ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া বুড়ী উপরে উঠিয়া গেল।

কানাই আজকাল সকাল সকাল বাড়ী ফিরিয়া আসে। তাহার পর কোথাও সে আর বাহির হয় না। রাত্রের খাওয়া শেষ করিয়া সে তখন বিছানার উপর চিত হইয়া শুইয়া শুইয়া বিড়ি টানিতেছিল আর গুনগুন করিয়া গান গাহিতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কাকে বকছে মা?'

বুড়ী বলিল, 'কি জানি বাছা, ওর এক বৈমাত্তর ভাই না-কি আছে— সেই তাকে বকছে।'

কানাই বলিল, 'বুড়ো ওর মেয়ের বিয়ে দেবে কেমন করে মা?'

মা বলিল, 'কে জানে বাবা!'

ওরা চাটুজ্যে, না মা?'

'হ্যাঁ, চাটুজ্যে।'

'কানন মেয়েটিও বেশ।'

'হুঁ।'

ছেলের মনের কথা মা বুঝিল। বলিল, 'তা মেয়েটিকে আমাদের বৌ করলে মন্দ হয় না। কিন্তু দিতে-থুতে কিছু পারবে না।'

কানাই রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'বেশ, তবে কোথায় কখন পাওনা হবে, সেই আশায় বসে থাক! মেয়ে জাতটাই এমনি। ভারি লোভী।'

মা বলিল, 'কথাটা একদিন পাড়বো ওর বাবার কাছে।'

কানাই বলিল, 'পাড়বো নয়, কালই পেড়ো। ওদিকে তোমার যতীনটি একবারে হাঁ করে বসে আছে,—পেলে হয়!'

মা চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতেছিল।

কানাই বলিল, 'চুপ করে রইলে যে? বলবে ত?'

মা বলিল, 'হুঁ, বলব।'

কিন্তু বলিবার সুযোগ বুড়ী কিছুতেই পাইতেছিল না, ছেলের মা হইয়া উপযাচিকার মত কথাটা সে বলিবে কেমন করিয়া!

এদিকে যতই দেরী হইতে থাকে, কানাই ততই অধীর হইয়া ওঠে। বলে, 'এখনও কিছু বললে না, আর ওদিকে হ্যাখোগে যাও!'

মা বলে, 'কি দেখবো রে?'

কানাই বলে, 'চোখ থাকলেই ত দেখবে। যতীন আর হোটেল থেকে ভাত আনে না, কানন রোজ রেঁধে দেয়।'

বুড়ী বলে, 'না, কানন রাঁধে না, ওর পিসি চারটি রেঁধে দেয়—আমি দেখেছি। আহা, দিক্ না বাছা, ওইটুকু-টুকু ছেলে, কেঁদে কেঁদে মরে। দেখলে বড় কষ্ট হয়।'

কানাই বলে, 'আর যতীনের ওই ছোট ছেলেটাকে কানন দেখেছি চব্বিশঘণ্টা কোলে নিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এইবার ঝপ করে' শুনবে কোনোদিন যতীনের সঙ্গে কাননের বিয়ে।'

বুড়ী বলে, 'না বাছা, তাই কি আর হয় কখনও! তোকে ছেড়ে যতীনকে মেয়ে লোকে দেবে কেন? যতীনের আছে কি?'

বুড়ী প্রতিজ্ঞা করিল এবার সে বলিবেই।

যাহাই হোক, সুযোগও একটা মিলিয়া গেল। কাননের বাবার সেদিন ভাড়া দিবার কথা। কিন্তু ভাড়া সে দিতে পারিল না।

বুড়ী বলিল, 'ভাড়া দিতে পার না, এত বড় আইবুড়ো মেয়ের বিয়ে দেবে কেমন করে' ?'

কাননের বাবা বাহির হইয়া গিয়াছিল। পিসি বলিল, 'সেই ভাবনাই ত ভাবছি মা দিনরাত।'

'ছেলে ঠিক করেছ ?'

'না মা, ছেলে আর কোথায় ঠিক করব।'

বুড়ী বলিল, 'ছেলের ভাবনা কি মা ? আমারই বাড়ীতে দু'জন রয়েছে।'

পিসি শুধু যতীনকে জানিত। বিপত্নীক যতীন হয় ত বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু আর একজন কে ?

বুড়ী বলিল, 'আমার ছেলে কানাই। সাহেবের কাছে চাকরি করে।'

পিসি বলিল, 'কিন্তু মা শুধু হাতে মেয়ে কি তুমি নেবে ? আমার দাদাটি যে কিছু খরচ করতে পারবে না।'

বুড়ী বলিল, 'তা কথাবার্তাটা পাকাপাকি হয়ে থাকলে দেনা-পাওনার কথা পরে হলেও চলবে। আজ তুমি তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস ক'র।'

বুড়া অবিনাশের অমত ছিল না। বাড়ীভাড়া দিবার মত সামান্য দশটি টাকা যে-লোক যোগাড় করিতে পারে না, বিনা পয়সায় সে যদি তাহার যুবতী কন্যার বিবাহ দিতে পারে ত রাজী কেনই বা হইবে না। কানাই-এর বাড়ী আছে, কানাই চাকরি করে, কানাই পুরুষ মানুষ—আর কি চাই ? না-ই বা থাকিল তাহার রূপ, না-ই বা থাকিল গুণ।

সেদিন সন্ধ্যায় বুড়া আর তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতার উদ্দেশ্যে গালাগালি দিল না, চীৎকার করিল না, অন্ধকার ঘরের মধ্যে চুপটি করিয়া বসিয়া বসিয়া নীরবে শুধু চোখের জল ফেলিতে লাগিল।

বিবাহের সবই স্থির হইয়া গিয়াছে, এখন পাকাপাকি আশীর্বাদটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ একটা বিঘ্ন উপস্থিত হইল।

কানাই আসিতেছিল উপরে উঠিয়া, হঠাৎ কি যেন দেখিয়া সে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল।

দেখিল, যতীনের সর্বকনিষ্ঠ পুত্রটিকে কোলে লইয়া হাসিতে হাসিতে কানন যতীনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এই নিন্ আপনার ছেলে, নিন্।

ছেলেকে কি যে শিখিয়েছেন কে জানে, আমার কোল থেকে কিছুতেই নামতে চায় না।'

যতীন বলিল, 'ওইখানে—ওর দাদার কাছে নামিয়ে দাও।'

কানন বলিল, 'বা রে! বলছি কোল থেকে নামালেই কাঁদছে, তবু বলছেন নামিয়ে দাও।'

'কি করব, আমাকে বেরুতে হবে। আমার ত ধরবার উপায় নেই।'

'তা উপায় একটা করুন? একে কষ্ট দিচ্ছেন কেন?'

'কি উপায় করব?' বলিয়া যতীন বোধকরি স্নান করিবার জন্য কলতলার দিকে আগাইয়া গেল।

'বিয়ে করুন!' বলিয়া ঈষৎ হাসিয়া কানন আবার ছেলেটাকে কোলে লইয়াই চলিয়া আসিতেছিল। সিঁড়ির কাছে কানাইকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল।

কানাই ডাকিল, 'যতীনবাবু!'

'কি?'

'শুনুন!'

যতীন কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই কানাই বলিল, 'আমার এ বাড়ী আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে।'

যতীন বলিল, 'কেন?'

'কেন জানি না। আমি বলছি ছেড়ে দিতে হবে, ব্যস্, ছেড়ে দিন।'

যতীন বলিল, 'এখন মাসের শেষ, হাতে আমার টাকা নেই। এখন ছাড়তে পারব না।'

কানাই বলিল, 'পারব না অমনি বললেই হল? তোমাকে তিনদিনের সময় দিলাম। তিনদিন পরে না যদি ওঠ তো গুণ্ডা দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেব।'

তাহার উপর কানাইএর হঠাৎ এরকম রাগের কারণটা যতীন কিছুই বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'আচ্ছা তুমি যাও, মাকে জিজ্ঞাসা করে যা হোক করব।'

কানাই আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। যতীন অত্যন্ত ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ তাই রক্ষা, অন্য কেহ হইলে এতক্ষণে হাতাহাতি আরম্ভ হইত।

কানাইএর চীৎকার শুনিয়া বুড়ী মা নামিয়া আসিল।

বুড়ী নিরুপায়। কানাই যে-রকম ভাবে যতীনকে গালাগালি দিতে শুরু করিয়াছে, কোনদিন হয়ত হাতাহাতি মারামারি হইয়া যাইবে, তাহার চেয়ে যতীনের উঠিয়া যাওয়াই ভাল।

কিন্তু বাড়ী খুঁজিবার সময় কোথায় যতীনের?

বুড়ী নিজেই সেদিন সন্ধান লইয়া আসিল—গলির মোড়ে হরিচরণ বোসের বাড়ীর নিচের তলায় তিনখানি ঘর খালি হইয়াছে—ভাড়াটে দরকার।

রবিবার দিন সকালে যতীন সেইখানে উঠিয়া গেল। সংসারের জিনিস-পত্র কি-ই বা আছে, একজন মুটে ডাকিয়া যতীনের বড় ছেলেটা আধঘণ্টার মধ্যে সবই সরাইয়া ফেলিল। তাহার পর ছোট ছেলেটাকে কোলে লইয়া বুড়ীর কাছে গিয়া যতীন বলিল, 'আসি মা।'

যতীনের চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল। কানন কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। সেদিকে সে একবার তাকাইতেও পারিল না। ছেলেটা শুধু সেই দিকে তাহার কচি কচি হাত দুইটি বাড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

কানাই যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল, 'এখন আর কাউকে ভাড়া দিও না মা। বিয়েটা চুকে যাক, তারপর দেখা যাবে।'

বিবাহের কথাবার্তা একরকম পাকাপাকিই হইয়া গিয়াছে। এইবার শুধু একটি ভাল দিন দেখিয়া আশীর্বাদটা চুকিয়া গেলেই হয়। কাননের বাবা ছুটি পাইতেছে না,—সেইজন্যই যা দেরী।

বুড়ী আজকাল প্রায় অধিকাংশ সময় বাহিরে বাহিরেই কাটায়।

কানাই জিজ্ঞাসা করিলে কিন্তু সত্যকথা বলিবার উপায় নাই। কখনও বলে, 'গঙ্গা নাইতে গিয়েছিলাম।' কখনও বলে, 'গিয়েছিলাম ওই ওদের বাড়ী।'

কানাই বলে, 'যতীনের বাড়ী যাওনি ত?'

বুড়ী বলে, 'একবার গিয়েছিলুম বাছা। পাঁচটা টাকা বাকি আছে, ভাবলুম যাই একবার চেয়েই দেখি।'

আসলে কিন্তু সে গঙ্গাস্নান করিতেও যায় না, যতীনের কাছে টাকা

চাহিতেও যায় না। যায় শুধু যতীনের ছেলেগুলাকে দেখিবার জন্য—নূতন বাড়ীতে গিয়া কি যে তাহারা করিতেছে, খাইতেছে, না উপবাস দিয়া পড়িয়া আছে। দিনান্তে একবার করিয়া না দেখিলে বুড়ীর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে থাকে। তাই সে যখনই যায় সহজে আর সেখান হইতে ফিরিতে পারে না।

কানন কানাই-এর সঙ্গে কথা বলে না, দেখা হইলেই দূরে সরিয়া যায়,—ইহার জন্য কানাই-এর দুঃখের আর অবধি নাই। মাকে সেদিন সে চুপি চুপি বলিল, 'ভাখো মা, কানন আমার সঙ্গে কথা বলে না।'

মা বলিল, 'অতবড় আইবুড়ো মেয়ে, লজ্জা করে।'

কানাই বলিল, 'কেন, যতীনের সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা করতো না।'

বুড়ী কি যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় কাননের পিসিমা আসিয়া খবর দিলেন, আগামী পরশু রবিবার। সেইদিন সকালে কাননের বাবা কানাইকে আশীর্বাদ করিবেন।

শনিবার দিন বৈকালে বুড়ী গিয়াছিল যতীনেব বাড়ী। ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। আপন মনেই উপরে উঠিয়া যাইতেছিল, হঠাৎ সিঁড়ির নিচে আবছা অন্ধকারে কি যেন দেখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন ছেলে কোলে লইয়া যতীনের বৌ রাধা দাঁড়াইয়া আছে। সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল। বুকের ভিতরটা ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

'আমি কানন।'

'ও মা, তুই।'

যতীনের ছোট ছেলেটিকে কোলে লইয়া কানন দাঁড়াইয়াছিল। বলিল, 'হ্যাঁ মা, ছেলেটা সেই কখন থেকে আমার কাছে রয়েছে, ঘুমিয়ে পড়লো, এখনও নিতে এল না।'

'আসবে এক্ষুণি' বলিয়া উপরে উঠিয়া গেল।

কিন্তু কি যে হইল কে জানে, সারা রাত্রি চোখে তাহার ঘুম আসিল না। সকালে উঠিয়াই সে যতীনের বাড়ী গিয়া দেখিল, যতীন তখন নিজেই চা তৈরী করিয়া চা খাইতেছে।

বুড়ী বলিল, 'তুই একবার আয় আমার সঙ্গে যতীন।'

এই বলিয়া যতীনকে সে ডাকিয়া আনিয়া কাননদের ঘরে লইয়া গিয়া

বসাইল। তারপর কাননের বাবার কাছে গিয়া বলিল, 'আসুন, জামাইকে আপনার আশীর্বাদ করবেন, আসুন।'

সকলেই অবাক্। কাননের পিসি বলিল, 'কেন, কানাই-এর কি হ'ল?'

বুড়ী বলিল, 'না মা, কানাইএর বিয়ে এখন না হ'লেও চলবে, এর সংসার যে অচল মা!'

তাহারাও বোধকরি ইহাই চাহিতেছিল, মুখ ফুটিয়া না বলিলেও। তৎক্ষণাৎ ধানদূর্বা দিয়া আশীর্বাদ হইয়া গেল। বিবাহের দিন স্থির হইল সাতদিন পরে।

কানাই-এর তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। উঠিয়াই শুনিল এইরকম একটা মারাত্মক কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে এবং ঘটাইয়াছে তাহার মাতাঠাকুরাণী। আর যায় কোথায়! অকথ্য ভাষায় কানাই তাহার মাকে গালাগালি দিতে লাগিল। কিছুদিন আগে থিয়েটারে সে 'পরশুরাম' নাটকের অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছিল, তাহারই মাতৃহত্যার দৃশ্যটা স্মরণ করিয়া কানাই বলিল, 'তেমনি ক'রে তোমাকে একদিন আমি কেটে ফেলবো দেখো।'

বুড়ী বলিল, 'তাই কাট বাবা, আমি তাহ'লে বাঁচি।'

সিঁড়ির নিচে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কথাগুলা শুনিষা কানন আপনমনেই ফিক্ করিয়া একবার হাসিয়া ফেলিল।

শাশুড়ী-বৌ

অদ্ভুত মেয়ে ওই জগত্তারিণী!

বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন কিছুই বুঝিবার উপায় নাই, গায়ের রঙ পাকা আমের মত, মাথার চুল এখনও কাঁচা, দাঁতও ভাঙে নাই, বুড়ীও হয় নাই,—বহুদিন হইতে বহু লোকে তাঁহাকে ঠিক অমনিটিই দেখিতেছে।

পাড়ার সকলেই তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকে। ছেলেও ডাকে—মা, আবাব ছেলের বাবাও ডাকে— মা।

তা মা হইবার যোগ্যতা তাঁহার আছে নিশ্চয়ই। যোগ্যতা না থাকিলে কেহ কাহারও মা হইয়া বেশিদিন থাকিতে পারে না।

জগত্তারিণী বিধবা। নিজের সংসারের মধ্যে তাঁহার এক যোগ্য পুত্র আর যুবতী পুত্রবধূ।

বলেন: 'আমার কি আর ওই একটা ছেলে রে বাবা! পাড়ার সবাই আমার ছেলে, সবাই আমার বৌ।'

ছেলে শঙ্কর বলে: 'বলি হ্যাঁ মা, এখনও কি তোমার এমনি হৈ হৈ করে ঘুরে বেড়ান সাজে? বাড়ীতে দু'দণ্ড চুপ করে বোসো না মা!'

জগত্তারিণী শঙ্করের মুখের পানে একবার তাকাইলেন। বলিলেন, যোগীনের বৌ-এর ছেলে হবে, তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিয়ে এলাম বাবা। ব্যথা উঠেছিল, ডেকে পাঠালে, হ্যাঁরে, এ তুই বলিস কি রে শঙ্কর? যাব না?'

শঙ্কর কি যে জবাব দিবে বুঝিতে পারিল না। ধীরে-ধীরে ঘরের ভিতরে গিয়া ঢুকিল এবং সেইখান হইতেই বলিল, 'যেতে ত আর আমি বারণ করছিনি মা, তবে কি না...'

জগত্তারিণী বলিলেন, 'হুঁ। তা আমি না হয় কাল থেকে বাড়ীতেই বসে থাকব শঙ্কর, বাড়ীতে বসে থাকলেও আমার চলবে, কিন্তু তুমি কোন্ লজ্জায় বসে আছ দিনরাত মুখে মুখ দিয়ে? বাইরে একবার বেরিয়ে গিয়ে কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করতে হবে, না, তোমার বাপের জমিদারী আছে, না তোমার শ্বশুর দেবে লাখ-খানেক টাকা?'

এক কথা হইতে আর এক-কথায় আসিয়া পড়িল। আর্শীর কাছে দাঁড়াইয়া বৌ চুল বাঁধিতেছিল, স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া চোখ টিপিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিল, 'শুনলে ?'

কিন্তু কি এমন অন্যায় কথা মা তাহাকে বলিয়াছেন যাহার জন্য স্ত্রী তাহাকে এ-কথা বলিল, শঙ্কর প্রথমে তাহা বুঝিতে পারে না। গৌরী কিন্তু থামিল না। ঠোঁট উল্‌টাইয়া মুখে একরকম শব্দ করিয়া আপন মনেই বলিতে লাগিল, 'আ মরণ। মুখে মুখ দিয়ে ছেলে-বৌ পড়ে আছে দিনরাত, বলতে লজ্জাও করে না।'

এতক্ষণে শঙ্কর তাহার মনের কথা টের পাইল। চুপি-চুপি চোখমুখের ইসারা করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, 'থামো!'

ঠিক এই সময়টায় সুমুখের রাস্তা দিয়া একজন ঢুলিদার ডুগ্‌ডুগ্‌ করিয়া ঢোল বাজাইয়া কি যেন বলিতে বলিতে পার হইয়া যাইতেছিল। জগত্তারিণী চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'বলি ও রাঙা-বৌ, ও তরুবালা, ওরে ও মান্‌কের মা। ওই শোন্!'

সুমুখের বাড়ীর দোতলার জানালার কাছে তরুবালা আসিয়া দাঁড়াইল, নিচে হইতে রাঙা-বৌ বলিল, 'কি মা ?'

জগত্তারিণী বলিল, 'ওই শোন্ ঢুলি দিয়ে যাচ্ছে, আবার ভূমিকম্প হবে। ছেলেমেয়ে নিয়ে শহর ছেড়ে সব পালা, নইলে মরবি।'

রাঙা-বৌএর ছোট ছোট দু'তিনটি ছেলেমেয়ে ; জগত্তারিণীর নিচের তলার ভাড়াটে। তারই ভয় যেন সব চেয়ে বেশি। মুখখানি তাহার শুকাইয়া এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, 'তাহ'লে কি হবে মা, কোথায় যাব ?'

সামনের দোতলা হইতে তরুবালা বলিল, 'যাব আর কোথায় মা, কপালে যা আছে তাই হবে।'

এমন সময় হাসিতে হাসিতে শঙ্কর ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

জগত্তারিণী বলিলেন, 'কেনরে ? হাসছিস কেন ?'

শঙ্কর বলিল, 'ভূমিকম্পের ঢুলি নয় মা, ও অন্য কিছু।'

'গ্যাখ্‌না বাবা একবার এগিয়ে!'

আর কিছু বলিতে হইল না। দ্রুতপদে শঙ্কর নিচে নামিয়া গেল। এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই সে ফিরিয়া আসিল জনকয়েক ছোকরাকে সঙ্গে

লইয়া। নিচে হইতে হাঁকিয়া বলিল, 'ভূমিকম্প নয় মা, বাঁশবাজি। দেখবে ?'

জগত্তারিণী ছুটিয়া বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিতান্ত ছেলেমানুষের মত বলিলেন, 'হ্যাঁ বাবা, দেখব, দেখব। ও-সব সেই ছেলেবেলায় দেখেছি, তারপর আর দেখিনি।'

কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখা গেল, ঢুলি বাজাইয়া গলি রাস্তার উপরেই বাঁশবাজি দেখানো আরম্ভ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের পাড়া বলিতে রাস্তার দু'দিকের যে কয়খানি বাড়ীকে বুঝায় সেই কয়খানি বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কতক-বা জানালার ধারে, কতক-বা বারান্দায়, কতক-বা দরজার সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

অথচ অবাক্ কাণ্ড, সকলেই আসিয়াছে, আসে নাই শুধু গৌরী,—জগত্তারিণীর পুত্রবধূ।

বাঁশবাজি দেখানো শেষ হইল। চাঁদা করিয়া পয়সা তুলিয়া তাহাদের বিদায় করিয়া জগত্তারিণী বাড়ী ফিরিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাঁশবাজি দেখতে গেলে না কেন বৌমা ?'

চুল বাঁধা শেষ করিয়া গৌরী তখন নিচের কল-ঘরে যাইতেছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া কেমন যেন অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া গেল, 'না। ও-সব আমার ভাল লাগে না।'

দিন-দুই পরে কিসের যেন একটা যোগ ছিল। এই যোগে গঙ্গাস্নান করিলে নাকি পুণ্য হয়। এই সব ব্যাপারে জগত্তারিণীই চিরকাল অগ্রণী হইয়া থাকেন, সেদিনও তাহার ব্যতিক্রম হইল না। তাহার আগের দিন রাত্রেই সকলকে বলা হইয়াছে। পরদিন অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া গামছা কাপড় হাতে লইয়া জগত্তারিণী বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। অন্যান্য বাড়ীর মেয়েরা প্রস্তুত হইয়াই ছিল। ডাকিবামাত্র তাহারাও বাহির হইয়া পড়িল।

হাসিতে গল্পে পথ একেবারে মুখরিত করিয়া জগত্তারিণীর সঙ্গে তাহারা চলিয়াছিল গঙ্গাস্নানে। হঠাৎ পথের মাঝখানে একটা কথা উঠিয়া পড়িল। কে যেন জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, 'হাঁ মা, তোমার বৌকে ত দেখছি না, কোথায় সে ?'

জগত্তারিণীর মুখখানি কেমন যেন ম্লান হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'ছেলেমানুষ —ঘুমোচ্ছিল, তাই আর ডাকলাম না বাছা।'

কিন্তু সত্যই সে ঘুমায় নাই। জগত্তারিণী যখন বাড়ী হইতে বাহির হইলেন, গৌরী তখন শয্যাত্যাগ করিয়া স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে।

মেয়েদের হাসি গল্প আবার চলিতে লাগিল, কিন্তু গৌরীর না আসার সূত্র ধরিয়া জগত্তারিণীর মুখের চেহারা কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গেল। তাহাদের হাসিতে গল্পে তিনি যেন আর তেমন করিয়া যোগ দিতে পারিলেন না।

বাড়ী ফিরিয়াই জগত্তারিণী শঙ্করকে কাছে ডাকিলেন। চুপি চুপি বলিলেন, 'বলি হ্যাঁরে শঙ্কর, বৌমা যদি এ-রকম ধারা করে, তাহ'লে ত আর কারও কাছে আমার মুখ দেখাবার জো থাকে না বাবা।'

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল, 'কি করেছে সে?'

'কি করেছে?' জগত্তারিণী একটা ঢোঁক গিলিয়া এদিক ওদিক তাকাইয়া বলিলেন, 'সেদিন দেখলি ত—দোরের গোড়ায় অমন সুন্দর বাঁশবাজি দেখানো হ'ল, তা নবাবের মেয়ে একবার বেরুলো না বাড়ী থেকে! আবার আজ সকালে যে আমরা এতগুলো মেয়ে গঙ্গাস্নান করতে গেলাম, তা কই, ও ত গেল না আমাদের সঙ্গে!'

গঙ্গাস্নানে যাইবার কথাটা গৌরীর কাছে শঙ্কর আগেই শুনিয়াছিল। বলিল, 'ওকে তুমি ডেকেছিলে মা?'

জগত্তারিণী বলিলেন, 'ও, বুঝেছি। না ডাকলে বুঝি যেতে নেই! না বাছা, তা'হলে আমার অপরাধ হয়েছে, আমি ডাকি নি।'

এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'ডাকবো কোন্ সাহসে শঙ্কর? মান ত ও আমার রাখে না। সেদিন বললাম ত ও আমার মুখের উপরেই জবাব দিয়ে বসলো,—বললে, 'ও-সব আমার ভাল লাগে না'।

শঙ্কর বলিল, 'আচ্ছা দাঁড়াও, আজ আমি ওকে বলে' দেবো ভাল করে।'

জগত্তারিণী বলিলেন, 'হাঁ বাছা বলিস্, নইলে লজ্জায় আমার আর মুখ দেখাবার জো থাকবে না।'

জগত্তারিণী মিথ্যা বলেন নাই। তাঁহার লজ্জা হওয়া স্বাভাবিক। পাড়ার যত মেয়ে সকলেই তাঁহার অনুগত; উঠিতে বলিলে ওঠে, বসিতে বলিলে বসে।

অথচ নিজের বৌ যদি তাঁহার অবাধ্য হয়, তাহা হইলে লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকে না।

গৌরীকে সেদিন শঙ্কর বেশ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিল। বলিল, 'ছি! মায়ের অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। মা যা বলবেন, এবার থেকে তাই তুমি ক'রো।'

গৌরী বলিল, 'মা বুঝি আমার নামে তোমাকে কিছু লাগিয়েছে?'

শঙ্কর মুখে কিছু না বলিয়া ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ—না, মা কিছু বলেন নাই।

গৌরী বলিল, 'আমি ঘাস খাই না, আমি মানুষ, আমি সব বুঝতে পারি।'

শঙ্কর বলিল, 'মা বুড়ো মানুষ, আর কত দিনই বা বাঁচবেন! মা যাতে সুখে থাকেন তুমি তাই ক'রো, বুঝলে? আর তা ছাড়া মা আমার গুরুজন, ওঁর জন্যে তোমার যদি কিছু অসুবিধেও ভোগ করতে হয়, তা'হলেও তোমার কিছু অধর্ম হবে না।'

গৌরী বলিল, 'থাক্, আমায় আর বোঝাতে হবে না, মার জন্যে আমি অনেক করেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, মা আমায় দেখতে পারেন না।'

শঙ্কর একটুখানি হাসিল। বলিল, 'পাগল হয়েছ তুমি! তুমি আমার স্ত্রী, মার এই একটিমাত্র বৌ, আর তুমি বলছ কিনা তোমায় উনি দেখতে পারেন না, ভাল বাসেন না? তোমার এ-কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

গৌরী বলিল, 'কেউ না করুক, ভগবান করবেন।'

শঙ্কর বড় বিপদে পড়িল। বলিল, 'আচ্ছা গৌরী, তা'হলে আমি কি করি বল ত? মা আর তুমি—বাড়ীর মধ্যে এই ত দু'টি মানুষ, তোমরা দু'জনে যদি সুখে না থাকো, তা'হলে আমারই বা সুখ কোথায় বল দেখি?'

স্বামীর অবস্থাটা বোধ হয় গৌরী বুঝিল। ভদ্রবংশের শিক্ষিতা মেয়ে, কেনই বা বুঝিবে না। খানিক ভাবিয়া বলিল, 'আচ্ছা তাহ'লে এবার থেকে আমি সহ্যই করব। কিন্তু বাপু নেহাত অসহ্য যদি কোনোদিন হয় ত তখন যেন তুমি আমায় বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ো।'

প্রতিবেশী গগনবাবু বাড়ীতে তাঁহার একটি রেডিয়ো-সেট্ করিয়াছেন। শুক্রবার 'সতী-সাবিত্রী'র পালা হইবে। পাড়ার মেয়েরা প্রায় সকলেই শুনিতে

গিয়াছে। গৌরীকে সেদিন আর বেশি কিছু বলিতে হয় নাই। যাইবার আগে মাত্র জগত্তারিণী একবার ঘরের চৌকাঠের এ-পাশ হইতে উঁকি মারিয়া বলিয়াছিলেন, 'কিগো, যাবে পাঁচুদের বাড়ী গান শুনতে? না, ডাকলে বলবে, ডাকিনি। যাবে ত চল এই বেলা, আর না যাবে ত তাও বলে দাও।'

শঙ্কর বাড়ী ছিল না। থাকিলে সে মায়ের কথাগুলা তাহাকে একবার শুনাইতে পারিত। মুখে কোনও কথা না বলিয়া গৌরী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বাড়ী হইতে বাহির হইল।

কিন্তু মেয়েদের রেডিও শোনা না ছাই! পাঁচুর বাবা গগনবাবু নিজে একবার বুঝাইয়া দিলেন যে, এই যন্ত্রটার সঙ্গে কোথাও কোনো তারের যোগ নাই, অথচ এখান হইতে বহুদূরে ঠিক যেমন যেমন গান হইবে, বক্তৃতা হইবে, এখানে বসিয়াও তোমরা হুবহু ঠিক তেমনিটি শুনিতে পাইবে।

জগত্তারিণী বলিলেন, 'দিনে দিনে কতই না হবে বাবা, কতই না দেখতে পাব। কিন্তু এর দামও ত নিশ্চয়ই অনেক। তা এই বাজারে এত টাকা খরচ কি জন্যে করতে গেলি বাছা?'

গগন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'তাতে আর কি হয়েছে মা, তোমরা শোনো মন দিয়ে।'

গান আরম্ভ হইল। সকলেই অবাক্ হইয়া খানিকটা শুনিল, যন্ত্রটার তারিফ করিল, তাহার পর যে যার কথা লইয়া মশগুল হইয়া পড়িল। প্রথমে অনুচ্চকণ্ঠেই শুরু হইয়াছিল, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেল, একেবারে হাট বসিয়া গিয়াছে। রাঙা-বৌ তাহার দু'হাত ভর্তি সোনার চুড়ি গড়াইয়াছে,—ভাটিয়া চুড়ি। অথচ স্বামী তাহার নিতান্ত গরীবের মত নিচের তলায় দু'খানি ঘর ভাড়া করিয়া অতিকষ্টে সংসার চালায়। দেখিয়া মনে হয়, ছেলেমেয়ে লইয়া বেচারা হয় ত দু'বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সেই তাহারই স্ত্রী রাঙা-বৌ কিনা ঝকঝকে নূতন আটগাছা চুড়ি পরিয়া আজ গান শুনিতে আসিয়াছে! আলোচনার যোগ্য বিষয় বটে! প্রথম কথা তাহাদের ওঠে বোধকরি এই চুড়ি লইয়াই। রাঙা-বৌয়ের হাত দুইটা টানিয়া টানিয়া সকলেই একবার করিয়া চুড়ি কয়গাছা দেখিতে ছাড়িল না। তা দেখুক ক্ষতি নাই, কিন্তু দু'একজন তাহার মুখের উপরেই এমন সব

মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল যে, বেচারা লজ্জায় একেবারে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল। কে-একজন বলিল, 'কি জানি মা, আমার ত গিনি সোনা বলে' মনে হচ্ছে না।'

আর-একজন বলিল, 'গিনি সোনার চুড়ি গড়ানো আজকাল মুখের কথা কি না! সোনার দর কত! চান-টান করবার সময় খুলে রাখিস্ রাঙা-বৌ, ও রঙ বোধহয় বেশীদিন টিঁকবে না।'

কিন্তু সেখানে গৌরীই একমাত্র মেয়ে, যে তাহার দুঃখের কথা বুঝিল। রাঙা-বৌ তাহাদেরই নিচের তলার ভাড়াটে। মেয়েটার রূপও যেমন গুণও তেমনি। তাই গরীব স্বামী অনেক দিনের চেষ্টার পর অনেক কষ্টে তাহার এই গহনা পরার সাধ মিটাইয়াছে।

জগত্তারিণী ওদিকে তখন আরও দুইজন বর্ষীয়সী মহিলার সঙ্গে সতী-সাবিত্রীর কথা শুনিতে শুনিতে চোখ মুছিতেছিলেন। এদিকে তাঁহার নজর ছিল না। রাঙা-বৌকে হাতের ইসারায় কাছে ডাকিয়া গৌরী তাহার কানে-কানে বলিল, 'চল আমরা পালাই এখান থেকে।'

রাঙা-বৌ তাহাই চাহিতেছিল। সে-ও তাহার মুখের পানে তাকাইয়া ম্লান একটুখানি হাসিয়া চোখ টিপিয়া বলিল, 'চল।'

গোলমাল বড় বেশি হইতেছিল বলিয়া গগনবাবু একবার নিজে আসিয়া বলিলেন, 'ওগো, তোমরা যে হাট বসিয়ে দিলে দেখছি!'

জগত্তারিণী পিছন ফিরিয়া বলিলেন, 'তাই না বটে বাছা! ভাল যাদের না লাগছে, তারা উঠে গেলেই ত পারিস্ মা।'

গোলমাল অবশ্য একটুখানির জন্য থামিল। দু' একজন উঠিয়াও গেল, আবার দু'একজন ভাল করিয়া আগাইয়া বসিল।

এবং সেই অবসরে রাঙা-বৌ ও গৌরী কোন্ সময় যে সেখান হইতে উঠিয়া চট করিয়া পলায়ন করিয়াছে জগত্তারিণী কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। গান বন্ধ হইলে পর বৌমাকে খুঁজিতে গিয়া দেখিলেন, বৌমা নাই। বলিলেন, 'চলে গেছে বুঝি? আবাগীর বেটির এসব কিছু ভাল লাগে না।'

রাঙা-বৌকে যে-মেয়েটা সবচেয়ে বেশি বিরক্ত করিয়াছে সে-ই বলিয়া উঠিল, 'তা এমন ঠাকুর-দেবতার কথা ভাল লাগবে কেন মা, গয়না-কাপড়ের কথা হয় ত ভাল লাগে।'

জগত্তারিণী গম্ভীর মুখে বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু এই সামান্য ব্যাপার লইয়া যে এতদূর গড়াইবে, কেহ তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই।

গৌরী ততক্ষণে শঙ্করকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া পাশের ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। জগত্তারিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চলে এলে যে বৌমা?'

চলিয়া আসিবার আসল কারণটা গোপন করিয়া গৌরী বলিল, 'ওঁকে খেতে দেবার জন্যে উঠে এলাম।'

সত্য কথাটা বলাই বোধকরি তাহার উচিত ছিল, শঙ্করকে খাওয়াইবার জন্য উঠিয়া আসিয়াছে শুনিয়া জগত্তারিণী রাগিয়া একেবারে অগ্নিমূর্তি হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'তোমার হাতে না খেলে ওর বুঝি পেট ভরে না? বলি—হ্যাঁ রে শঙ্কর, সেকথা আমায় বললেই ত পারতিস্!'

গৌরী চুপ করিয়াই ছিল। শঙ্কর দেখিল, এক্ষেত্রে তাহার কোনও দোষ নাই। বলিল, 'চুপ কর না মা! কি, হয়েছে কি তাতে?'

জগত্তারিণীর গলার আওয়াজ সহসা অন্যরকম হইয়া গেল। বলিলেন, 'না বাবা হয়নি কিছুই। গর্ভধারিণী মার চেয়ে তোর বিয়ে-করা বৌ যে একদিন বড় হবে সেকথা জানতাম না ব'লেই কথাটা বলে' ফেলেছি। আর তা ছাড়া আমি সামনে বসে থেকে না খাওয়ালে তোর পেট ভরে না ভাবতাম। তা বেশ, কাল থেকে তুমিই ওকে খেতে-টেতে দিও বৌমা।'

এই বলিয়া জগত্তারিণী তাঁহার নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিলেন।

কি যে তাঁহার হইল কে জানে, কিয়ৎক্ষণ পরে কান্নার শব্দে সহসা চমকিয়া উঠিয়া শঙ্কর পাশের ঘরে গিয়া দেখিল, মা তাহার মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিতেছেন।

শঙ্কর বলিল, 'এ আবার তোমার কি হ'লো মা? কাঁদছো কেন?'

জগত্তারিণী তেমনি কাঁদিতে কাঁদিতেই জবাব দিলেন, 'কেন যে কাঁদছি তা তুই কেমন করে বুঝবি বাছা! যা—ঘুমোগে যা!'

শঙ্কর দেখিল, রাত্রের খাবার তাঁহার ঘরের একপাশে তেমনি ঢাকা-দেওয়া পড়িয়া আছে। বলিল, 'ওঠো মা ওঠো, তুমি খাও আগে, তারপর আমি যাচ্ছি।'

'না বাবা, আমি এখন খেতে পারব না, তুমি যাও।'

বলিয়া তিনি বোধ হয় আবার নূতন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

শঙ্কর কিছুতেই যখন তাঁহাকে উঠাইতে পারিল না, তখন সে নিরুপায় হইয়া ম্লান মুখে গৌরীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'ওগো, তুমি একবার গ্যাখো দেখি চেষ্টা করে'।'

গৌরী বিছানার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া ছিল, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না আমি পারব না। তোমার মা, তুমি গ্যাখোগে চেষ্টা করে'।'

দেখা গেল, তাহারও চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিয়াছে।

নিরুপায় শঙ্কর স্ত্রীর শয্যাপার্শ্বে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আবার সে তাহার মা'র ঘরে গিয়া দেখিল, জগত্তারিণী তখনও তেমনি শুইয়া আছেন, কান্না তাঁহার তখনও থামে নাই।

একদিকে স্ত্রী, একদিকে মা, কি যে করিবে ভাবিয়া সে কিছু ঠিক করিতে পারিতেছে না, এমন সময় পিছনে দরজার কাছে পায়েব শব্দ হইতেই শঙ্কর পিছন ফিরিয়া তাকাইল। দেখিল,—তাহাদেরই পাড়ার আট-দশ বছরের একটা মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'কি রে টুনী, কি বলছিস ?'

টুনী ধীরে ধীরে বলিল, 'মাকে ডাকতে এলাম।'

'কেন রে ? কি হয়েছে ?'

টুনী বলিল, 'বঁটি দিয়ে ঠাকুমা মার কপালে রক্ত বের করে' দিয়েছে।'

জগত্তারিণী বোধকরি তাহার সব কথাগুলাই শুনিয়াছিলেন, কিছুই তাঁহাকে বলিতে হইল না, কান্না তখন তাঁহার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া টুনীর হাতে ধরিয়া তিনি বাহির হইয়া যাইতেছিলেন, শঙ্কর বলিল, 'খেয়ে যাও মা।'

জগত্তারিণী মুখ ফিরাইয়া লইলেন। কথাটা তিনি তাহার শুনিয়াও শুনিলেন না।

শঙ্কর এ-ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'কে এসেছিল গো ?'

শঙ্কর বলিল, 'টুনী।'

আর কিছু বলিতে হইল না। টুনীদের বাড়ীতেও এই একই কাণ্ড। টুনীর মার সঙ্গে তাহার শাশুড়ীর ঝগড়া প্রায় প্রত্যহ লাগিয়াই আছে। এবং

যতবার তাহাদের ঝগড়াঝাঁটি হয়, এই জগত্তারিণী গিয়াই তাহা মিটাইয়া দিয়া আসেন। কাজেই টুনীর আগমনের হেতুটা গৌরী না বলিতেই বুঝিল।

ঠোঁট দুইটি টিপিয়া মুখখানির সে এক অদ্ভুত ভঙ্গী করিয়া গৌরী জিজ্ঞাসা করিল, 'উনি গেলেন বুঝি সেখানে?'

শঙ্কর চলিল, 'হ্যাঁ, গেলেন। কিন্তু না খেয়েই গেলেন। ফিরে এলে তুমি একবার—'

কথাটা তাহাকে আর শেষ করিতে হইল না। গৌরী বলিল, 'থাক্, আর কারও কিছু করে' কাজ নেই, তুমি শোও।' বলিয়া হন্ হন্ করিয়া দরজার কাছে আগাইয়া গিয়া হড়াম্ করিয়া দুই হাত দিয়া দরজার খিলটা সে বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল।

কাঞ্চন-মূল্য

অদৃষ্টের কথা জোর করিয়া কিছুই বলিবার জো নাই।

নইলে ছ'মাস আগে কে জানিত নিস্তারিণীর এই অবস্থা হইবে।

ছ'মাস আগে আমরা নিজের চোখে দেখিয়াছি, শ্যামবাজার ষ্ট্রীটের উপর চমৎকার একখানি দোতলা বাড়ীতে স্বামী-পুত্র লইয়া নিস্তারিণী পরমানন্দে বাস করিতেছে।

স্বামী তাহার এক মার্চেন্ট-আফিসে দেড়শ' টাকা বেতন পায়। যেমন স্বাস্থ্য তাহার তেমনি চেহারা, দিলদরিয়া মেজাজ, মুখে যেন হাসি তাহার লাগিয়াই আছে।

ছেলেটি সাত বছরের। দিব্যি ফুটফুটে সুন্দর ছেলে। সুন্দর বলিয়া নাম রাখা হইয়াছে কার্তিক।

এমন সুন্দর স্বামী, এমন সুন্দর ছেলে, এমন সচ্ছল সংসার,—নিস্তারিণীর আর চাই কি!

পাড়াপড়শী মেয়েরা তাহাকে সুমুখে না হোক আড়ালে-আব্‌ডালে বরং একটুখানি হিংসাই করে। কেউ কেউ আবার মুখের উপরেই বলিয়া বসে, 'তা সত্যি বলতে কি দিদি, তোমাকে দেখলে আমাদের হিংসে হয়।'

সেও হাসে, নিস্তারিণীও হাসে।

ভবিষ্যতের ভাবনা বোধ হয় তাহারা ভাবে নাই। না নিস্তারিণী, না তাহার স্বামী।

প্রথম পঞ্চাশ টাকায় চাকরিতে ঢুকিয়া চড়চড় করিয়া দেড়শ' টাকায় উঠিয়াছে, স্বামী তাহার ভাবিয়াছিল, বড় সাহেব যেরকম ভালবাসে, পাঁচশ' টাকা মাহিনা সে একদিন পাইবেই। তখন আর কষ্ট করিয়া তাহাকে টাকা জমাইতে হইবে না, খরচ অভাবে টাকা তাহার আপনি জমিয়া যাইবে। কলিকাতার মাঝে না-হোক, কলিকাতার কাছাকাছি জমি যেখানে সস্তা, সেইখানে ছোট একখানি বাড়ী, ছোট একখানি গাড়ী, আর হাজার দশেক টাকা!

—না কি বল নিস্তারিণী ?

স্বামীর কথা শুনিয়া নিস্তারিণী হাসিতে হাসিতে বলে, 'ভগবান মুখ তুলে চাইলে সবই হবে। তুমি ভেবো না।'

কিন্তু না ভাবিয়া স্বামী তাহার বোধকরি ভাল কাজ করে নাই।

ভগবান কি বুঝিলেন কে জানে, নিস্তারিণীর স্বামীর হইয়াছিল জ্বর, সামান্য জ্বর, ভাবিয়াছিল এমনিতেই সারিয়া যাইবে। পাঁচদিনের দিন রাত্রে দেখা গেল, জ্বর একেবারে একশ' তিন ডিগ্রীতে উঠিয়াছে, মাথা চালিতেছে, ভুল বকিতেছে, চোখ দু'টা হইয়াছে লাল, গা যেন আগুন!

নিস্তারিণীর আর চুপ করিয়া থাকা চলিল না। হরিহর বলিয়া যে চাকরটি তাহার বাড়ীতে কাজ করিত পরদিন সকালেই তাহাকে সে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইল।

ডাক্তার আসিয়া চিকিৎসা শুরু করিলেন। ন'দিন ধরিয়া ক্রমাগত যমে-মানুষে টানাটানি চলিতে লাগিল। দশদিনের দিন ডাক্তারবাবু হতাশ হইয়া বলিয়া বসিলেন, 'আর আশা নাই।'

সর্বনাশ!

নিস্তারিণী তাহার চোখের সুমুখে সব কিছুই অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কার্তিককে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া স্বামীর শিয়রের কাছে সে গুম হইয়া বসিয়া রহিল।

শেষ সম্বল বলিতে এখন তাহার অবশিষ্ট আছে মাত্র দুইহাতে দু'গাছি চুড়ি, আর আছে বাড়ীর আসবাবপত্র। এ সময় নিজের জীবন দিয়াও স্বামীকে যদি বাঁচানো সম্ভব হয় ত সে চেষ্টাও একবার সে করিয়া দেখিবে।

ডাক্তারবাবু আসিতেই নিস্তারিণী তাঁহার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। লজ্জা-শরম তখন তাহার চলিয়া গিয়াছে। বলিল, 'যেমন ক'রে হোক ওঁকে আপনি বাঁচান ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'কি করব মা, আমরা ত দেবতা নই। আমাদের যতটুকু সাধ্য—'

কথাটা তাঁহাকে শেষ করিতে না দিয়া হাতের চুড়ি দু'গাছি খুলিয়া তাঁহার পায়ের কাছে নামাইয়া দিল। বলিল, 'এই আমার শেষ সম্বল। এই দিয়ে—'

ডাক্তারবাবু বলিলেন, 'না মা, টাকা আপনার কাছে আমি আর নেবো না। ওদিকে—'

বলিতেই ডাক্তারবাবুর নজর পড়িল রোগীর দিকে। তাড়াতাড়ি তাহার শিয়রের কাছে গিয়া বসিলেন। নিস্তারিণী কাঁদিতে লাগিল, কার্তিক কাঁদিতে লাগিল, হরিহর কাঁদিতে লাগিল এবং তাহাদের চোখের সুমুখে ডাক্তারবাবু বসিয়া থাকিতে থাকিতেই নিস্তারিণীর স্বামী মরিয়া গেল।

সে কি নিদারুণ দৃশ্য! নিস্তারিণীর সেই বুকফাটা কান্না!

সে কথা লিখিয়া বলিবার নয়, বলিয়া বুঝাইবার নয়, ভগবানের বিচারের উপর মুহূর্তের জন্যও আস্থা হারাইতে হয়, চোখে দেখিলেও অসহ্য হইয়া উঠে।

বাড়ীর মালিক দয়া করিয়া বাড়ীভাড়া ছাড়িয়া দিয়া ঘরের আসবাব-পত্রগুলি নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। হরিহর কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় লইল। কার্তিকের হাতে ধরিয়া নিস্তারিণী পথে গিয়া দাঁড়াইল।

মা নাই, বাবা নাই, বাপের বাড়ীতে আত্মীয়স্বজন যাহারা আছে সকলেই গরীব, নিস্তারিণী কলিকাতা শহরের পথে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল।

যিনি নিরাশ্রয় করিয়াছিলেন তিনিই একটা আশ্রয় জুটাইয়া দিলেন।

আশ্রয় মিলিল এক বড়লোকের বাড়ীতে। নিস্তারিণী বামুনের মেয়ে, দু'বেলা রান্না করিয়া দিবে, তাহার বদলে মা ও ছেলে খাইতে পাইবে, পরিতে পাইবে।

কিন্তু নিস্তারিণী চায় ছেলেটা লেখাপড়া শিখুক। ওই ছেলেই এখন তাহার একমাত্র ভরসা। লেখাপড়া শিখিয়া ও বড় হইয়া যদি কিছু রোজগার করিতে পারে!

বাড়ীতে দু'তিনটি ছেলে রহিয়াছে, প্রত্যহ তাহারা স্কুলে যায়, বাড়ীর কাছেই স্কুল, লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া নিস্তারিণী একদিন বাড়ীর গিন্নিকে বলিয়া বসিল, 'আমার ছেলেটার যদি স্কুলে পড়বার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন মা ত বড় ভাল হয়।'

গিন্নি মোটা মানুষ। আহারাদির পর তাকিয়া ঠেস্ দিয়া শুইয়া শুইয়া

আরাম করিতেছিলেন। বলিলেন, 'তোমার ছেলে স্কুলে পড়বে? কি হবে স্কুলে পড়ে? লেখাপড়া কিছু হবে?'

রাঁধুনী বামনীর ছেলে, লেখাপড়া কিছু হবে না ইহাই তাঁহার ধারণা।

নিস্তারিণী হেঁটমুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নি বলিলেন, 'স্কুলে ছেলে পড়ানো ত মুখের কথা নয়। বই কিনে দিতে হয়, মাসে মাসে মাইনে দিতে হয়···হাঙ্গামা অনেক।'

নিস্তারিণী বলিল, 'বাবুকে বলে যদি ফ্রি করিয়ে দিতে পারেন। গরীবের ছেলে—'

গিন্নি মুখ টিপিয়া হাসিলেন। রাঁধুনী বামনীর মুখে 'ফ্রি' কথাটা শুনিয়াছেন, হাসিবারই কথা। বলিলেন, 'সবই যে তুমি জানো দেখছি। দশ বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন-বা জানবে না। আচ্ছা দেখব বাবুকে বলে।'

বাবু পাশের ঘরে শুইয়া ছিলেন। কথাগুলা বোধ করি শুনিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি বলে দেখবো বলছো?'

গিন্নি বলিলেন, 'ওই নাও, নিজেই শুনেছে সব। যাও—বল গিয়ে পাশের ঘরে।'

বাবুর কাছে দাঁড়াইয়া কথা নিস্তারিণী এখনও বলিতে পারে না। চুপ করিয়া সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

গিন্নি বলিলেন, 'আমি এখন উঠে গিয়ে বলতে পারবো না বাছা। উঠতে গেলেই এখুনি হাঁফ ধরবে। বলব এরপর, তুমি যাও।'

কাহাকেও যাইতে হইল না। বাবু নিজেই উঠিয়া আসিলেন। নিস্তারিণী ঘোমটা টানিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

গিন্নি বলিলেন, 'তুমি আবার ঘুমুতে ঘুমুতে উঠে এলে কেন বাপু? ঘুম না হলে আবার বিকেলে বলবে মাথা ধরেছে। এমন কিছু হাতী ঘোড়ার কথা নয়। ওই উনি বলছেন ছেলেকে তার স্কুলে দেবেন, বাবুকে বলে তার ব্যবস্থা করে দাও।'

বাবু বললেন, 'তা বেশ ত। ছেলেটিকে দেখে আমারও সেকথা মনে হয়েছিল বটে।'

গিন্নি তাঁহার মুখের পানে কেমন যেন কটমট করিয়া একবার তাকাইলেন। বলিলেন, 'মনে হয়েছিল? তা বেশ তাহ'লে আজ আর তোমার ঘুমিয়ে

কাজ নেই, ছেলেকে নিয়ে—যাও স্কুলে, গিয়ে ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসো।'

কথাটা রাগের কথা।

বাবু বলিলেন, 'আঃ, কি যে বল! গরীবের ছেলে, মাইনে লাগবে না, বলেকয়ে আমি ফ্রি ক'রে দেবো।'

'মাইনে না হয় লাগবে না। বই ত লাগবে!'

'বই আর কত! মন্টির আমাদের পুরনো বই-টই দিয়েই চালিয়ে দেবে—হ্যাঁগা, আগে কোথাও পড়েছিল তোমার ছেলে, না এই প্রথম স্কুলে ঢুকবে?'

এবার নিস্তারিণীর কথা না বলিয়া উপায় নাই। মাথা নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ পড়তো।'

বাবু বলিলেন, 'আচ্ছা কাল আমি দেবো ব্যবস্থা ক'রে তুমি ভেবো না, যাও।'

নিস্তারিণী চলিয়া গেল।

গিন্নি বালিশেব উপর হাত চাপা দিয়া উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'গরীবের উপর তোমার ভারী যে দয়া দেখছি!'

'কেন গো, কি হ'লো কি?' বাবু বসিলেন। বলিলেন, 'তুমি আবার উঠলে কেন? শোও।'

গিন্নি বলিলেন, 'থাক্, আজ আর শোবো না। ওই বইটা দাও দেখি বাঁ-হাতে ক'রে, পড়ি।'

বই-এর তাক হইতে মোটা একখানা নভেল পাড়িয়া দিয়া বাবু নিজেই সেইখানে শুইয়া পড়িলেন।

বইখানা খুলিয়াই গিন্নি বলিলেন, 'দেখলে? বই দিলে আর চশমাটা দিলে না! থাক তবে, আর উঠতে পারি না।'

গিন্নি বইখানা বন্ধ করিতে যাইতেছিলেন, বাবু উঠিলেন। বলিলেন, 'কোথায় চশমা?'

'ওই ত তোমার হাতের কাছে, দেখতে পাচ্ছ না?'

চশমাটা গিন্নির হাতে দিয়া বাবু বলিলেন, 'তুমি পড় ততক্ষণ, আমি দেখি যদি একটুখানি ঘুমোতে পারি।'

এই বলিয়া তিনি আবার পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

গিন্নি বলিলেন, 'ঘুম আজ আর তোমার হবে না জানি।'

কিন্তু গিন্নির পড়াও বোধকরি হইল না। খানিক পরেই দেখা গেল, থুপ থুপ করিয়া তিনি তাঁহার স্বামীর ঘরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

পরের দিন দুপুরে বাবু খাইতে বসিয়াছেন। পায়ের শব্দে মুখ তুলিয়া দেখিলেন, খাবারের থালা হাতে লইয়া উড়ে এক ঠাকুর।

গিন্নি পাশেই বসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ আবার কখন এলো ?'

গিন্নি বলিলেন, 'সকালে।'

'কেন ? সে মেয়েটির কি হ'লো ?'

'বিদেয় ক'রে দিয়েছি।'

'কেন ? বিদেয় করলে কেন ?'

গিন্নি বলিলেন, 'সে তোমার শুনে কাজ নেই। তুমি খাও।'

বাবু কিন্তু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দোষ-অপরাধ কিছু করেছিল ?'

'করেনি, কিন্তু করতেই বা কতক্ষণ !'

'আহা বেচারা ভদ্রলোকের মেয়ে !'

'হ্যাঁ, ভদ্দরলোকের মেয়ে না আরও কিছু ! ভদ্দরলোকের মেয়ে কখনও পরের বাড়ী চাকরি করতে আসে না।'

'বিপদে পড়েছিল তাই এসেছিল।'

'থাক আর দরদ দেখিয়ে কাজ নেই, তুমি খাও।'

'আবার একটা চাকরি তাকে জোগাড় ক'রে নিতে হবে ত ! দু'দিন সময় দিলে না কেন ?'

'তাহ'লে তোমার খুব ভাল হ'তো, না ? ওদের কখনও চাকরির অভাব হয় না। তুমি চুপ কর।'

এবার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া চুপ করিতে হইল।

চাকরির অভাব কিন্তু সত্যই হয়। তাঁহার মত গিন্নি প্রায় সব বাড়ীতেই আছে।

নিস্তারিণী যেখানে যায় সেইখানেই বলে, 'না মা এমন সোমত্ত বয়েস, এমন রূপ, ব্যাটাছেলের বাড়ী, তোমায় রাখতে ভরসা হয় না বাছা।'

লজ্জায় নিস্তারিণী একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া গিয়া সেখান হইতে পলাইয়া আসিবার পথ পায় না।

সকালে বাহির হইয়া বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গেল। পথের ধারে একটা হোটেল দেখিয়া নিস্তারিণী বলিল, 'তুই এই হোটেলে চারটি খেয়ে আয় বাবা, আমি এইখানে দাঁড়াই।'

আসিবার সময় দয়া করিয়া গিন্নি একটি টাকা দিয়াছিলেন। কাপড়ের খুঁট হইতে খুলিয়া সেই টাকাটি নিস্তারিণী একটা দোকানে ভাঙ্গাইয়া চার আনার পয়সা কার্তিকের হাতে দিয়া বলিল, 'যা বাবা, চট করে খেয়ে আয়।'

কার্তিক বলিল, 'আর তুমি ?'

নিস্তারিণী চট করিয়া বলিয়া বসিল, 'আমায় আজ খেতে নেই বাবা, আমার আজ একাদশী।'

পঞ্চমীর দিনে একাদশী বলিয়া সে নিস্তার পাইল। কার্তিক হোটেলে গেল ভাত খাইতে।

ভাত খাইয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়াই ন'টি পয়সা মা'র হাতে ফেরত দিয়া কার্তিক বলিল, 'সাত পয়সা লাগলো।'

বলিয়াই সে তাহার মা'র মুখের পানে তাকাইয়া কেমন যেন একটুখানি অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার মাথার চুল কি হলো মা ?'

নিস্তারিণী বলিল, 'কেটে ফেললুম বাছা। মাথায় এক বোঝা ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, বড়ো ভারী লাগে।'

কিন্তু কোঁকড়া কোঁকড়া এমন স্থন্দর একপিঠ চুল কাটিয়া ফেলিয়াও নিস্তার নাই। বেলা পড়িয়া আসিল। তবুও কোথাও আশ্রয় মিলিল না।

নিস্তারিণীর মুখখানি শুকাইয়া গেছে। সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই। রাত্রে যদি কোথাও আশ্রয় না মিলে কার্তিককে লইয়া কোথায় যে সে রাত্রি কাটাইবে—কে জানে। পথ চলিতে চলিতে একাগ্রমনে নিস্তারিণী ভগবানকে ডাকিতে লাগিল।

পথের ধারে দেখা গেল, কালীর মন্দিরে অনেকগুলি মেয়ে জড়ো হইয়াছে। মাকে একটি প্রণাম করিবার জন্য নিস্তারিণী ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিল। কত বড় বড় লোকের মেয়েরা আসিয়াছে, কাহারও গায়ে এক-গা গয়না, কাহারও-বা শাড়ীর ঝলমলানিতে চোখ ঝলসিয়া যায়, কেহ-বা লোকজন দেখিয়া নাক

সিটকাইতেছে, প্রতিমার পায়ের কাছে প্রণামীর একটি থালা পাতিয়া দিয়া পূজারী বসিয়া আছে। থালার উপর একটি মেয়ে একটি সিকি ছুঁড়িয়া দিয়া প্রণাম করিল। পাশেই যে মেয়েটি দাঁড়াইয়াছিল সে একটি টাকা ছুঁড়িয়া দিয়া সগর্বে একবার এদিক-ওদিক চাহিল, তাহার পর অবজ্ঞাভরে দুইটা মেয়েকে হাত দিয়া ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া বাহিরে আসিবার জন্য ভিড়ের মাঝে ঢুকিয়া পড়িল। দু'পাশের মেয়েদের ঠেলিয়া ঠেলিয়া সে যখন মন্দিরের দরজায় আসিয়া হাঁপাইতেছে, কার্তিকের হাত ধরিয়া নিস্তারিণী তখন ঢুকিবার চেষ্টা করিতেছিল। কার্তিক বলিল, 'কাজ নেই মা ভিড়ের ভেতর গিয়ে। এইখান থেকেই প্রণাম কর।'

নিস্তারিণীকে আরও কত বাড়ী ঘুরিতে হইবে কে জানে। এখানে এমন করিয়া সময় নষ্ট করা উচিত নয়। বলিল, 'সেই চল্ বাবা, চল্।'

নিস্তারিণী রাস্তায় নামিল।

মন্দিরের সুমুখে কয়েকটি মোটর দাঁড়াইয়াছিল। কয়েকটি মোটর তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

একটা মোটর বাহির হইবার পথ না পাইয়া একেবারে নিস্তারিণীর গায়ে আসিয়া পড়িল।

কার্তিক চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মা! মা!' হৈ হৈ করিয়া চারিদিকে লোক জড়ো হইয়া গেল।

নিস্তারিণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার খুব বেশি লাগে নাই।

গাড়ীর নম্বর লইবার জন্য পুলিশ আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়ী হইতে একটি ছোকরা নামিয়া আসিয়া বলিল, 'থাক আর নম্বর নিও না পুলিশসাহেব, আমি এদের নিয়ে যাচ্ছি আমার বাড়ীতে। বেশি ত লাগেনি!'

ছোকরাটি নিস্তারিণীর কাছে গিয়া বলিল, 'আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে।'

কার্তিক ও নিস্তারিণী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। উঠিয়াই দেখে, সেই মেয়েটি গাড়ীতে বসিয়া,—যে মেয়েটি পূজারীর থালায় একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া লোকজনের ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেয়েগুলাকে 'ছোটলোকের মেয়ে' বলিয়া গালি পাড়িতেছিল।

মেয়েটি বলিল, 'কোথায় যাবে তুমি? চল পৌছে দিয়ে আসি। খুব কি লেগেছে তোমার?'

নিস্তারিণী বলিল, 'না মা লাগে নি বেশি। গাড়ীতে আমায় তুললে কেন মা, নামিয়ে দাও।' বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিল।

মেয়েটি কি যে ভাবিল কে জানে, ড্রাইভারকে বলিল, 'চল আগে আমাদের বাড়ী চল, তারপর আবার গাড়ী করেই এঁকে বাড়ী পৌছে দিও। এই খোকা বুঝি তোমার ছেলে ?'

নিস্তারিণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ মা।'

গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মেয়েটি আবার বলিল, 'আগে আমার বাড়ী চল। তোমার ছেলের হাতে মিষ্টি খেতে কিছু দিয়ে তারপর তোমাদের বাড়ী পৌছে দেবো।'

ছেলেকে মিষ্টি খাওয়াইবার কথাই উঠিত না যদি-না এই মাসখানেক আগে এমনিধারা আর একটা ঘটনা না ঘটিত। ঘটনাটা এমন বিশেষ কিছুই নয়। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোককে ধাক্কা দিয়া রাস্তার উপর ফেলিয়া দিযাছিল মাত্র। পুলিশে গাড়ীর নম্বর লইল, প্রায় মাসাবধিকাল ধরিয়া মামলা চলিল। বুড়ার ছিল বাত। ডাক্তার সঙ্গে লইয়া গিয়া মিছামিছি বলিয়া দিল—মোটরে ধাক্কা খাইয়া অবধি সে আর সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, লাঠি ধরিয়া চলিতে হয়। বাস্, বুড়াকে অনর্থক একটি হাজার টাকা নগদ গুণিয়া দিয়া মামলা মিটাইতে হইল।

সেই ভযেই নিস্তারিণীকে আজ তাহারা গাড়ীতে তুলিয়া লইয়াছে। সেই ভয়েই কার্তিককে সন্দেশ খাওয়াইবে।

নিস্তারিণী বলিল, 'ছেলেকে মিষ্টি খাওয়াতে হবে না মা, উপকারই যদি করতে হয় ত একটি উপকার আপনি করুন।'

'বল কি করতে হবে ?'

নিস্তারিণী বলিল, 'আমি ভদ্দরলোকের মেয়ে মা, ব্রাহ্মণের মেয়ে, আমার বাড়ীতেও দাসদাসী ছিল।'

মেয়েটি বলিল, 'তা তোমার চেহারা দেখে—'

কথাটা তাহার শেষ হইবার আগেই গাড়ী আসিয়া বাড়ীর দরজায় থামিল।

মেয়েটি বলিল, 'চল বাড়ী গিয়ে কথা হবে।'

প্রকাণ্ড বাড়ী, দাসদাসী লোকজন চারিদিকে গিসগিস করিতেছে।

ভগবান বুঝি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। এইখানেই তাহাদের আশ্রয় মিলিল।

এবার কিন্তু নিস্তারিণী ভুল করে নাই; এবার সে সর্বপ্রথমেই চুক্তি করিয়া লইয়াছিল যে, ছেলেটিকে তাহার স্কুলে পড়াইতে হইবে এবং তাহার জন্য নিজে সে বেতন লইবে না বরং তাহাও ভাল।

স্থতরাং এবাড়ীতে তাহাদের সেই ব্যবস্থাই হইয়াছে। কার্তিক স্কুলে যায়, নিস্তারিণী রান্না করে। নীচের তলায় ভাঁড়ার ঘরের পাশে যে ঘরখানি আছে তাহারা দুই মা ও ছেলে সেই ছোট ঘরখানি দখল করিয়াছে।

এবাড়ীর গিন্নি একটুখানি অন্য রকমের। বড় ছেলে এটর্ণী, তাহারই স্ত্রী অর্থাৎ বাড়ীর বড় বৌ গিন্নি। শাশুড়ী বাঁচিয়া নাই কিন্তু শ্বশুর বাঁচিয়া আছেন। বাহিরের একটা ঘরে বুড়া শ্বশুর দিবারাত্রি বসিয়া বসিয়া চশমা চোখে দিয়া স্থর করিয়া 'স্তবকবচমালা' পাঠ করেন। স্নানাহারের সময় মাত্র একবার বাড়ীর ভিতরে আসেন, তাহার পর আবার তিনি নির্দিষ্ট ঘরখানিতে গিয়া বসেন।

বাড়ীর গিন্নি মাণিকমালার মন ভাল থাকিলে নিস্তারিণীকে কাছে ডাকিয়া বসান। বসাইয়া বলেন, 'ওই যে শ্বশুরটিকে দেখছো মা, বাইরে থেকে এমনিতে দেখতে বেশ ভাল, কিন্তু কাজের বেলা—ভোঁ ভোঁ।'

নিস্তারিণী বলিল, 'কেন মা, আমাদেব সঙ্গে ত' বেশ ভাল করেই কথা বলেন।'

মাণিকমালা বলিলেন, 'কথা কেন বলবেন না! কিন্তু জানো তুমি বুড়োর কত টাকা আছে?'

'কেমন ক'রে জানবো মা?'

মাণিকমালা বলিলেন, 'তা প্রায় লাখখানেক হবে। একটি পয়সা খরচ করবে না বুড়ো, কৃপণ-কঞ্জুষের একশেষ।'

নিস্তারিণী বলিল, 'সে ত আপনাদের জন্যেই রেখে যাচ্ছেন উনি। ও টাকা ত আপনারাই পাবেন মা।'

'হুঁ।' বলিয়া মুখ টিপিয়া মাণিকমালা একটুখানি হাসিলেন। হাসিয়া বলিলেন, 'আমার সঙ্গে বুড়োর বনে না কিছুতেই। তাই মাঝে মাঝে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলা হয়—টাকা আমি আমার যাকে খুশি দিয়ে যাব। মরবার আগে পথের লোককে দান ক'রে দেবো।'

নিস্তারিণী কি আর বলিবে, চুপ করিয়াই থাকে।

কিন্তু মাণিকমালা চুপ করেন না। বলেন, 'সে পথ অবিশ্যি মেরে রাখা হয়েছে। ছেলেও ত বাবা এটর্নী, মানুষ চরিয়ে খায়। তুমি যাও ডালে ডালে ত সে যায় পাতায় পাতায়।'

এই বলিয়া টানিয়া টানিয়া তিনি হাসিতে থাকেন।

মাস-তিনেক পরে একদিন মাণিকমালা ডাকিলেন 'নিস্তারিণী! শোনো!'

নিস্তারিণী বলিল, 'কি মা?'

মাণিকমালা বলিলেন, 'কাছে স'রে এসো। চেঁচিয়ে বলবার কথা নয়।'

নিস্তারিণী তাঁহার কাছে গিয়ে দাঁড়াইলে মাণিকমালা চুপি চুপি বলিলেন, 'বারণ ক'রে দিলাম তবু ত কই শুনলে না! এখনও শুনছি তুমি বুড়োর ঘরে যাও, এখনও শুনছি তুমি তার সেবা-শুশ্রূষা কর, আবার এও শুনছি নাকি বুড়ো বলেছে তোমার ছেলেকেই তার টাকাকড়ি সব দিয়ে যাবে, ব্যাপারটা কি বল দেখি?'

নিস্তারিণী বলিল, 'টাকাকড়ির কথা কিছু জানি না মা, তবে বুড়ো মানুষ, আমার বাবার মত মনে হয়, যদি কখনও ডেকে বলেন, মা এইটে কর্, আমি না গিয়ে পারি না মা! আমায় ঠিক মেয়ের মত স্নেহ করেন।'

মাণিকমালা বলিলেন, 'হুঁ। তোমায় তিনি ঠিক মেয়ের মত স্নেহ করেন, তুমি তাঁকে বাবার মতন ভক্তি কর—এসব কথার মানে আমরা বুঝি মা। আমরাও মানুষ, ঘাস খাই না, বুঝলে?'

নিস্তারিণী কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'এই আমি তোমার পায়ে হাত দিয়ে—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়া মাণিকমালা বলিল, 'থাক, আর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করতে হবে না।'

বলিয়া তিনি দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া দ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন।

নিস্তারিণী অবাক্ হইয়া সেইখানেই দাঁড়াইয়া রহিল।

এতবড় একটা লোকের বাবা বৃদ্ধ শিবদাসবাবুর কষ্ট দেখিলে চোখে জল আসে। নিজেই তামাক সাজেন, নিজেই থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বিছানা পাতেন, রাত্রে এক গ্লাস জল দরকার হইলে নিজেকেই বিছানা হইতে উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া আলো জ্বালিতে হয়। রাত্রে বোধ করি চোখে ভাল দেখিতেও পান না।

কিন্তু নিস্তারিণী যে-কয়দিন তাঁহার কাজকর্ম করিতেছে, সে ক'দিন তিনি বড় সুখেই বাস করিতেছিলেন। সেদিন হঠাৎ কোন্ দিক দিয়া কি যে হইয়া গেল, শিবদাসবাবু ডাকিলেন, 'নিস্তারিণী।'

অথচ নিস্তারিণীর কোনও সাড়া পাইলেন না।

আবার ডাকিলেন, কিন্তু সেবারেও চুপ!

তখন আর নিস্তারিণীকে না ডাকিয়া তিনি কার্তিকের নাম ধরিয়া বার-দুই ডাকিতেই কার্তিক তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

শিবদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোর মা কোথায় রে কার্তিক ?'

কার্তিক বলিল, 'কি করতে হবে বলুন আমি ক'রে দিই।'

'কেন তোর মা কি কোনও কাজ করছে ?'

কার্তিক শিবদাসবাবুর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'না—কাঁদছে।'

'কাঁদছে ? আমি ডাকলাম ত কই সাড়া দিলে না ত!'

কার্তিক চুপ করিয়া রহিল।

শিবদাসবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'চল দেখে আসি।'

কিন্তু পাশের ঘর হইতে নিস্তারিণী বোধ হয় ইহাদের সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিল। বৃদ্ধকে আর কষ্ট করিয়া যাইতে হইল না। নিস্তারিণী নিজেই ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিল। এবং ঘরে ঢুকিয়াই বিছানাটা তুলিয়া ফেলিয়া আবার নূতন করিয়া পাতিতে লাগিল।

শিবদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এত ক'রে ডাকলাম তবু সাড়া দিলিনি কেন ?'

নিস্তারিণী কথাটার জবাব দিল না।

শিবদাসবাবু বলিলেন, 'জবাব দিচ্ছিস নি যে নিস্তারিণী ?'

নিস্তারিণী তখন বিছানায় চাদর বিছাইতেছিল। বলিল, 'এমনি।'

'শুনলাম কাঁদছিলি ব'সে ব'সে। কেন, কান্না কিসের?'

এত দুঃখেও নিস্তারিণীর হাসি পাইল। তাঁহার দিকে মুখ ফিরাইয়া ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'জীবনে আমার কাঁদবার ত কিছুই নেই, কাঁদবো কেন বাবা, কাঁদিনি।'

বলিতে বলিতে চোখদুটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

শিবদাসবাবু চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। নিস্তারিণী বিছানা পাতিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

তামাক সাজিয়া গড়গড়ার নলটা শিবদাসবাবুর হাতে ধরাইয়া দিয়া নিস্তারিণী হাসিতে হাসিতে বলিল, 'এসব কি আর মেয়েমানুষের কাজ! আপনি একটা চাকর রাখুন বাবা।'

শিবদাসবাবু বলিলেন, 'তা কি আর আমি রাখতে পারি না রে পাগলী, পারি। তোকে ডাকি কেন জানিস নিস্তারিণী? ঠিক তোর মত আমার একটা মেয়ে ছিল। মেয়েটা ম'রে গেছে।'

এই পর্যন্ত বলিয়াই মুখের কথা তাঁহার মুখেই আটকাইয়া রহিল।

কার্তিক আগেই চলিয়া গিয়াছিল। নিস্তারিণীও চলিয়া গেল। একাকী এই নির্জন কক্ষের মধ্যে বসিয়া বৃদ্ধ শুধু তামাক টানিতে লাগিলেন।

খানিক পরে বাহিরে হঠাৎ কাহার যেন কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া শিবদাসবাবু গড়গড়ার নলটা হাতের কাছে নামাইয়া রাখিলেন।

শোনা গেল তাঁহার পুত্রবধূ মাণিকমালা বলিতেছেন, 'বারণ করেছি ব'লে এবার বুঝি দু'জনে যাওয়া হয়েছিল? তা'হলে আর আমার কাছে কেন বাছা, ওঁর কাছেই ছেলের স্কুলের মাইনেটা নিও।'

বৌমা যে কেন তাহাকে তিরস্কার করিতেছেন এবং কেনই বা নিস্তারিণী আজ তাঁহার কাছে আসিতে চায় নাই, এতক্ষণ পরে শিবদাসবাবু তাহা বুঝিতে পারিলেন।

তাহার পর তিন চারিদিন ধরিয়া কেহ কাহারও কাছে গেল না। নিস্তারিণী গেল না শিবদাসবাবুর কাছে, শিবদাস আসিলেন না নিস্তারিণীর কাছে।

প্রতিমাসের পনেরোই তারিখে স্কুলের বেতন দিতে হয়। পনেরোই না দিতে পারিলে প্রত্যহ এক আনা করিয়া জরিমানা।

বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের বেতন পনেরো তারিখের আগেই দেওয়া হয়। টাকাটা অফিসের বেয়ারার হাতে বড়বাবু তাঁহার অফিস হইতেই পাঠাইয়া দেন। কার্তিকের বেতন কিন্তু সেখান হইতে যায় না। কার্তিক বলে তাহার মাকে। তাহার মা বলে মাণিকমালাকে। মাণিকমালা দু'চার কথা শুনাইয়া তাঁহার হাতবাক্স হইতে নিস্তারিণীর বেতনের পরিবর্তে কার্তিকের বেতন দেন।

সেবার কিন্তু পনেরো তারিখে মাণিকমালা কার্তিকের বেতন কিছুতেই দিলেন না। ক্রমাগত সেই এক কথাই বলিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'কেন ওই বুড়ো দিক্ না! বুড়োর সঙ্গে যে মা-বেটার খুব ভাব গো!'

দিতে অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহাকেই হইল। দিলেন ষোলো তারিখে।

ষোলো তারিখে এক আনা জরিমানা লাগিবে। অথচ সেকথা কার্তিকও মুখ ফুটিয়া তাহার মাকে বলিতে পারিল না। তাহার মা-ও বলিতে পারিল না মাণিকমালাকে।

কার্তিক বড় হইয়াছে। মা যে তার বড় দুঃখী তাহা সে বোঝে। একে এই বেতনের টাকা আদায় করিতে মাকে তাহার কত গঞ্জনা সহিতে হইয়াছে, তাহার উপর আবার জরিমানার পয়সা চাহিতে গেলে না জানি তাহাকে কত কথাই না শুনিতে হইবে। কাজ নাই। কার্তিক ভাবিল, স্কুলের বেতন যিনি আদায় করেন তাঁহার কাছে কাঁদিয়া বলিলেই তিনি তাহার জরিমানার পয়সা নিশ্চয় ছাড়িয়া দিবেন।

এই ভাবিয়া সে স্কুলে যাইবার জন্য বাড়ীর বাহির হইতেছে, দেখিল বাড়ীর অন্যান্য ছেলেরা স্কুলে না গিয়া রাস্তায় খেলা করিতেছে। কার্তিককে দেখিয়া তাহাদের একজন বলিয়া উঠিল, 'বা-রে, তুই যে আজ স্কুলে যাচ্ছিস্ ?'

'কেন ? তোমরা যাবে না ?' বলিয়া কার্তিক থমকিয়া দাঁড়াইল।

নরেন বলিয়া উঠিল, 'বা-রে! আজ যে স্কুলের ছুটি! তুই বুঝি তাও জানিস্নি ?'

কার্তিক জিজ্ঞাসা করিল, 'কিসের ছুটি ?'

একটা ছেলে ছিল বুদ্ধিমান। টপ কবিয়া বলিযা বসিল, 'এম্পারার্স বার্থ ডে।'

হইবেও বা। কার্তিক ইতস্তত করিতেছিল। নরেন, কুমার, ঘণ্টি, রাধু

সকলে মিলিয়া বলিয়া উঠিল, 'বইগুলো রেখে আয় বাড়ীতে। চ, আমরা পার্কে গিয়ে খেলা করিগে।'

কার্তিক বাড়ীতে বই রাখিয়া তাহাদের সঙ্গে খেলা করিতে গেল।

পরদিন কার্তিক স্কুলে গিয়া প্রথমেই বেতনের টাকা জমা দিতে গিয়া শুনিল, জরিমানা লাগিবে তিন আনা! বেতন দিতে দুদিন দেরীর জন্য দু' আনা আর স্কুল কামাই করার জন্য এক আনা।

কার্তিক বলিল, 'কামাই কিসের স্যার, কাল ত এম্পারার্স বার্থডে'র ছুটি ছিল।'

মাষ্টারমশাই বলিলেন, 'এম্পারার্স বার্থডে কিরে! সে আবার কি! কাল ছুটি ছিল তোকে কে বললে?'

কার্তিকের সঙ্গে পড়িত কুমার ও ঘণ্টি। কার্তিক তাহাদের মুখের পানে তাকাইতেই দেখিল তাহারা ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছে।

মাষ্টারমশাইকে কার্তিক অনেক অনুনয় বিনয় করিল,—কাঁদিয়া বলিল, 'আমি বড় গরীব স্যার, আমার মা—'

আর কিছু সে বলিতে পারিল না। ঠোঁট দুইটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

মাষ্টারমশাই এমন অনেক শুনিয়াছেন। বলিলেন, 'কিছুতেই হবে না। কাল চার আনা পয়সা নিয়ে এসো। যাও।'

কার্তিক কিছুতেই যাইতেছিল না। মাষ্টারমশাই ছড়ি দিয়া সজোরে তাহার পিঠে এক ঘা মারিতেই কাঁদিতে কাঁদিতে কার্তিক তাহার নিজের জায়গায় গিয়া বসিল।

কুমার ও ঘণ্টি তখনও ফিক ফিক করিয়া হাসিতেছে।

চার আনা পয়সা!

মা তাহার কোথায় পাইবে চার আনা পয়সা? মার হাতে যাহা ছিল তাই দিয়া সেদিন একখানি বই কিনিতে হইয়াছে। এখন উপায়? কার্তিক তাহার মাকে কোনও কথাই বলিতে পারিল না। ভাবিল, মাণিকমালাকে সে নিজে একবার বলিয়া দেখিবে। হয়ত তাঁহার দয়া হইতেও পারে।

স্কুলের ছুটির পর বাড়ী ফিরিয়া কার্তিক সেদিন কুমার, ঘন্টি, নরেন ও রাধুর সঙ্গে খেলা করিবার ছল করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ছেলেদের সঙ্গে বারকতক সে মাণিকমালার কাছে গিয়াও দাঁড়াইল, কিন্তু কথাটা সে বলিতে কিছুতেই পারিল না।

নিচের রাস্তায় চিনেবাদাম হাঁকিতেছিল। ঘন্টি ও কুমার ছুটিয়া মাণিকমালার কাছে গিয়া বলিল, 'মা, দুটো পয়সা দাও, চিনেবাদাম কিনবো।'

মাণিকমালা দোতলার বারন্দায় রেলিং-এর গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িয়া নিচের দিকে তাকাইয়া কি যেন দেখিতেছিলেন। ছেলে দুইটা কিছুতেই যখন তাঁহাকে ছাড়িল না তখন তিনি ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার হাত-বাক্সটি খুলিলেন। একটি আনি বাহির করিয়া রাধুর হাতে দিয়া বলিলেন, 'চার জনে চার পয়সা নাওগে। মারামারি কোরো না।'

কার্তিক জানালার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। মাণিকমালা সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ছেলেরা গোলমাল করিতে করিতে চিনেবাদাম কিনিবার জন্য নিচে নামিয়া গেল। মাণিকমালা আবার তাড়াতাড়ি বারন্দায় গিয়া রেলিং-এর গায়ে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। হাত-বাক্সটা ঘরের মেঝের উপর খোলাই পড়িয়া রহিল।

বলিবার ইহাই উপযুক্ত সময়। বলিবার জন্য কার্তিক একবার আগাইয়াও গেল। কিন্তু নিচে কি যেন দেখিতে পাইয়া মাণিকমালাও তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নিচে নামিয়া গেলেন।

কার্তিক একাকী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ঘরের মেঝের উপর গৃহিণীর হাত-বাক্স খোলা পড়িয়া আছে। অনেকগুলো টাকা পয়সা সিকি দুয়ানিতে ভর্তি। কেহ কোথাও নাই। কার্তিক ভাবিল, চার আনা পয়সা—একটি সিকি সে যদি বাক্স হইতে তুলিয়া লয় ত কেহ জানিতেও পারিবে না, কাহারও কোন ক্ষতিও হইবে না।

কিন্তু চুরি করিবে সে কেমন করিয়া! কার্তিকের বুকের ভেতরটা কেমন যেন দুরদুর করিতে লাগিল।

ওদিকে মাণিকমালা দেখিলেন, 'একখানা কাগজ হাতে লইয়া তাঁহার

বুড়া শ্বশুর নিস্তারিণীর ঘরে গিয়া ঢুকিলেন। কি প্রয়োজনে ঢুকিলেন দেখিবার জন্য মাণিকমালা নিচে নামিয়া সেইদিকেই যাইতেছিলেন, হঠাৎ তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া বাহিরে জানালার কাছে চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ঘরের মধ্যে কথা হইতেছিল :

শিবদাসবাবু বলিলেন, 'হ্যাঁ-মা আমি বলছি, ওটা তোর কাছেই রেখে দে।'

নিস্তারিণী বলিল, 'কি হবে বাবা ওটা রেখে? ওটা কি?'

'ও আমি তোর ছেলেকে দিলাম। তোর ছেলের একদিন কাজে লাগবে।'

নিস্তারিণী বলিল, 'আপনার বৌমা রাগ করবেন বাবা।'

শিবদাসবাবু বলিলেন, 'আমার বৌমার অভাব কিছুই নেই মা, তাদের অনেক আছে।'

এই বলিয়া শিবদাসবাবু ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, মাণিকমালা তাড়াতাড়ি পা টিপিয়া টিপিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন।

খানিক পরে দোতলায় ভয়ানক একটা গোলমাল শোনা গেল। মনে হইল যেন মাণিকমালা চীৎকার করিতেছেন আর কার্তিক কাঁদিতেছে।

চিনাবাদাম খাইতে খাইতে হৈ হৈ করিয়া ছেলেগুলো উপরে উঠিয়া গেল। নিস্তারিণী ছুটিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে শিবদাসবাবু সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

উপরে সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মাণিকমালা বলিতেছেন, 'চোর হারামজাদা চোর, ছি ছি ছি ছি, চোর চণ্ডালকে ডেকে এনে আমি বাড়ীতে ঠাঁই দিলাম, আমার যেমন আক্কেল!'

তাহারই পাশে দাঁড়াইয়া কার্তিক থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। নিস্তারিণী সিঁড়ির নীচে দাঁড়াইয়া নির্বাক বিস্ময়ে সেইদিক পানে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া রহিল, তাহার পর জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হয়েছে মা?'

মাণিকমালা বলিলেন, 'হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! মনের ভুলে ঘরের মেঝেয় ক্যাস্‌বাক্সটা খুলে রেখেছিলুম, তোমার এই গুণধর ছেলে দেখি ঘর থেকে বেরুচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলাম, "কি নিলি!" উনি বললেন, "কিচ্ছু নিইনি।" তারপর প্যাণ্টালুনের পকেট হাত্‌ড়ে দেখি—এই ছাখো, দেড়টি টাকা চুরি করেছেন।'

কার্তিক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ও আমার স্কুলের মাইনে। চুরি আমি করিনি।'

'এখনও বলছে স্কুলের মাইনে! এখনও বলছে চুরি আমি করিনি। হারামজাদা! দূর হয়ে যা আমার বাড়ী থেকে! দূর হয়ে যা আমার সুমুখ থেকে!' বলিয়াই তিনি সজোরে মারিলেন কার্তিকের পেটে এক লাথি। আচমকা লাথি খাইয়া যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গিয়া কার্তিক গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর সিঁড়ির উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে সে পড়িয়া যাইতেছিল, নিস্তারিণী তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। দেখিল মুখ দিয়া কাণ দিয়া তাহার রক্ত পড়িতেছে। অতি কষ্টে কার্তিক বলিল, 'চুরি আমি করিনি মা।'

নিস্তারিণী বলিল, 'স্কুলের মাইনে এতদিন দাওনি কেন?'

কার্তিক বলিল, 'মাষ্টারমশাই নেন্‌নি, চার আনা জরিমানা লাগবে।'

নিস্তারিণী কার্তিকের হাত ধরিয়া বলিল, 'ওঠ্।'

কার্তিক উঠিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু উঠিতে পারিল না।

মার খাইয়া কার্তিকের কি যে হইল, সর্বাঙ্গে বেদনা লইয়া সেই যে সে শুইয়া পড়িল, সারারাত ধরিয়া না পারিল নড়িতে, না পারিল উঠিয়া বসিতে। ক্রমাগত কাঁদিয়া কাঁদিয়া সে বলিতে লাগিল, 'চুরি আমি করিনি মা, চুরি করতে পারিনি।'

ছেলের শিয়রে বসিয়া সারারাত্রি নিস্তারিণী জাগিয়া কাটাইল। রাত্রি জাগিয়া সকালের দিকে সে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, জাগিয়া উঠিয়াই দেখিল, কার্তিকের সর্বাঙ্গ যেন আগুনের মত গরম হইয়া উঠিয়াছে, কথা পর্যন্ত কহিতে পারিতেছে না।

ভয়ে ভাবনায় নিস্তারিণীর সর্বশরীর হিম হইয়া আসিল। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া সে শিবদাসবাবুর ঘরের দরজায় গিয়া দাঁড়াইতে দেখিল, ভিতর হইতে দরজা বন্ধ। শিবদাসবাবু আহ্নিকে বসিয়াছেন। কখন বাহির হইবেন কে জানে।

নিস্তারিণী আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না। কাঁদিয়া একেবারে

মাণিকমালার পায়ের কাছে আছাড় খাইয়া পড়িল। বলিল 'ছেলের আমার কি হয়েছে দেখে যাও মা, কথা কইতে পারছে না।'

মাণিকমালা বলিলেন, 'ভালই হয়েছে। যেমন কর্ম তেমনি ফল।'

নিস্তারিণী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মাণিকমালা বলিলেন, 'চুপ কর মা চুপ কর, গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ো না। বাবু এখনও বাড়ীতে রয়েছে, অফিসে যায়নি। থামো, ছেলে তোমার মরবে না।'

নিস্তারিণী ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মাণিকমালা বলিলেন, 'কেন আমার কাছে কাঁদতে এলে মা! যিনি তোমাদের যথাসর্বস্ব দান করেছেন সেই তার কাছে যাও, সেই বুড়োই তোমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দেবে যাও।'

যথাসর্বস্ব দান করিবার মানেটা নিস্তারিণী ভাল বুঝিতে পারিল না। তবে কাহাকে ইঙ্গিত করিয়া কথাটা বলা হইতেছে তাহা সে বুঝিল।

নিস্তারিণী চুপ করিয়াই ছিল, মাণিকমালা বলিলেন, 'বুড়ো যে কাগজটা তোমাকে দিয়েছে সেইটে নিয়ে এসো যাও।'

নিস্তারিণী বলিল, 'কিছুতেই আমার আর কিছু দরকার নেই মা, আমার ছেলেই যদি যায়—'

বলিতে বলিতে আবার সে কাঁদিয়া উঠিল।

মাণিকমালা বলিলেন, 'চল আমি তোমার সঙ্গে যাই, কাগজখানা দেবে চল। তারপর বাবু থাকতে থাকতে—ছেলেকে তোমার ডাক্তার কোব্‌রেজ দেখাতেই যদি হয় ত—চল।'

বলিয়া নিস্তারিণীকে একরকম জোর করিয়াই তিনি তুলিয়া লইয়া গেলেন।

মাণিকমালা তাহার ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন, নিস্তারিণী কাগজ-খানা আনিবার জন্য ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই দেখিল বৃদ্ধ শিবদাসবাবু আহ্নিক শেষ করিয়া কার্তিকের শিয়রের কাছে বসিয়া রহিয়াছেন।

নিস্তারিণী কাহাকেও কিছু না বলিয়া কাগজখানি হাতে লইয়া আবার বাহিরে গিয়া মাণিকমালার হাতে দিয়া বলিল, 'এই নাও মা, এতে আমার কিছু দরকার নেই। আমার ছেলেকে তুমি বাঁচিয়ে দাও।'

কাগজখানি হাতে লইয়া মাণিকমালা বোধকরি তাহার স্বামীকে দেখাইবার জন্য উপরে উঠিয়া গেলেন।

নিস্তারিণী ফিরিয়া আসিতেই শিবদাসবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় গিয়েছিলি মা? এদিকে ছেলেটার যে একটা কিছু ব্যবস্থা করতে হবে।'

নিস্তারিণী বলিল, 'কি ব্যবস্থা করব বাবা?'

বলিয়া সে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

শিবদাসবাবু বলিলেন, 'এখন বসে বসে শুধু কাঁদলে চীৎকার করলে চলবে না মা, ছেলের জন্যে ভাল একজন ডাক্তার ডাকতে হবে।'

নিস্তারিণী বলিল, 'সেই জন্যই গিয়েছিলাম বাবা গিন্নিমার কাছে। মা বললেন, আমার শ্বশুর তোমাকে যে কাগজখানি দিয়েছেন সেইটে এনে দাও আগে, তারপর ডাক্তারের ব্যবস্থা করছি। সেইজন্যেই ত দিয়ে এলাম কাগজখানা বাবা।'

শিবদাসবাবু চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'দিয়ে এলি?'

নিস্তারিণী বলিল, 'আমার ছেলেই যদি না বাঁচে, কি হবে বাবা আপনার ও কাগজ নিয়ে?'

'কি হবে?' বলিয়া বৃদ্ধ শিবদাসবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে পাইচারি করিতে করিতে বলিলেন, 'আমাকেও এ-বাড়ী থেকে তুই তাড়ালি দেখছি নিস্তারিণী!'

বড়বাবুর তখনও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। কাগজখানা লুকাইয়া রাখিয়া মাণিকমালা তাঁহার পায়ের কাছে গিয়া বলিলেন, 'ওঠো।'

বড়বাবু বলিলেন, 'কেন?'

মাণিকমালা বলিলেন, 'ভারি মজার একটা কথা বলবো তোমাকে। যাও মুখ হাত ধুয়ে এসো।'

বড়বাবু বাথ-রুমে চলিয়া গেলেন। মাণিকমালা চা তৈরী করিতে বসিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া বড়বাবু বলিলেন, 'বল কি মজার কথা!'

'আগে চা খাও।' বলিয়া চায়ের বাটিটা তাঁহার হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া মাণিকমালা তাঁহার বুকের তলা হইতে কাগজখানা বাহির করিলেন।

'কই দেখি!'

বড়বাবু দেখিলেন।

চায়ের বাটি তাঁহার হাতেই রহিল। বিস্ময়ে কিয়ৎক্ষণ হতবাক হইয়া গিয়া কাগজখানার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন।

মাণিকমালা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'অমন ক'রে চেয়ে রইলে যে ?'

বড়বাবু বলিলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে।'

'কিসের সর্বনাশ ?'

বড়বাবু বলিলেন, 'বাবা তাঁর ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার টাকা একেবারে রেজেষ্ট্রী উইল ক'রে লিখে দিয়েছেন ওই ছেলেটার নামে।'

মাণিকমালা বলিলেন, 'তা আমি জানি। জানি বলেই কাল আমি ছেলেটাকে এমন মার মেরেছি, ছেলেটা বাঁচলে হয়।'

বড়বাবু মাথায় হাত দিয়া কিয়ৎক্ষণ কি যেন ভাবিলেন। ভাবিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'ওইখানে ওই ড্রয়ারের ভেতর আমার রিভলভারটা আছে বের ক'রে দাও।'

'রিভলভার কি হবে ?'

'ওদের দু'জনকেই খুন ক'রে ফেলব।'

মাণিকমালা ভয়ে একেবারে কাঠ হইয়া গেল। বলিল, 'না না—খুন কোরো না, পুলিশে ধরবে।'

বড়বাবু ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, 'না গো না, সে বুদ্ধি আমার আছে। খুন করব না, ভয় দেখিয়ে বাবাকে দিয়ে আমি আর একটা উইল লিখিয়ে নেবো।'

রিভলভারটা পকেটে লইয়া বড়বাবু তৎক্ষণাৎ নিচে নামিয়া গেলেন।

কিন্তু নিচে গিয়া দেখেন, কেহ কোথাও নাই। কার্তিককে লইয়া বৃদ্ধ শিবদাসবাবু এবং নিস্তারিণী দু'জনেই কোথায় চলিয়া গিয়াছেন।

একটা চাকর দাঁড়াইয়াছিল, বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এরা কোথায় গেল রে ?'

চাকরটা বলিল, 'ট্যাক্সি ডেকে দিলাম, তাইতে চড়ে কোথায় গেলেন কিছুই ব'লে গেলেন না।'

বড়বাবু বলিলেন, 'ডাক আর-একখানা ট্যাক্সি।'

আবার ট্যাক্সি আসিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু তাহাতে চড়িয়া বসিলেন। বলিলেন, 'কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ।'

গাড়ী বেলগাছিয়ার দিকে ছুটিল।

বেলগাছিয়া হইতে গাড়ী আবার চলিল মেডিকেল কলেজের দিকে।

মেডিকেল কলেজে তাহাদের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল।

কার্ত্তিককে তখন ইন্‌জেক্‌সন দেওয়া হইতেছে।

শিবদাসবাবুর কাছে গিয়া বড়বাবু ডাকিলেন, 'বাবা!'

'কি!' বলিয়া শিবদাসবাবু মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, 'তুমি আবার এখানে কি জন্যে এলে?'

বড়বাবু বলিলেন, 'বাড়ী চল।'

শিবদাসবাবু ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, 'না।'

'বেশ, তবে আমার আপিসে চল।'

'কেন, সেখানে নিয়ে গিয়ে আমাকে দিয়ে আর একটা উইল করিয়ে নেবার মতলব করেছ নাকি?'

বড়বাবু বলিলেন, 'শোনো, এইদিকে এসো বাবা, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।'

'টাকার কথা ত? বল, এইখানেই বল, শুনছি।'

'না এখানে বলবার নয়। আমার গাড়ীতে এসো!'

বাহিরে রাস্তার উপর গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল। শিবদাসবাবুকে গাড়ীর ভিতর লইয়া গিয়া বড়বাবু তাঁহার জামার পকেট হইতে তাঁহার উইলখানি বাহির করিয়া বলিলেন, 'এটা তোমার কি হয়েছে শুনি? তোমার কি ভীমরতি হয়েছে বাবা?'

শিবদাসবাবু বলিলেন, 'ভীমরতি হয়নি শশধর, এ টাকা আমি তোমারই জন্য রেখেছিলাম, তুমি যদি উপার্জন করতে না পারতে, তোমার যদি কিছুই না থাকতো তাহলে এ টাকা আমি তোমাকেই দিয়ে যেতাম্। কিন্তু তোমার অনেক আছে ব'লে টাকাটা আমি এমন একজনকে দিয়ে গেলাম যার টাকার প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশি।'

শশধর বলিলেন, 'আমারও যে টাকার কত প্রয়োজন তা তুমি জানো না বাবা।'

শিবদাসবাবু বলিলেন, 'আমি তা বিশ্বাস করি না বাবা। আর বেশি টাকা নিয়ে তুমি কি করবে? যে-টাকা ভগবান তোমায় দিয়েছেন তাইতেই

তোমাদের চরম অবনতি হয়েছে, ওই এতটুকু একটা ছেলেকে খুন ক'রে ফেলতেও তোমার স্ত্রী—'

স্ত্রীর নাম শুনিয়া বড়বাবু বোধকরি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন। বলিলেন, 'চুপ কর বাবা, খুন আমি শুধু ওকেই করিনি, আজ আমি—এই নাও কাগজ এই নাও কলম, যা বলছি লিখে যাও, নইলে—'

বলিয়া পকেট হইতে রিভলভারটা বাহির করিয়া বৃদ্ধ পিতার সুমুখে ধরিয়া বলিল, 'আজ আমি তোমাকেও—'

শিবদাসবাবু তাঁহার পুত্রের মুখের পানে একবার তাকাইলেন। এই শশধরই তাঁহার একমাত্র পুত্র, লেখাপড়া শিখিয়া এটর্ণী হইয়াছে।

বলিলেন, 'রিভলভার দিয়ে আমায় মেরে ফেললে তোমার মঙ্গল হবে না। টাকা যা হাতছাড়া হবার হয়ে গেছে, তার ওপর তোমায় পুলিশে ধরবে। তার চেয়ে টাকা তুমি একান্তই চাও, না? আচ্ছা, বোসো এই গাড়ীতে, আমি একটিবার শুধু দেখে আসি—ছেলেটা মলো কি বাঁচলো।'

ছেলেটাকে দেখিতে গিয়া শিবদাসবাবু দেখিলেন, পুলিশের লোক নিস্তারিণীকে ধরিয়া বসিয়াছে, 'বলুন আপনি, কে একে এমন ক'রে মেরেছে বলুন, আপনার কোনও ভয় নেই।'

নিস্তারিণী কিন্তু উন্মাদিনীর মত বারেবারে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ছেলে তাহার বাঁচিবে কি না।

ডাক্তার বলিলেন, 'বাঁচবে, আপনার কোনও ভয় নেই, বলুন।'

শিবদাসবাবু আগাইয়া গেলেন। বলিলেন, 'ও বলতে পারবে না। আমি বলছি। ওকে মেরেছে আমার পুত্রবধূ। আমার ছেলে ওকে একেবারে শেষ ক'রে দেবার জন্যে রিভলভার নিয়ে এখান পর্যন্ত ধাওয়া করেছে, গ্রেপ্তার যদি করতে চান ত' আসুন আমার সঙ্গে।'

শিবদাসবাবুর সঙ্গে পুলিশ দেখিয়া শশধর পলায়ন করিতেছিলেন। পুলিশ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

শশধর তাঁহার বাবার দিকে তাকাইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিলেন। বৃদ্ধ শিবদাসবাবু দু'চোখ বাহিয়া তখন জল গড়াইয়া পড়িতেছে। মাথায় হাত দিয়া রাস্তার ধারে তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িলেন।

ইন্সপেক্টরবাবু তাঁহার একখানা হাত ধরিয়া বলিলেন, 'উঠুন। আচ্ছা এ-কাণ্ড কেন হলো বলতে পারেন?'

বৃদ্ধের মুখ দিয়া কথা বাহির হইতেছিল না, তবু তিনি অতি কষ্টে উচ্চারণ করিলেন, 'টাকার জন্যে।'

উপহাস

নাম কাঙ্গালীচরণ।

তা কাঙ্গালীচরণই বটে! যেমন ঢ্যাঙ্গা তেমনি রোগা, পাকানো পাকানো দড়ির মত হাত-পা; দেখিলে মনে হয় যেন পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। কিন্তু পেট ভরিয়া খাইতে না পাইবার মত দুরবস্থা তাহার নয়।

বাড়ী ভাড়া লইতে গিয়াই তাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কম ভাড়ায় ভাল একখানি বাড়ীর সন্ধান করিতেছিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে হয়রান হইয়া গিয়া শেষে একদিন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলাম, বাড়ী ঠিক না করিয়া আজ আর বাসায় ফিরিব না।

আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, ছোট একটি গলির ধারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছোট্ট একখানি দোতলা বাড়ীর দরজায় দেখিলাম—'টু-লেট' টাঙানো। সদর দরজার কড়া নাড়িতেই ভেতর হইতে জবাব আসিল,—'কড়া ধ'রে টানুন, টানলেই খুলে যাবে।'

কড়া ধরিয়া টানিলাম। টানিবামাত্র ওপাশে খুট্ করিয়া আওয়াজ হইল। তাহার পর ঠেলিতেই দেখি, দরজা খুলিয়া গিয়াছে। সুমুখের ঘর হইতে যিনি আমায় 'আসুন' বলিয়া আহ্বান করিলেন তিনিই কাঙ্গালীচরণ।

ঘরের মেঝেয় বসিয়া তিনি তখন অত্যন্ত মনোনিবেশ সহকারে একপাটি চটি জুতার নিচে পেরেক ঠুকিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন, 'কি চাই?'

'বাড়ী ভাড়া।'

'বসুন।' বলিয়া হাতুড়ি-সমেত সেই কঙ্কালের মত শীর্ণ হাতখানি বাড়াইয়া একখানি চেয়ার দেখাইয়া দিলেন।

চেয়ারখানি কাঠের, কিন্তু তাহার আগাগোড়া কাপড় দিয়া এমন করিয়া ঢাকা যে, কাঠের চিহ্ন কোথায়ও দেখিবার জো নাই। জামা দিয়া মানুষ যেমন করিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঢাকিয়া রাখে, কাঙ্গালীচরণও তেমনি একটি জামা সেলাই করিয়া তাঁহার এই চেয়ারখানি ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। ঘরখানি ছোট, কিন্তু তাহার প্রত্যেকটি দেওয়াল এবং মেঝেয় কোথাও আর তিলধারণের স্থান

নাই। ঘরের একটি দেওয়াল ঘেঁষিয়া একটি তক্তাপোশ পাতা, তাহার উপর সাদা ধপধপে বিছানা; দেওয়ালে টাঙানো অসংখ্য ছবি; তাহার মধ্যে কালী-দুর্গা লক্ষ্মী-সরস্বতীর ছবি ত আছেই, তাহা ছাড়া বিলাতী মাসিক পত্রিকা হইতে কাটা উলঙ্গ নারীমূর্তি, বিদেশী ক্যালেণ্ডারের ছবি এবং বায়োস্কোপের অভিনেত্রীদের নানান্ ভাবভঙ্গীর প্রতিকৃতির সংখ্যাই বেশি। দেওয়ালের গায়ে দাঁত মাজিবার একটি ব্রাশ, পেরেকের উপর কয়েকটি চায়ের কাপ, তারের শিকায় আধখানি পাঁউরুটি ঝুলিতেছে, ঘরের এক-কোণে একটি ষ্টোভ, ষ্টোভের উপর রান্নার বাসন,—অভাব কিছুই নাই।

একাগ্রমনে এই সব দেখিতেছিলাম, কাঙ্গালীচরণ তাঁহার পেরেক ঠোকা শেষ করিয়া জুতাদুইটি ঝাড়িয়া মুছিয়া ঘরের এককোণে নামাইয়া রাখিয়া আমার কাছে আসিয়া বসিলেন। বলিলেন, 'এই সব দেখছেন? দেখুন। সব আমার নিজের তৈরী। কোনও শালাকে একটি পয়সা দিই না, বুঝলেন?'

এই বলিয়া কোথা হইতে একটা আধ-খাওয়া পোড়া বিড়ি বাহির করিয়া তিনি দিয়াশলাই জ্বালিলেন এবং দিয়াশলাই-এর কাঠিটি উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে ফেলিয়া দিয়া আসিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমার জীবনী লিখলে একটা বই হয় মশাই, আমি যে-সে লোক নই। রবিন্‌সন্ ক্রুশোর গল্প জানেন?'

বলিলাম, 'জানি।'

কাঙ্গালীচরণ চোঁ করিয়া একবার বিড়িটা টানিয়া লইয়া কোঁৎ করিয়া ধোঁয়াটা গিলিয়া ফেলিয়া বলিলেন, 'বাংলাদেশের আমিই রবিন্‌সন্ ক্রুশো।'

মনে-মনেই বলিলাম, 'তা হবে; আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

কিন্তু যাহার জন্য আসিয়াছি তাহার এখনও কিছুই হইল না বলিয়া ভিতরে-ভিতরে অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। বলিলাম, 'বাড়ীখানি কি আপনার?'

কাঙ্গালীচরণ ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমারই। রাজ-মিস্ত্রীদের সঙ্গে নিজের হাতে ইট গেঁথেছি মশাই! এমন বাড়ী আপনি কলকাতা শহরে পাবেন না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কত ভাড়া?'

'ভাড়া ?' বলিয়া তিনি একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিলেন, তাহার পর কি ভাবিয়া বলিলেন, 'বলছি। আগে বাড়ীটা দেখুন। হ্যাঁ, আগে বলুন ত' মশাই, আপনার লোক ক'জন ?'

বলিলাম, 'আমি, আমাব স্ত্রী আর একটি চাকর।'

কাঙ্গালীচরণের মুখ দেখিয়া মনে হইল তিনি অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন। বলিলেন, 'হ্যাঁ তাহ'লে ঠিকই হবে। এইরকম নির্ঝঞ্ঝাট লোকই আমি চাই মশাই! এর আগে এক ব্যাটাকে ভাড়া দিয়েছিলাম ; তার একপাল ছেলে। ছেলে ত' নয়, এক-একটি শয়তান। দাপাদাপি করে' আমার বাড়ী-ঘর-দোর ভেঙে ফেলবার যোগাড় করেছিল মশাই।'

দোতলায় তিনখানি মাত্র ঘর। আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। স্থির হইল ওই ঘব তিনখানি তিনি আমায় পঁয়ত্রিশ টাকায় ভাড়া দিবেন। উপরেই ছোট্ট একফালি বারান্দা আছে। সেইখানেই আমার রান্না হইবে। আর নিচের ওই সুমুখের ঘরখানিতে এখন যেমন বাস করিতেছেন তেমনি বাস করিবেন কাঙ্গালীচরণ নিজে এবং তাঁহার এক পনেরো-ষোলো বছরের অবিবাহিতা কন্যা। সংসারে তাঁহার ওই কন্যাটিই সম্বল। বাকি যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা মরিয়াছেন।

দিন দুই পরেই বাড়ীখানি দখল করিলাম। জিনিসপত্র গোছ-গাছ করিতে বলিয়া বাহির হইয়া গিয়াছিলাম, ফিরিয়া আসিতেই শুনি কাঙ্গালীচরণ চীৎকার করিতেছেন। কেন চীৎকার কবিতেছেন বুঝিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। দেখিলাম, রোগা ছিপছিপে সুন্দরী একটি মেয়ে হেঁটমুখে তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে, আর কাঙ্গালীচরণ বোধ করি তাহাকেই যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিতেছেন। অনুমানে বুঝিলাম—এইটিই তাঁহার সেই একমাত্র কন্যা। অপরাধ মাত্র সে চায়ের একটি কাপ কলতলায় ধুইতে গিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

মেয়েটির মুখখানি ম্লান দেখিয়া দয়া হইল। বলিলাম, 'চায়ের একটা কাপ ত'! যাকগে। তারজন্যে আর—'

কাঙ্গালীচরণের মুখখানা নিমেষেই কেমন যেন অন্যরকম হইয়া গেল।—'কি বললেন? একটা কাপ? হ্যাঁ, একটা কাপ। দাম—দু'আনা। এই দু' আনা পয়সা আসে কোত্থেকে বলুন ত?'

বুঝিলাম, লোকটা অসম্ভব কৃপণ। উহার সঙ্গে আর বাক-বিতণ্ডায় প্রয়োজন নাই। সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিলাম, পিছনে কাঙ্গালীচরণের ডাক শোনা গেল,—'চল্‌লেন যে মশাই? শুনুন। পয়সা-কড়িকে এত হেনস্থা করবেন না, বুঝলেন? ভবিষ্যতে অনুতাপ করতে হবে তা'হলে—এই আমি বলে' রাখলুম। দুটো কাচ্চা-বাচ্চা নেই কিনা, গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছেন। থাকতো যদি একটা বিয়ের বয়সের বাড়ন্ত মেয়ে ত বুঝতেন মজা!'

ঈষৎ হাসিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। ভাবিলাম, তাঁহাকে কৃপণ ভাবা সত্যই আমার অন্যায় হইয়াছে। কৃপণতা হয়ত তাঁহাকে বাধ্য হইয়াই করিতে হয়। মাসে মাসে এই বাড়ীভাড়ার পঁয়ত্রিশটি টাকা মাত্র সম্বল। দু'জনের খাওয়া-পরা, মেয়ের সাজ-পোশাক, বাড়ীর ট্যাক্স,—অবশিষ্ট কতই-বা আর থাকে? নিজের অসময়ের জন্য কিই-বা রাখিবেন, আর মেয়ের বিবাহই-বা দিবেন কেমন করিয়া! সেইজন্যই বোধহয় মেয়েটির এখনও বিবাহ হয় নাই। কাঙ্গালীচরণের কথায় রাগ করা উচিত নয়। বেচারা সত্যই গরীব।

সকালে উঠিয়া তিনি নিজেই বাজার করিয়া আনেন। ছোট্ট একটি তোলা উনান ধরাইয়া মেয়েটি রান্না করে। এক পাকে যা' হয় তাই। ভাতের সঙ্গে ন্যাকড়ায় ডাল সিদ্ধ করিতে দেয়, আলু সিদ্ধ হয়, খুব যদি বেশি হয় ত' দুজনের জন্য দুইটি হাঁসের ডিম সিদ্ধ করিয়া লয়। কিন্তু প্রায় প্রত্যহই দেখা যায়, মেয়েটি বাপের থালায় সবই ধরিয়া দিয়া, নিজে শেষে নিচের একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লুকাইয়া লুকাইয়া শুধু ভাতগুলা গিলিয়া গিলিয়া খায়।

আমার স্ত্রী সেদিন ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে, কিন্তু মেয়েটা পাছে লজ্জিত হয় বলিয়া কিছু বলিতে পারে নাই।

তাহার পর প্রায়ই দেখি রান্না শেষ করিয়াই ছোট একটি থালায় তরকারি সাজাইয়া একবাটি ডাল লইয়া গৃহিণী নিচে নামিয়া গিয়া চুপি চুপি ডাকে, 'কৃষ্ণা!'

মেয়েটির নাম বুঝি কৃষ্ণা। বেশ নাম। কিন্তু নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য তাহার কোথাও নাই। গায়ের রং এত পরিষ্কার যে, কৃষ্ণা তাহাকে বলা চলে না। তবু আমাদের কৃষ্ণাই তাহাকে বলিতে হইবে।

কৃষ্ণা কোনদিন 'না' বলে না। হাত পাতিয়া থালাটি গ্রহণ করে এবং সলজ্জ একটুখানি বড় মিষ্টি মধুর হাসি হাসিয়া বোধকরি তাহার কৃতজ্ঞতা জানায়।

সেদিন বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, কাঙ্গালীচরণ ডাকিলেন, 'বলি ও মশাই, শুনুন!'

ফিরিয়া দাঁড়াইতেই একমুখ হাসিয়া বলিলেন, 'বলি রোজ রোজ এত কেন করেন বলুন ত?'

'কি করি?'

'এই এত এত তরি-তরকারি মাছ ডাল আপনার স্ত্রী রোজই আমার জন্যে পাঠিয়ে দেন। তা এক-আধদিন হয় সেই ভালো, রোজ কেন?'

'তাতে আর কি হয়েছে!' বলিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম কাঙ্গালীচরণ আবার বলিলেন, 'শুনুন, শুনুন, এত তাড়াতাড়ি কেন? তা বৌমাকে বলবেন, তোফা রান্না! এত ভালো লাগে যে একটা টুকরোও কোনদিন আমি ফেলে রাখি না—সব খেয়ে ফেলি।'

তাড়াতাড়ি আমার বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ছিল। বলিলাম, 'বেশ করেন।' বলিয়া যেই আমি পা বাড়াইয়াছি, অমনি পিছন দিক হইতে জামায় এক টান পড়িল,—'আরে শুনুন না, আর-একটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি।'

আবার দাঁড়াইতে হইল।—'কি কথা বলুন!'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'ভাড়াটা তা'হলে কবে নাগাদ পাব বলুন দেখি! রসিদ আমি লিখে রেখেছি।'

মাস শেষ হইতে তখনও দুদিন বাকি। বলিলাম, 'মাসটা আগে শেষ হ'তে দিন। পয়লা তারিখেই পাবেন।'

'বেশ বেশ, পয়লা যেন পাই। আগে থেকে বলে রাখলুম···এই আর কি!' এই বলিয়া কাঙ্গালীচরণ হাসিতে লাগিলেন।

পয়লা তারিখে টাকার যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। সেদিন তেসরা। সেদিনই টাকা পাইবার কথা আছে। ভাবিতেছি, পাইবামাত্র কাঙ্গালীচরণের টাকা আগে মিটাইব। টাকা না পাইলে বেচারার কষ্ট হইবে।

সকালে আমার এক আত্মীয় আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। নিচ হইতে আমার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র গলার আওয়াজ চিনিলাম। বলিলাম, 'আসুন! সিঁড়ি ধরে' ওপরে উঠে আসুন!'

তাঁহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছি। শুনিলাম, কাঙ্গালীচরণ তাঁহাকে ডাকিতেছেন, 'বলি ও মশাই, শুনুন!...ওপরে যাচ্ছেন? আমার ভাড়ার টাকার কথাটা বাবুকে একবার বলবেন ত! পয়লা তারিখে দেবার কথা ছিল, আজ তেসরা হয়ে গেল। আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়েছি মশাই!'

লজ্জায় মরিয়া গেলাম। আত্মীয়ের সুমুখে এই লইয়া ঝগড়া করাও চলে না, অথচ এই অপমান সহ্য করিয়া মুখ বুজিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও কষ্ট হইতে লাগিল।

আত্মীয়কে বিদায় করিয়া কাঙ্গালীচরণের কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম। ভাবিয়াছিলাম, খুব খানিকটা তিরস্কার করিয়া এ-বাড়ীতে যে আমার আর থাকা চলিবে না সেই কথাটাই ভাল করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিব। কিন্তু দেখিলাম, জরাজীর্ণ শতচ্ছিন্ন একখানি খাটো ধুতি পরিয়া আর একখানি কাপড় তিনি সূচ-সূতা দিয়া সেলাই করিতেছেন। দেখিবামাত্র রাগটা আমার অনেকখানি কমিয়া গেল। তবু বলিলাম, 'দেখুন, ভাড়ার তাগাদা আপনি আমার কাছেই করবেন, কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব যে এ বাড়ীতে আসবে তার কাছেই যদি ভাড়ার কথাটা বলেন ত আমার অপমান হয়। তা ছাড়া আমার মত লোকের পাল্লায় পড়ে' যদি আপনার কষ্ট হয় ত বলুন, আমি চলে যাই।'

হেঁটমুখে কাঙ্গালীচরণ সবই শুনিলেন। মুখের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল এমন করিয়া বলাটা যে তাঁহার উচিত হয় নাই তাহা তিনি এতক্ষণে বুঝিয়াছেন। লজ্জায় বোধকরি তিনি আর মুখ তুলিতে পারিবেন না। তেমনি হেঁটমুখেই বলিলেন, 'আচ্ছা, আর বলব না।'

বলিলাম, 'টাকা ঠিক সময়ে না পেলে আপনার কষ্ট হয় বুঝি, কিন্তু—'

কথাটা আমাকে তিনি আর শেষ করিতে দিলেন না। এইবার তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন। বলিলেন, 'বোঝেন ত মশাই! তা আপনি না বুঝলে কে আর বুঝবে বলুন, আপনি একজন শিক্ষিত, বিদ্বান—'

থাক। আর প্রশংসায় কাজ নাই। মানুষকে সন্তুষ্ট করিবার গুপ্তমন্ত্র

কাঙ্গালীচরণ জানেন দেখিতেছি। 'আজই আপনার ভাড়ার টাকা দেবার চেষ্টা করব।' বলিয়া উপরে উঠিয়া যাইতেছিলাম, দেখিলাম সিঁড়ির পাশে ম্লানমুখে কৃষ্ণা দাঁড়াইয়া আছে। পিতার অভদ্র আচরণের জন্য সেও বোধহয় অনুতপ্ত। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'রান্না করছ কৃষ্ণা ?'

ঘাড় নাড়িয়া কৃষ্ণা বলিল, 'না। আমাদের আজ নেমন্তন্ন।'

জিজ্ঞাসা করিতে গিয়া তাহার পরিধেয় বস্ত্রটির দিকে নজর পড়িল। এত ছেঁড়া যে তাহাতে লজ্জা নিবারণ করা শক্ত। তাহাই অতিকষ্টে কোনরকমে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া পড়িয়াছে দেখিলাম। তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গিয়া স্ত্রীকে বলিলাম, 'মেয়েটা কাপড় পরে রয়েছে দেখলাম শতচ্ছিন্ন, একেবারে জরাজীর্ণ। জিজ্ঞেস কর ত ওর কাপড় কি নেই ? তাহ'লে তোমার সেই নতুন কাপড়-জোড়াটা—'

কথাটা শেষ করিবার প্রয়োজন হইল না। স্ত্রী তৎক্ষণাৎ সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া ডাকিল, 'কৃষ্ণা !'

মৃদুকণ্ঠে জবাব আসিল।—'আমায় ডাকছেন বৌদি ?'

'হ্যাঁ ডাকছি। শোনো !'

সিঁড়ি বাহিয়া কৃষ্ণা তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

'কাজকর্ম কিছু করছিলে নাকি ?'

বুঝিলাম চট করিয়া কাপড়ের কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে স্ত্রীর একটুখানি বাধিতেছে।

কৃষ্ণা বলিল, 'সোডা দিয়ে কাপড় সেদ্ধ করতে দিয়েছি।'

'ও, তাই বুঝি এই ছেঁড়া কাপড়টা পরেছ ?'

'হ্যাঁ।'

আমার গৃহিণী তাহাকে আরও কি-যেন বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় নিচ হইতে কাঙ্গালীচরণ ডাকিলেন, 'কৃষ্ণা !'

'যাই।'

মুখ ভ্যাংচাইয়া কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'য্যা-ই ! যেই একটু ফাঁক পেয়েছে আর অমনি উপরে গিয়ে উঠেছে হতভাগা মেয়ে। কাপড়গুলো কাচবিই বা কখন, আর শুকোবেই বা কখন, আর আমি ইস্তিরিই বা করব কখন ? নেমে আয়, চট করে' নেমে আয় বলছি।'

কৃষ্ণা তাড়াতাড়ি নিচে নামিয়া গেল। কাঙ্গালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভোলা রয়েছে ওপরে?'

'কই তাত দেখিনি বাবা?'

ভোলা আমার চাকরের নাম।

কাঙ্গালীচরণ বলিতে লাগিলেন, 'এই যে এই সিঁড়ির নিচেটা এত করে' ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করলাম, ফট করে' ওই কোথাকার কোন এক গুরুপুত্ত্ুর জুতো পায়ে দিয়ে মশমশ করে ওপরে উঠে গেলেন, বাস্, ধুলোয়-কাদায় আবার সব একাকার হয়ে গেল। বলি—এ-সব চরণ-ধুলো কি আমাকেই পরিষ্কার করতে হবে নাকি?'

কথাটা কাহাকে বলা হইল বুঝিলাম। লোকটাকে দয়া করা বৃথা। নিজে কিছু না বলিয়া ভাবিলাম, আসুক ভোলা, তাহাকে দিয়াই জবাব দেওয়াইব। আমার বাড়ীতে লোকজন জুতা পরিয়াই আসিবে এবং যতবার আসিবে ততবার আমার চাকর গিয়া জল ঢালিয়া ঝাঁটা দিয়া ধূলা পরিষ্কার করিয়া দিবে—সে আবার কি রকম কথা! কিন্তু ভোলাকে বলিবার জন্য অপেক্ষা করিতে হইল না। ঠিক সেই সময়েই ভোলা আসিতেছিল বাজার কবিয়া। দরজার কাছেই তাহার সহিত কাঙ্গালীচরণের মুখোমুখি দেখা! তাহাকে দেখিবামাত্র কাঙ্গালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, 'বলি কি হে নবাবপুত্ত্ুর, ঘরের কাজকর্ম রইলো পড়ে, আর তুই ব্যাটা গিয়েছিলি কোথায়?'

সর্বনাশ! ভোলা হয়ত মারিয়াই বসিবে! কথাটা হয়ত সে বুঝিতে পারে নাই। বলিল, 'কাকে বলছেন?'

'বলছি তোমাকেই। বলছি,—সকালে উঠে রোজ এই প্যাসেজ্‌টা জল ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে।'

'করেছি ত!'

'সে ত একবার। নাম মাত্তর এক বালতি জল ঢেলে—বাস্, হয়ে গেল? তারপর—এই যে তোমাদের কে এক বাবু এসে জুতো পায়ে দিয়ে ধুলো-কাদার মচ্ছব করে' দিয়ে গেলেন! বলি—এগুলো পরিষ্কার করবে কে? আমি করব?'

ভোলা বলিল, 'না বাবু, আপনি কেন করবেন, আমিই করব। কিন্তু যতবার লোকজন আসবে ততবারই জল ঢেলে পরিষ্কার করতে হবে নাকি?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'আলবাত করতে হবে। এতটুকু ময়লা আমার বাড়ীতে থাকতে পাবে না তা আমি এই বলে রাখছি তোকে। থাকে যদি ত জুতো পেটা করে তৎক্ষণাৎ দূর করে দেবো বাড়ী থেকে! নোংরা-টোংরা আমি ভালবাসিনে। সে তোর বাবু জানে।'

ভোলা বলিল, 'আমি ত আপনার বাড়ীতে কাজ করিনে বাবু যে, জুতো পেটা করে' দূর করে' দেবেন! যতবার বলবেন ততবার জল ঢালতে আমি পারব না। ঢালতে হয় আপনি নিজে ঢালুন।'

কথা শুনিয়া মনে হইল ভোলা রীতিমত রাগিয়াছে। রাগিবারই কথা। কথাটা বলিয়াই সম্ভবতঃ সে উপরে উঠিয়া আসিতেছিল, কাঙ্গালীচরণ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'কি বললি রে হারামজাদা পাজি ছোটলোক কোথাকার! আমি নিজে জল ঢালব? বলি ও মশাই, শুনছেন আপনার চাকরের কথা? এখনও বলছি—জল দিয়ে পরিষ্কার করবি ত কর্, নইলে—'

রাগে আর শেষ কথাটা মুখ দিয়া তাঁহার বাহির হইল না।

'পারব না।' বলিয়া উপরে উঠিয়া আসিল।

কাঙ্গালীচরণ সেইখান হইতেই চীৎকার করিতে লাগিলেন, 'বলি ও মশাই, চুপ করে রয়েছেন যে? শালা ছোটলোক চাকর আমায় অপমান করে গেল, আব আপনি শুনছেন বসে বসে? নেবে আসুন মশাই, এর একটা হেস্তনেস্ত করে দিয়ে যান! বলি—ও মশাই, কই এখনও যে এলেন না?'

মহা মুশকিলে পড়িলাম; আগাগোড়া সবই শুনিযাছি। ভোলাকেও কিছু বলা চলে না, অথচ ভোলার দিক হইয়া তাঁহাকে কিছু বলিলেও তিনি অপমান বোধ করিবেন। ডাকাডাকির চোটে বাহির হইযা আসিতে হইল। আমাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, 'শুনলেন ত লবাবপুত্তুর আপনার চাকরের জবাব? ওকে তাড়িয়ে দিন মশাই, ওকে তাড়িয়ে দিন, জুতো মেরে এক্ষুণি বিদেয় করে দিন বাড়ী থেকে।'

নিচে তাঁহার কাছে নামিয়া গেলাম; বলিলাম, 'ভাল করে' বললেই একবার কেন, দশবার জল ঢেলে পরিষ্কার করে দিত। আপনি প্রথমেই যে ওকে চটিয়ে দিলেন।'

'বটে! চাকরেরও পায়ে তেল দিতে হবে? তবে শুনুন মশাই, আমি

ভারি সাচ্চা লোক। আমার ভেতরটাও যেমন পরিষ্কার, বাইরেটাও তেমনি। নোংরা আমি ভালবাসিনে।'

বেশি ঘাঁটাঘাঁটি না করিয়া রাস্তাটা ভোলাকে পরিষ্কার করিয়া দিতে বলিলাম। এবং তাহাকে আরও বলিয়া দিলাম যে, মাঝে মাঝে বাড়ীওয়ালা যদি কিছু কাজকর্ম করিতে বলে ত সে যেন তাহা করিয়া দেয়।

বলিয়া কি বিপদ যে করিলাম তাহা পরে বুঝিয়াছি। পরদিন সকাল হইতে ভোলা আর নিঃশ্বাস ফেলিবার অবসর পায় না! আমার সংসারে যাবতীয় কাজকর্ম তাহাকে ত করিতেই হয়, তাহার উপর অতি প্রত্যূষে কাঙ্গালীচরণের ডাক শোনা যায়—'ভোলা!'

ভোলা তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইলে বলেন 'জল দিয়ে ধুয়েছিস রাস্তাটা?'

ভোলা বলে, 'ধুয়েছি।'

কাঙ্গালীচরণ বলেন, 'বেশ, বেশ এমনি করে' কথা শুনতে হয় বাবা, কথা না শুনলে ভারি রাগ ধরে। —নে, ওই গড়্গড়াটা বেশ করে' ধুয়ে মুছে নতুন করে ওতে জল ধরে নিয়ে আয়। এনে একবার তামাকটা খাইয়ে দে বাবা!'

গড়গড়ার জল ধরিয়া তামাক সাজিয়া কলিকায় আগুন দিয়া ভোলা ভাবে এই জন্যই হয়ত তিনি ডাকিয়াছিলেন, তাই সে চলিয়া আসিতে চায়, কিন্তু কাঙ্গালীচরণ অত সহজে ছাড়িবার পাত্র ন'ন। ডাকেন, 'চলে যাচ্ছিস্ কোথায় বাবা, ঘরটা দেখছিস না কিরকম নোংরা হয়ে আছে, দে বাবা ঝাঁটাটা এনে একহাত পরিষ্কার করে।'

কিন্তু ঘর পরিষ্কার করিয়াও সে নিষ্কৃতি পায় না, কাঙ্গালীচরণ বলেন, 'এইবার কুঁজোয় জল ভরে দে বাবা, মেয়েটা রান্না করছে, ওর হাত-জোড়া।'

কুঁজোয় জল ধরিয়া দিয়াও নিস্তার নাই। কালি-পড়া লণ্ঠনটা ঘরের কোণ হইতে তুলিয়া আনিয়া কাঙ্গালীচরণ বলেন, 'এঃ, এটা কি হয়েছে দেখেছিস ভোলানাথ? পলতেটা উসকে দিয়ে আয় খাটো করে, ত্যায়নি মেয়েটা। ইস্! কি হয়েছে বল্ দেখি! দে ত বাবা কাঁচটা একবার পরিষ্কার করে'।'

ভোলা কাঁচ পরিষ্কার করিয়া দিয়া 'আসি' বলিয়া একরকম লুকাইয়াই সেখান হইতে পলাইয়া আসে।

কাজের সময় ভোলাকে আর পাওয়া যায় না। যখনই ডাকি, দেখি

ভোলার পরিবর্তে কাঙ্গালীচরণ জবাব দিতেছেন, 'আরে থামুন না মশাই, সারা দিবারাত্রিই ত সে আপনার কাজ করবে, আমি এই ঘরটা একবার পরিষ্কার করিয়ে নিচ্ছি, ব্যস্—এই হয়ে গেল বলে'!

কিন্তু সেদিন এক ভারি মজার কাণ্ড ঘটিয়া গেল। কুঁজোয় জল ধরিতে গিয়া—মাটির কুঁজো, ভোলা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। আর যায় কোথা! কাঙ্গালীচরণ বলিতে লাগিলেন,—'দিলি ত ভেঙ্গে! ব্যস্। জানি আমি হারামজাদা দেবে একদিন আমার সর্বনাশ করে'! নগদ চৌদ্দটি পয়সা দাম, ও-রকম কুঁজো আর পাওয়া যাবে না। আজ যখন বাজার যাবি তখন অমনি দেখে একটা কিনে আনিস্।'

ভোলা কুঁজো কিনিয়া আনিল। কিন্তু কাঙ্গালীচরণ পয়সা আর দেন না! চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া ভোলা বলিল, 'কুঁজোর দামটা তাহ'লে—দশ পয়সা নিয়েছে।'

কাঙ্গালীচরণ তাঁহার ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। উপরের দিকে তাকাইয়া হাঁকিলেন, 'বলি ও মশাই, শুনছেন?'

বলিলাম, 'কি বলছেন, বলুন!'

বলিলেন, 'এই ব্যাটার মাইনে থেকে কুঁজোর দাম—দশটা পয়সা কেটে নেবেন ত! আমি এখন আর দাম দিলাম না, বুঝলেন? আপনার বাজারের পয়সা থেকেই নিয়েছি।'

কথাটা ভাল বুঝিতে পারিলাম না। বলিলাম—'কি বলছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

কাঙ্গালীচরণ ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন—'আপনার এই চাকর ব্যাটাচ্ছেলে কাল আমার অমন সুন্দর চোদ্দপয়সা দামের কুঁজোটা দিয়েছে ফুটিয়ে। আজ তার পরিবর্তে দশ পয়সা দিয়ে একটা কিনে এনেছে। এনে আবার ব্যাটা আমার কাছে পয়সা চায়! তাই বলছি যে, ওকে মাইনে যখন দেবেন তখন এই দশ পয়সা কেটে নেবেন! আমি মশাই গোলমাল ভালবাসিনে, ভারি সাঁচ্চা মানুষ। বুঝতে পেরেছেন?'

বলিলাম, 'পেরেছি।' ডাকিলাম, 'ভোলা।'

ভোলা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিলাম, 'ওঁর কাজ তোকে করতে বলে অন্যায় করেছিলাম ভোলা! কাল থেকে আর...'

ভোলা বলিল, 'আমি করলেই ত।'

ভোলা আর তাহার কাজ করে না। শুনিলাম, সেদিন সে তাঁহার মুখের ওপর স্পষ্ট জবাব দিয়াছে, 'না মশাই, আপনি বড় ভীষণ লোক। দরকার নেই আমার কাজ করে, আবার হয়ত কিছু ভেঙ্গে-টেঙ্গে ফেলব।'

কাঙ্গালীচরণের সে রাগটা আসিয়া পড়িল আমার উপর। নিচের একখানি ঘরে তিনি থাকেন, বাকি তুখানি ঘর দিনের বেলাতেও অন্ধকার এবং অব্যবহার্য। তাহার মধ্যে একখানি ঘর কাঙ্গালীচরণ সিন্দুকভর্তি বাসন-বাক্স প্যাঁট্‌রা এবং সংসারের খুচরা জিনিসপত্রে বোঝাই করিয়াছেন, আর একখানি ঘর সম্প্রতি এমনি পড়িয়া আছে। সে ঘরে আলো-বাতাস প্রবেশ করিবার পথ নাই বলিয়া সম্প্রতি তাহার দেওয়ালগুলি জুড়িয়া তু'তিন লাখ আরসলা সপরিবারে নিশ্চিন্ত আরামে বাস করিতেছে। কাঙ্গালীচরণ প্রায়ই আমাকে বলিত, 'আমার স্ত্রী যখন বেঁচে ছিল তখন সে এই ঘরটায় রান্না করতো মশাই! এ-ঘরে রান্না করার সুবিধে কত? কাছেই কল, কাছেই জল, জলের জন্যে এক-পা নড়তে হবে না, ওপরে রান্না করার চেয়ে অনেক সুবিধে, বুঝলেন?'

আমি চুপ করিয়াই থাকিতাম। যত সুবিধাই হোক্—যে ঘরে আলো-বাতাসের প্রবেশ পথ নাই, ঢুকিলেই যেখানে ভ্যাপ্‌সা গন্ধ পাওয়া যায়, সে-ঘরে রান্না করা আমাদের পোষাইবে না।

কিন্তু কাঙ্গালীচরণ সেদিন কি যে ভাবিলেন কে জানে, আমায় হঠাৎ বলিয়া বসিলেন, 'দেখুন, ওপরে আপনাদের রান্না করা আর চলবে না। নিচের এই ঘরটাতেই রঁাধতে হবে।'

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেন?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'প্রথমে অতটা বুঝতে পারিনি মশাই, তাই আপনাকে ওপরে রঁাধবার 'পারমিশান্' দিয়ে ফেলেছি। কিন্তু এখন দেখছি কয়লার ধোঁয়ায় আমার ওপরের ঘরের রং-টং বোধহয় গেল।'

বলিলাম, 'আজ্ঞে না, রং-এর মধ্যে ত দেওয়ালের চুন, তা এখনও বেশ ভালই আছে। তাছাড়া তোলা উনোনে রান্না, উনোন আমার অনেক তফাতে ধরানো হয়।'

কাঙ্গালীচরণ বলিয়া উঠিলেন, 'চুন কি রকম মশাই, চুন কি রকম? ওতে শুধু চুন নেই, আরও অনেক কিছু মেশাতে হয়েছে, আমি নিজের হাতে মিশিয়েছি মশাই, নিজে লাগিয়েছি দেওয়ালে। দেওয়ালের দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকবেন, দেখবেন—মনে হবে যেন আকাশের পানে চেয়ে আছেন। যাক্, কয়লার ধোঁয়ায় সে রং আমার নষ্ট হ'তে দেবো না। আপনারা এই নিচের ঘরে রাঁধবেন কাল থেকে!'

বলিলাম, 'তা যদি হয়, তাহ'লে এ-বাড়ী আমায় ছেড়ে দিতে হবে।'

কাঙ্গালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেড়ে দিয়ে যাবেন কোথায়?'

'কলকাতা শহরে বাড়ীর অভাব?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'বাড়ীর অভাব নেই, কিন্তু এ রকম বাড়ী আপনি পাবেন না, তা আমি হাঁক মেরে বলে দিতে পারি। তাছাড়া সস্তা কত মশাই! পঁয়ত্রিশ টাকা দিচ্ছেন ওপরের তিনখানা ঘরের জন্যে, আর নিচের ওই ঘরখানার জন্যে দেবেন পাঁচটা টাকা, ব্যস্—চল্লিশ টাকা। চল্লিশ টাকায় এমন সুন্দর বাড়ী—ড্যাম্ চিপ্।'

যাই হোক আরও পাঁচ টাকা ভাড়া বাড়াইয়া আমাদের নিচের ওই অন্ধকার ঘরে রান্না করাইবার জন্য কাঙ্গালীচরণ হয়ত জীবন আবার দুর্বহ করিয়া তুলিতেন, কিন্তু সেদিন রাত্রে হঠাৎ এক অঘটন ঘটিয়া গেল।

রাত্রি তখন প্রায় একটা বাজিয়াছে। আহারাদির পর আমরা শয়ন করিয়াছি। নিচে কাঙ্গালীচরণেরও কোনও সাড়াশব্দ নাই। কেরোসিন তেল পুড়িবার ভয়ে আলো তাহাদের বেশিক্ষণ জ্বলে না। সন্ধ্যার পরেই আহারাদি শেষ করিয়া আলো নিবাইয়া দেয়। সেদিন ঠিক সেই সময় কৃষ্ণা আমাদের দরজায় আসিয়া ডাকিল, 'বৌদি!'

বৌদিদি তাহার জাগিয়াই ছিল। তৎক্ষণাৎ দরজা খুলিয়া কৃষ্ণার কাছে গিয়া যে সংবাদ লইয়া আসিল, শুনিয়া আমিও একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিলাম। কাঙ্গালীচরণের বুক ধড়ফড় করিতেছে, সর্বাঙ্গে প্রচুর ঘাম হইতেছে, ভয় পাইয়া কৃষ্ণা তাই আমাকে খবর দিতে আসিয়াছে। কৃষ্ণার পিছু-পিছু নিচে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, সত্যই তাই। কাঙ্গালীচরণের গলার আওয়াজ অত্যন্ত ক্ষীণ। বলিলেন, 'আপনার কাছে হোমিওপ্যাথী ওষুধ আছে, না? দিন ত' আমাকে একটুখানি। দেখি—সারে কিনা!'

ঔষধ দিলাম। এবং তাহারই ফলে সারিল কিনা জানি না, সকালে দেখিলাম, দিব্য সহজ মানুষের মত কাঙ্গালীচরণ ঘুরিয়া-ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কেমন আছেন ? সেরে গেছে ত ?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'কোথায় মশাই ! হোমিওপ্যাথী ওষুধে আবার রোগ সারে ! শুনুন তবে। এই বাড়ীখানা এক ভদ্রলোক ভাড়া চাইলেন, সত্তর টাকায়—ওপর নিচে সমস্ত ঘর। আমার স্ত্রী তখন বেঁচে। দিলাম বাড়ীখানা ভাড়ায় বসিয়ে, আর আমরা নিজেরা উঠে গেলাম এই কাছাকাছি একটি গলির মধ্যে একখানা বাড়ীতে। কলকাতায় তখন খুব কলেরা হচ্ছে। হঠাৎ একদিন রাত্তিরবেলা স্ত্রীর কলেরা হ'লো, ঘণ্টাখানেক পরে আবার হ'লো আমার ছেলের। ছেলেটি ছিল কৃষ্ণার চেয়ে বছর-দুই-এর বড়। সকালবেলা একজন হোমিওপ্যাথী ডাক্তার ডাকলাম। এত এত ওষুধ দিলেন, এত চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুতেই কিছু হ'লো না—উঠো-উঠি ঘণ্টাখানেকের মধ্যে দুজনেই গেল মরে'। এই ত' আপনাদের হোমিওপ্যাথী ওষুধ মশাই !'

কৃষ্ণা কাছেই দাঁড়াইয়াছিল। এবার আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল, 'দশটাকা ভাড়া দিয়ে যে-রকম নোংরা বাড়ীতে আমরা উঠে গিয়েছিলাম, সে বাড়ী থেকে আমরা দু'জনও যে ফিরে আসতে পেরেছি বাবা এই যথেষ্ট। আর তাছাড়া আমাদের যতীনদাদা আবার ডাক্তার! বই পড়ে পড়ে বাড়ীতেই ডাক্তারী শিখেছে। ওই অতবড় রোগীর ভার তুমি দিলে তারই হাতে ফেলে ! কেন যতীনদাদা ত' তোমাকে অন্য ডাক্তার আনতে বলেছিল বাবা। তুমি বললে, টাকা কোথায় পাব। তা তুমি একটু চেষ্টা করলে, মা আমার মরতো না।'

বলিতে বলিতে মেয়েটার ঠোঁট দুইটি থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং চোখ দুইটি জলে ভরিয়া আসিতেই সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল।

কাঙ্গালীচরণ প্রচণ্ড এক ধমক দিয়া উঠিলেন, 'যা যা, তুই কি জানিস্! তুই চুপ কর্! মৃত্যু যার আছে হাজার বড় ডাক্তার ডাকলেও তাকে রক্ষা করা যায় না,—না কি বলেন মশাই।'

বলিয়া তিনি আমার মুখের পানে তাকাইলেন।

কোনও জবাব না দিয়াই আমি আমার কাজে চলিয়া যাইতেছিলাম,

কাঙ্গালীচরণ হাঁকিয়া বলিলেন, 'বলি ও মশাই, চলে যাচ্ছেন যে? আমি যা বলেছিলাম তার কি হ'লো? হ্যাঃ, ভারি ত' পাঁচটা টাকা! পঁয়ত্রিশ দিচ্ছেন, না হয় দেবেন চল্লিশ। নিচে রান্নার সুবিধে কত!'

বলিলাম, 'আচ্ছা এরপর ভেবে দেখব।'

'না না ভেবে দেখব নয়, ও করে ফেলুন। টাকার কথা ভেবে আর পিছিয়ে যাবেন না। টাকা জিনিস—আসতেও যতক্ষণ আবার যেতেও ততক্ষণ! আমি ত' মশাই নিজের সুখ-সুবিধের চেয়ে টাকা জিনিসটাকে বড় করে' কখনও দেখতে পারলাম না। এই দেখুন না আপনি মাসে মাসে পঁয়ত্রিশটি করে টাকা দিচ্ছেন, ব্যস্, হাতে আসতে না আসতে ফুট-কড়াই! টাকা জিনিসটে আমার হাতে কখনও রইলো না, ও ব্যাটার জাত কারও হাতেই থাকে না। বুঝলেন, নিচে রাঁধবার ব্যবস্থাটাই করে ফেলুন।'

কৃষ্ণার বয়স হইয়াছে, সর্বদেহে তাহার পরিপূর্ণ যৌবনশ্রী। এইবার বিবাহ দেওয়া তাহার একান্ত প্রয়োজন। আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন সেই কথাই হইতেছিল। স্ত্রী বলিল, 'ওর বাবাকে একদিন বোলো। মেয়েটাকে সত্যিই আর এমন করে রাখা উচিত নয়।'

বলিব বলিব ভাবিতেছিলাম, এমন দিনে দেখিলাম, একজন ঘটক একদিন জন-দুই ভদ্রলোককে ডাকিয়া আনিয়াছেন।

কাঙ্গালীচরণ ডাকিলেন, 'বলি ও মশাই, একবার নিচে নেমে আসুন ত'!

নিচে যাইতেই তিনি আমায় একটুখানি আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিলেন, 'ঘন ঘন যে-রকম অসুখ-বিসুখ হচ্ছে মশাই, কি জানি বিশ্বাস নেই যদি কোনোদিন হট্ করে'…তাই ভাবছি, মেয়েটার বিয়েটা এইবার সেরে ফেলি। দুজন ভদ্রলোক এসেছেন ওকে দেখতে, আপনি একটুখানি আসুন, দু'চারটে কথাবার্তা বলুন ওদের সঙ্গে, আর আমার অবস্থার কথাটাও অমনি…'

যাক্, এতদিন পরে সুমতি তাঁহার হইয়াছে। দেখিলাম, যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন বরের কাকা আর একজন বাবা। ছেলেটি বি-এ পাশ করিয়া এম-এ পড়িতেছে, অবস্থা খুব যে ভালো তা নয়,

কলিকাতা শহরে একখানি বাড়ী আছে, তাছাড়া ছেলেটির দাদা নাকি ওকালতি পাস করিয়া সম্প্রতি উকিল হইয়াছেন। পসার এখনও জমাইতে পারেন নাই, তবে ভগবানের ইচ্ছায় ভবিষ্যতে যদি কোনোদিন জমে ত' তখন আর তাহাদের ভাবিতে হইবে না।

মন্দ কি। ছেলেটি যদি দেখিতে শুনিতে ভাল হয় ত' কৃষ্ণার বিবাহ এইখানেই দেওয়া উচিত।

কৃষ্ণাকে তাঁহারা দেখিলেন। দেখিয়া অপছন্দ করিবার কিছুই নাই। চমৎকার মেয়ে!

কিন্তু গোলমাল বাধিল টাকার ব্যাপারে। বরের বাবা বলেন, 'মেয়ে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, ছেলের সঙ্গে মানাবেও ভাল, কিন্তু ছেলের বিয়ে—বাড়ী থেকে টাকা খরচ করে ত আর দিতে পারি না মশাই। নগদ টাকা আপনাকে কিছু দিতে হবে বই-কি!'

কাঙ্গালীচরণ আমার মুখের পানে নিতান্ত অসহায়ের মত একবার তাকাইলেন। তাকাইবার অর্থটা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। বলিলাম, 'কত টাকা চান?'

বরকর্তা বলিলেন, 'মেয়ের মা'র যা গয়না আছে শুনছি তাই দিলেই না-হয় গয়নাটা আর লাগবে না, কিন্তু টাকা—তা অন্ততঃ শ-পাঁচেক দিতে হবে নগদ। তার কমে মশাই ছেলের বিয়ে দিতে আমি পারব না।'

কাঙ্গালীচরণ ম্লান একটুখানি হাসিলেন; বলিলেন, 'সে ক্ষমতা কি আমার আছে দাদা? বড় জোর শ'খানেক টাকা আমি ধার-ধোর করে' যেখান থেকে হোক্…মেয়ের দায় যখন ঘাড়ের ওপর, এই আপনার দুটি হাতে ধরে বলছি ভাই আমায় উদ্ধার করুন!'

বলিয়া কাঙ্গালীচরণ দুই হাত বাড়াইয়া বরকর্তার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিলেন।

বরকর্তা লোকটি ভাল। কাঙ্গালীচরণের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়া হইল। কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, আপনি এত করে বলছেন যখন, তখন তিন শ' টাকা দেবেন। বৌ-ভাতে আমি নিজেও না হয় কিছু খরচ করব।'

মাত্র তিনশ' টাকা খরচ করিয়া কাঙ্গালীচরণ যদি তাঁহার মেয়ের জন্য এমন

বর পান ত' মন্দ কি! বলিলাম, 'আচ্ছা বেশ, কবে আমরা ছেলেটি তাহ'লে দেখতে যাব বলুন!'

ছেলের বাবা বলিলেন, 'যেদিন খুশি। এই ত' ভবানীপুরে বাড়ী—বেশি দূরে ত' নয়।'

স্থির হইল, আগামী রবিবার কাঙ্গালীচরণকে সঙ্গে লইয়া আমি নিজেই ছেলেটিকে দেখিয়া আসিব।

কৃষ্ণাকে বলিলাম, 'কিরে! মুখখানি অমন শুকনো করে' দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন দিদি, তোর বর দেখতে যাব। বিয়ে-থা হ'লে আমাদের ভুলে যাবিনে ত'!'

কৃষ্ণা তার সেই চোখ দুইটি তুলিয়া সেই তেমনি করিয়াই একবার হাসিল। বড় সুন্দর সে হাসি। অত্যন্ত করুণ, অথচ একবার সে হাসি যে দেখিয়াছে সে আর তাহাকে জীবনে ভুলিবে না।

রবিবার বৈকালে ভবানীপুরে যাইবার কথা। কিন্তু সকালে কাঙ্গালীচরণ আমায় কাছে ডাকিয়া চুপি-চুপি বলিলেন, 'যাক, আর সেখানে যেয়ে কাজ নেই মশাই।'

বলিলাম, 'কেন?'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'না। তিনশ' টাকা নগদ দেওয়া আমার দ্বারা সম্ভব হবে না মশাই। কোথায় পাব? বড় জোর একশ', নাহয় দেড়শ' পর্যন্ত দিতে পারি।'

আমার নিজের টাকা থাকিলে হয়ত' তখন নিজেই দিতাম, কিন্তু সেদিক দিয়া দুর্ভাগ্য আমারও কম নয়। বড় দুঃখ হইল। বলিলাম, 'তাহ'লে আর কি হবে বলুন! কিন্তু মেয়েও ত' বড় হয়েছে, বিয়েরও ত' একটা চেষ্টা করা দরকার।'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'দেখি।'

তাহার পর দশ পনেরো দিনের মধ্যে ঘটক-ঠাকুর বোধ হয় আরও পাঁচজন বরকর্তাকে আনিয়া হাজির করিল। কিন্তু সকলেরই সেই এক প্রস্তাব। টাকা! এদিকে কাঙ্গালীচরণেরও সেই এক কথা—একশ' কি বড় জোর দেড়শ' দাদা, তার বেশি আমি পাব কোথায়…গরীব মানুষ…ইত্যাদি।

বেচারা হয়ত দেড়শ' টাকা অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাকেই বা দোষ দিই কেমন করিয়া!

শেষে কোথাও যখন কিছু আর হয় না, কাঙ্গালীচরণ নিজেই একদিন সন্ধ্যার সময় হাসিতে হাসিতে ঘরে ঢুকিয়া ডাকিলেন, 'ও মশাই, শুনুন, শুনুন। সুসংবাদ!'

কি সুসংবাদ জানিবার জন্য নিচে আসিয়াই শুনিলাম এতদিন পরে কৃষ্ণার বিবাহের সমস্ত বন্দোবস্ত তিনি নিজেই স্থির করিয়া আসিয়াছেন, বলিলেন, 'আরে মশাই, পরের দ্বারা কি কোনো কাজ কখনও হয়? ওকি ঘটকের কর্ম!'

এই বলিয়া কিয়ৎক্ষণ থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, 'চলুন একদিন—'

বলিয়াই কি ভাবিয়া কথাটা পাল্‌টাইয়া লইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন,—'বড় লোকের খাঁই মেটাবার সাধ্যি কি আমার আছে মশাই, আমরা নিজেরা যেমন, তেমনি মাঝামাঝি ঘরে মেয়ের বিয়ে দেওয়াই ভাল—আপনি কি বলেন?…যা করেন জগদম্বা! এই মাসেই সেরে ফেলি। শুভস্য শীঘ্রং।'

বলিলাম, 'চলুন তা'হলে একদিন দেখে আসি।'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'কিছু দেখতে হবে না মশাই! কিছু দেখতে হবে না। অবস্থা, ভাল কিনা তাই লোকে দেখতে যায়, কিন্তু এ একেবারে জানা কথা। অবস্থা ভাল নয়। মাইনর ইস্কুলের পণ্ডিত, কোনো রকমে দিন চলে' যাবে—ব্যস্! মেয়েটা খেতে পরতে পাবে। আর কি চাই?'

ইহার উপর আর কথা চলে না। নিজের কন্যার বিবাহ নিজে স্থির করিয়াছেন, ভাল-মন্দ তিনিই বুঝিবেন।

এই বাড়ীতেই বিবাহ, অথচ এখানে জায়গার একান্ত অভাব। সে-সম্বন্ধে কি করিতে হইবে জিজ্ঞাসা করায় কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'কি আর করব? কিছুই করব না।'

বলিলাম, 'বরযাত্রীদের খাবার জায়গা ত' একটা করতে হবে। ছাদের ওপর হোগলা দিয়ে—সবাই যেমন করে—'

কাঙ্গালীচরণ ঈষৎ হাসিলেন। বলিলেন, 'পাগল হয়েছেন? সে কি আর আমি ঠিক না করেই এসেছি! বরযাত্রী আসবে চার জন। হোগলা কি

জন্য? বেশি বরযাত্রী খেতে দেবার অবস্থা কোথায়? আপনার ওপরের একখানা ঘর ছেড়ে দেবেন, ব্যস—তাহ'লেই হবে!'

একখানা কেন, কৃষ্ণার বিবাহের জন্য আমি কয়েকদিনের জন্য এ বাড়ী ছাড়িয়া যেখানে হোক চলিয়া যাইতেও রাজি। কিন্তু কিছুই করিতে হইল না। বরপক্ষ মেয়েও দেখিতে আসিলেন না, কন্যাপক্ষ বর দেখিতেও গেলেন না, বিবাহের আগের দিন কৃষ্ণার গায়ে-হলুদের সমস্ত ব্যবস্থা আমার স্ত্রী-ই করিয়া দিল।

পরদিন সন্ধ্যায় বর আসিল—বরের সঙ্গে মাত্র চারজন বরযাত্রী। বর দেখিয়া প্রথমে তাহাকে কৃষ্ণার বর বলিয়া চিনিতে পারি নাই, ভাবিয়াছিলাম—সেও একজন বরযাত্রীই হইবে বা। কিন্তু শেষে যখন তাহার ধুতি-চাদর এবং কপালে চন্দনের ফোঁটা দেখিলাম, তখন একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। এই কৃষ্ণার বর! গায়ের রং কালো, চক্ষু দুইটি কোটর-প্রবিষ্ট, শীর্ণ কঙ্কালসার, বয়স বোধকরি কাঙ্গালীচরণের চেয়ে দু'চার বছরের ছোট।

আমার স্ত্রী ছি-ছি করিতে লাগিল। আমি ত' কৃষ্ণার মুখের পানে তাকাইতে পারিলাম না। শুধু নির্বিকার রহিলেন দেখিলাম—কাঙ্গালীচরণ।

কাঙ্গালীচরণকে একবার আড়ালে পাইয়া চুপি-চুপি বলিলাম, 'এ কি করলেন আপনি—ছিঃ!'

কাঙ্গালীচরণ আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিলেন, 'কেন? কি আর এমন হয়েছে শুনি? আচ্ছা ধরুন, আমার স্ত্রী-বিয়োগ হয়েছে, আমিই যদি বিবাহ করতুম, তাহ'লে—পুরুষ মানুষের আবার বয়েস, পুরুষ মানুষের আবার চেহারা!'

মুখ বুজিয়া সেখান হইতে সরিয়া গেলাম।

এখন আর দুঃখ করিয়াই বা লাভ কি!

যাই হোক নির্বিঘ্নে বিবাহ চুকিয়া গেল। কৃষ্ণার অদৃষ্ট।

আট-দশ জন লোকের আহারের ব্যবস্থা আমার স্ত্রী নিজেই করিয়াছিলেন। বরযাত্রী কয়েক জনকে খাইতে বসাইয়া আমিই পরিবেশন করিতেছি, কাঙ্গালীচরণের উপবাসী শরীর, দূরে দাঁড়াইয়া তিনি তাঁহাদের খাওয়া দেখিতেছেন। খাওয়া যখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘরের ভিতর সন্দেশ আনিতে গিয়া দেখি—সন্দেশ নাই। সন্দেশ আনাইবার কথা কাঙ্গালীচরণকে

সন্ধ্যার পূর্বেই বলা হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'সন্দেশ কি এখনও আনানো হয়নি ?'

কাঙ্গালীচরণ ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'না।'

'সে কি মশাই ? ভোলাকে দিয়ে এক্ষুণি আনাতে পাঠান।'

কাঙ্গালীচরণ কোঁচড় হইতে অতি কষ্টে একটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

ব্যাপারটা বরযাত্রীদের দৃষ্টি এড়াইল না। তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, 'একশ' টাকা ত' নগদ নিয়েছেন মশাই, তাও মিষ্টি আনতে ভুলে গেলেন! আমরা লোক ত' মোটে চারজন!'

আর একজন বলিয়া উঠিলেন, 'একশ' কি রকম, শেষ পর্যন্ত দেড়শ' টাকার রফা হ'লো যে! সেদিন একশ' এনেছেন, আর আজ দিতে হবে পঞ্চাশ।'

এরকম যে কোনোদিন হইতে পারে তাহা জানিতাম না। কথাটা শুনিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। টাকা লইয়া কৃষ্ণাকে ওই বুড়ার হাতে বিক্রি করা হইয়াছে! কাঙ্গালীচরণের পক্ষে ইহার চেয়ে নৃশংসতা আর কি হইতে পারে!

বিবাহের সময় দেখিলাম, কৃষ্ণার মুখে যেন আর রক্ত নাই, স্থির, ধীর, নির্বিকার,—যাহা বলিতেছে তাহাই করিতেছে; যেন কোথাও কিছুই হয় নাই এমনি ভাব।

পরদিন স্বামীর সঙ্গে সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল। শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় মেয়েরা কান্নাকাটি করে, এতদিনের প্রিয় পিত্রালয় ছাড়িয়া যাইতে কষ্ট হয়, কিন্তু কৃষ্ণাকে দেখিলাম, চোখে তাহার একফোঁটা জলও আসিল না, কেমন যেন বোকার মত ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাহার বাবার মুখের পানে তাকাইয়া—হেঁটমুখে গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমার স্ত্রী বারান্দার রেলিং ধরিয়া তাহার চলিয়া যাওয়া দেখিতেছিল, উপরে উঠিয়া গিয়া দেখিলাম, জানালার কাছে দাঁড়াইয়া সে তাহার চোখের জল মুছিতেছে। আমাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করা সে প্রয়োজন বোধ করিল না। আমি ঘরে ঢুকিতেই সে ধীরে-ধীরে বাহির হইয়া গেল। সমস্ত বাড়ীখানা কেমন যেন একটা বিষণ্ণ গাম্ভীর্যে থম্-থম্ করিতে লাগিল।

কৃষ্ণা চলিয়া যাইবার পর হইতে কাঙ্গালীচরণ আমার এখানেই খাইতে-ছিলেন। প্রস্তাব করিয়াছিলেন, নিজেই রান্না করিয়া খাইবেন, কিন্তু আমিই তাহাতে বাধা দিলাম। ভাবিলাম, এখন ত' আর কন্যাদায় নাই, মাসের শেষে বাড়ীর ভাড়া হইতে কিছু টাকা ইহার জন্য কাটিয়া লইলেই চলিবে।

কিন্তু মাসের শেষে ভাড়া দিতে গিয়া একেবারে বেকুব বনিয়া গেলাম। টাকা ত' তিনি খাওয়ার জন্য দিলেনই না, উল্‌টা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন, 'এবার ত' হাঙ্গামা কমেছে মশাই, এবার আমার সেই কথাটা—'

কথাটার অর্থ বুঝিতে পারি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি কথা ?'

তিনি বলিলেন, 'মনে নাই ? আপনাদের সেই নিচে রাঁধবার কথা !'

বলিলাম, 'সে ত বলেই দিয়েছি—নিচে রান্না করা আমার হবে না !'

কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'আপনি কিন্তু ভাল বুঝছেন না মশাই ! পাঁচটা টাকার জন্যে এরকম কৃপণতা করবেন না, এতে আপনার স্ত্রীর কষ্ট হচ্ছে—আমি বুঝতে পারছি যে !'

কাঙ্গালীচরণ আমার স্ত্রীর এত কষ্ট বুঝিলেন কিন্তু তাঁহার কষ্ট আমার স্ত্রী কিছুতেই বুঝিল না। বলিল, 'না না ওকে ভাত রেঁধে খাওয়াতে আমি পারব না। এতদিন শুনিনি, কিন্তু যেদিন থেকে তুমি বলেছ, দেড়শ' টাকা নিয়ে কৃষ্ণার মত মেয়েকেও ওই বুড়োর হাতে তুলে দিয়েছে সেইদিন থেকে ওর ওপর ভক্তি আমার চটে গেছে। লোকটা চামারের একশেষ।'

সুতরাং কাঙ্গালীচরণকে আজকাল নিজেই রান্না করিয়া খাইতে হয়। ষ্টোভ্ জ্বালিয়া কি যে রান্না করেন তিনিই জানেন। সাবান দিয়া ধুপ্-ধুপ্ করিয়া কাপড় কাচেন, ইস্তিরি করেন, ঘর ঝাঁট দেন এবং প্রতিদিন বৈকালে নিজের হাতে কাচা জামা-কাপড় পরিয়া একটি ছড়ি হাতে লইয়া বেড়াইতে বাহির হন। সে-সময় আমার সঙ্গে যদি কোনোদিন দৈবাৎ দেখা হইয়া যায় ত' নিজের কাপড়-জামা দেখাইয়া বলেন, 'দেখুন মশাই, আমার নিজের হাতে কাচা, আর ওই ত আপনার গায়ে রয়েছে ধোপা-বাড়ীর কাচা,—কত তফাৎ দেখুন ! আমি যা কেচে দেবো, সেরকম কাচতে ধোপার বাবাও পারবে না।'

কাঙ্গালীচরণ ওই আনন্দেই থাকেন। কৃষ্ণার কথা কোনোদিন তাঁহাকে ভুলিয়াও বলিতে শুনি না।

আমরা স্বামী-স্ত্রীতে বরং বলাবলি করি—'আহা মেয়েটির আচ্ছা অদৃষ্ট যা-হোক্। এমন অনেক গরীবের মেয়েও ত' দেখেছি যারা মনের মত স্বামী পায়। কিন্তু এ মেয়েটার কি হ'লো বল দেখি ?'

গৃহিণী বলেন, 'শ্বশুরবাড়ী ত' ভবানীপুরে, বুড়োর কাছে ঠিকানা নিয়ে চল না একদিন কালীঘাট যাবার নাম করে' কৃষ্ণাকে দেখে আসি।'

যাইতে ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু যাওয়া কোনোদিন হইয়া ওঠে না।

বিবাহের পর সেই যে কৃষ্ণা এখান হইতে স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছে, তাহার পর আজ প্রায় পাঁচ ছ'মাস হইতে চলিল, একটি দিনের জন্যও সে আর এখানে আসে নাই।

বুড়া স্বামী তাহার ইস্কুলের পণ্ডিত। সকালে খাইয়া তাহাকে ইস্কুলে যাইতে হয়, কৃষ্ণা ভাত রাঁধে, স্বামীকে খাওয়াইয়া ইস্কুলে পাঠাইয়া দেয়, তাহার পর সারাদিন হয় ত' একলা ঘরে বসিয়া বসিয়া কাঁদে। পণ্ডিতমশাই-এর প্রথম-পক্ষের স্ত্রীর একটি মেয়ে আছে শুনিয়াছি। মেয়েটি বয়সে কৃষ্ণার চেয়েও বড়। তাহার দু'তিনটি ছেলেমেয়ে। সেই হয়ত' বাপের জন্য রান্না-বান্না সবই করিয়া দিত, আজকাল হয় ত' সৎমার হাতে সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম ছাড়িয়া দিয়াছে। হয়ত' সে সুযোগ-সুবিধা পাইলেই কৃষ্ণার সঙ্গে ঝগড়া করে। কৃষ্ণার হয়ত' দুঃখ-কষ্টের আর অবধি নাই!

মনে-মনেই এই সব কথা ভাবি আর সেই নিরীহ শান্ত মেয়েটির কথা মনে পড়ে। কাঙ্গালীচরণের মেয়ে বলিয়া তাহাকে মনে হয় না। মনে হয় সে যেন আমার নিজের বোন। নিতান্ত অনাত্মীয়া অপরিচিতা ওই মেয়েটির জন্য কষ্ট হয়।

অদৃষ্ট তাহার মন্দ তাহা জানি, কিন্তু এত মন্দ সেকথা কোনদিন ভাবিতেও পারি নাই। বুড়া স্বামী যে তাহার বেশিদিন বাঁচিবে না, কৃষ্ণার বিবাহ হওয়া না হওয়া দুই-ই সমান হইয়া যাইবে, সে আশঙ্কা যে মনে-মনে করিতাম না তাহা নয়, তবে হঠাৎ যে এমন একটি অঘটন ঘটিবে তাহা ছিল আমাদের ধারণারও অতীত।

সেদিন বৈকালে ভবানীপুর হইতে একটি ছোকরা একরকম ছুটিতে ছুটিতে

কাঙ্গালীচরণের কাছে আসিয়া উপস্থিত। কাঙ্গালীচরণ গড়গড়ায় তামাক টানিতেছিলেন আর আমি কোথায় যেন বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম।

ছোকরাটি বলিল, 'শিগ্‌গির আসুন!'

ব্যাপার কি জানিবার জন্য তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলাম। যাহা শুনিলাম তাহাতে আমার আপাদ-মস্তক শিহরিয়া উঠিল, বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। শুনিলাম, ইস্কুলের ছুটির পর কৃষ্ণার স্বামী বাড়ী ফিরিতেছিলেন, রাস্তা পার হইতে গিয়া হঠাৎ একটা মোটর চাপা পড়িয়াছেন। বাঁচেন কিনা সন্দেহ।

পা দুইটা তখন আমার থর্‌-থর্‌ করিয়া কাঁপিতেছে। কাঙ্গালীচরণের হাত হইতে গড়গড়ার নল মাটিতে পড়িয়া গেছে। বলিলাম, 'চলুন।'

কাঙ্গালীচরণও কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

'কোথায় আছেন?'

ছেলেটি বলিল, 'হাসপাতালে।'

হাসপাতালে যখন আমরা গিয়া পৌঁছিলাম তখন সব শেষ হইয়া গেছে। আপাদমস্তক কাঁচা রক্তে ছোপানো একটা কাপড় দিয়া ঢাকা কৃষ্ণার স্বামীর মৃতদেহ। পাশেই একটি মেয়ে মাথার চুল খুলিয়া, বুক চাপড়াইয়া মাথা ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া লোক জড়ো করিয়াছে। এইটিই বোধহয় পণ্ডিত-মশাই-এর ও-পক্ষের মেয়ে। আর সেই অতগুলো লোকের মাঝখানে স্বামীর মৃতদেহের পার্শ্বে একেবারে কাঠ হইয়া, নতনেত্রে বসিয়া আছে আমাদের কৃষ্ণা। মুখে কথা নাই, চোখ দুইটি শুধু কানায়-কানায় জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। আমাদের পানে একবার মুখ তুলিয়া তাকাইয়াই তৎক্ষণাৎ সে আবার চোখ দুইটি নামাইয়া লইল। দেখিলাম, টস্‌ টস্‌ করিয়া অশ্রুর ফোঁটা তাহার কাপড়ের উপর গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

মৃতদেহের সৎকার করিয়া কৃষ্ণাকে বিধবার বেশ পরাইয়া, বাসায় ফিরিলাম পরদিন সকালে।

কাঙ্গালীচরণ প্রত্যহ আনাগোনা করিতে লাগিলেন। কৃষ্ণার স্বামীর শ্রাদ্ধাদি চুকিয়া গেল। ভাবিয়াছিলাম, কৃষ্ণা এইবার হয়ত আবার তাহার বাবার কাছেই আসিয়া বাস করিবে, আবার সেই আগেকার মত সুখে-দুঃখে

দিন তাহাদের চলিয়া যাইবে। কিন্তু সেদিন আমি কাঙ্গালীচরণের সঙ্গেই ছিলাম; কাঙ্গালীচরণ বলিলেন, 'চল্ কৃষ্ণা, তোকে আমি সঙ্গে করেই নিয়ে যাই।'

শুনিলাম, স্পষ্ট রূঢ়বাক্যে ঘাড় নাড়িয়া কৃষ্ণা জবাব দিল, 'না।'

'যাবি না ?'

'না।'

কাঙ্গালীচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তাহ'লে কি এইখানেই থাকবি ভেবেছিস ?'

কৃষ্ণা বলিল, 'হ্যাঁ। এইখানেই থাকব।'

এই বলিয়াই সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল।

কাঙ্গালীচরণ নিতান্ত নিরুপায়ের মত আমার দিকে একবার তাকাইলেন। অর্থাৎ—আপনি একবার অনুরোধ করুন মশাই।

কিন্তু কৃষ্ণার মুখের পানে তখন আমার আর তাকাইবার ক্ষমতা নাই। মেয়েটা যদি রাগ করিয়াই কাঙ্গালীচরণের সমস্ত সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া থাকে ত' তাহাকেই-বা কি বলিবার আছে! তাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই সে করুক।

আমি সরিয়া দাঁড়াইলাম।

বাড়ী ফিরিবার সময় সারা রাস্তা ধরিয়া কাঙ্গালীচরণ একটি কথাও বলিল না। যে কাঙ্গালীচরণ এত বেশি কথা কয়, তাহাকেই দেখিলাম নীরবে মুখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতেছে। নিজের কৃতকর্মের জন্য এতদিন পরে অনুশোচনা জাগিয়াছে কিনা তাই-বা কে বলিতে পারে!

আমার স্ত্রীর সঙ্গে সেদিন কথা হইতেছিল।—'কৃষ্ণা বোধহয় রাগ করে এলো না। তুমি কি বল ?'

স্ত্রী বলিল, 'বেশ করেছে। আমার যদি ও-রকম বাবা হ'তো ত' আমি তার মুখ দেখতাম না।'

আমি বলিলাম, 'আহা বাবার কি দোষ! সেও ত' গরীব! পয়সা কড়ি থাকলে হয়ত' মেয়েটাকে সে অমন করে' জলে ফেলে দিত না।'

স্ত্রী চুপ করিয়া রহিল।

'কি ভাবছ ?'

'ভাবছি, বিয়ে ওর না দিলেই হতো।'

'তাই বা কেমন করে' হয় বল। মেয়ে ত' বড় হয়েছিল !'

'হ'লই বা। একেও কি তুমি বিয়ে বল নাকি ? বিয়ের নামে এ ত' অত্যাচার। এ অত্যাচারের চেয়ে মেয়েটাকে আইবুড়ো করে' রাখাও ঢের ভাল ছিল।'

বলিয়াই সে আমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আর কোনদিন কোন কথাই তাহাকে বলি নাই। কৃষ্ণার কথা উঠিলে আমার স্ত্রী তাহা শুনিতে চায় না। বলে, 'চুপ কর।'

চুপ করিয়াই ছিলাম। ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকিতাম, আবার প্রয়োজন হইলে নিঃশব্দে বাহির হইয়া যাইতাম। কাঙ্গালীচরণ কি করিতেছেন না করিতেছেন কোনও সংবাদই লইতে পারি নাই।

সেদিন অমনি বাড়ী হইতে বাহির হইতেছি, কাঙ্গালীচরণের ঘরের ভিতর কেমন যেন বিশ্রী একটা গোঙানির শব্দ পাইলাম। তাকাতেই দেখি—বিছানার ওপর শুইয়া শুইয়া তিনি ছটফট করিতেছেন।

ঘরে ঢুকিয়া তাঁহার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই তিনি আমার মুখের পানে কেমন যেন বিকারগ্রস্ত রোগীর মত একবার তাকাইলেন। তারপর অতিকষ্টে হাতের ইশারা করিয়া বলিলেন, 'বসুন !'

বিছানার একপাশেই বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হয়েছে ?'

'জ—র।'

'কখন থেকে ?'

'আজ তিন দিন।'

দেখিলাম, এ অবস্থায় একাকী এরকমভাবে তাঁহাকে ফেলিয়া রাখা অন্যায়। সেবা-শুশ্রূষার প্রয়োজন। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কৃষ্ণাকে নিয়ে আসব ?'

কাঙ্গালীচরণ ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া আবার আমার মুখের পানে তাকাইলেন। দেখিলাম, ঠোঁট তাঁহার থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন, 'আসবে ?'

বলিলাম, 'দেখি চেষ্টা করে, যদি আসে।'

আর কিছু তিনি বলিতে পারিলেন না। চোখ বুজিয়া চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিলেন।

গায়ের উত্তাপ দেখিলাম, অত্যন্ত বেশি। চোখ দুইটি লাল। ডাক্তার ডাকিবার একান্ত প্রয়োজন ভাবিয়া তৎক্ষণাৎ একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিলাম।

ডাক্তার দেখিয়াই কাঙ্গালীচরণ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'ডাক্তার? কি জন্যে ডাকলেন বলুন ত? আমার কি আর ডাক্তার দেখাবার পয়সা আছে? আচ্ছা দিন আপনি, তারপর সেরে উঠে না হয় ভাড়া থেকে বাদ দিয়ে দেবো।'

ডাক্তারের ঔষধ চলিতে লাগিল।

বৈকালে নিজে গিয়া কৃষ্ণাকে লইয়া আসিলাম। আসিতে কোন প্রকার আপত্তি করিল না।

সেই কৃষ্ণা আবার আসিয়াছে। আমার স্ত্রীকে সাবধান করিয়া দিলাম, 'বিবাহ-সংক্রান্ত কোনও কথা ওকে জিজ্ঞাসা ক'রো না।'

'কেন?'

'হয়ত দুঃখ পেতে পারে।'

গৃহিণী বলিল, 'না বললেও সে আমায় নিজে বলবে।'

'তা বলুক।'

দু'দিন কিছু বলে নাই।

বলিবার অবসরই বা কোথায়? পিতার শিয়রে বসিয়া দিবারাত্রি তাঁহার শুশ্রূষা করিতেছে। শ্রান্তি নাই, ক্লান্তি নাই, সেবারতা কৃষ্ণার সে কী রূপ! কী মাধুর্য! মুখে একটি কথা বলে না, এতটুকু বিরক্তি প্রকাশ করে না, আহার নিদ্রা ত' একরকম পরিত্যাগ করিয়াছে বলিলেই হয়।

আমার স্ত্রী সেদিন তাহার সেই শুষ্ক রুক্ষ চেহারা দেখিয়া বলিল, 'ও কি করছিস কৃষ্ণা, মরে' যাবি যে?'

কৃষ্ণা তাহার ঠোঁটের ফাঁকে ম্লান একটুখানি হাসিল। সুবিন্যস্ত সুশ্রী মুক্তোর মত দাঁতগুলি দেখা গেল। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না, মরব না বৌদি। মৃত্যু আমার নেই।'

শেষের কথাটি বলিতে গিয়া দেখা গেল, তাহার চোখ দুইটি অশ্রুভারে টল্‌মল্‌ করিতেছে।

কিন্তু এত যে সেবা, এত যে যত্ন, তবু সে তাহার পিতাকে রক্ষা করিতে পারিল না। চারদিনের দিন কাঙ্গালীচরণের বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কথা বলিবার জন্য কী তাহার ব্যাকুলতা! বিদায়-বেলায় কন্যাকে সে কী যেন বলিয়া যাইতে চায়! কিন্তু কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইতে চায় না। বিধাতা যেন স্বহস্তে তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিয়াছেন। প্রকৃতি এতদিন পরে হয়ত তাহার এই বিদ্রোহী সন্তানের উপর প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু আর কেন?

কাঙ্গালীচরণের দিকে বেশিক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে পারিলাম না, ছুটিয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলাম। মৃত্যুর যে এত কষ্ট তাহা জানিতাম না। কাঙ্গালীচরণ মরিতে কোনোদিন চায় নাই, জীবনকে সে বড় বেশি ভালবাসিয়াছিল, তাই আজ তাহার এই ক্ষুদ্র গৃহ, নিজ হাতে-গড়া গৃহের প্রত্যেকটি আসবাবপত্র, তাহার এই সযত্ন-সঞ্চিত কিঞ্চিৎ অর্থ, অকিঞ্চিৎকর সম্পদ্‌, সবই যেন আজ তাহার বিদায়ের যাত্রা-পথে দু'হাত বাড়াইয়া আগুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। অথচ তাহাকে যাইতেই হইবে।

সমস্ত দিবারাত্রি প্রাণপণে যুঝিয়া শেষ জীবনী-শক্তিটুকুও যখন তাহার নিঃশেষে ফুরাইয়া গেল—রাত্রি তখন প্রভাত হইয়া আসিয়াছে।

কৃষ্ণা ধীরে ধীরে আমার দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখ দেখিয়া বুঝিলাম সব শেষ হইয়া গেছে। কিন্তু ঐ অতটুকু মেয়ে কৃষ্ণা নিদারুণ দুঃখকে এমন করিয়া চাপিয়া রাখিবার শক্তি পাইল কোথায়? কাঁদিল না, অধীর হইয়া ছটফট করিল না,—নীরব নির্বিকার কৃষ্ণা যন পাষাণ-মূর্তির মত দুয়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কাঙ্গালীচরণের মরিবার বয়স হইয়াছিল। সে-জন্য দুঃখ করিবার কিছুই নাই।

তিনদিন পরে কন্যাকে শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যৎসামান্য আয়োজন করা প্রয়োজন। কৃষ্ণাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'জনকতক ব্রাহ্মণ ডেকে এনে শ্রাদ্ধটি চুকিয়ে ফেলি না, কি বল কৃষ্ণা?'

কৃষ্ণা নীরবে ঘাড় নাড়িল।

বলিলাম, 'টাকাকড়ি যা খরচ হয় আমিই দিচ্ছি, ভাড়া থেকে কেটে নেবো, তুমি ভেব না।'

কৃষ্ণা হাসিল। তাহার সেই নীরব হাসি। এত দুঃখের দিনেও মুখে তাহার হাসি দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

নিচে স্নানের ঘরে আমার স্ত্রী কাপড় কাচিতেছিল, হঠাৎ রুদ্ধশ্বাসে সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিয়াই হাঁপাইতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কি হলো ?'

'হয়নি কিছু।' বলিয়া সে কাপড় ছাড়িয়া কৃষ্ণার কাছ হইতে একটুখানি দূরে সরিয়া গিয়া আমায় চুপি-চুপি বলিল, 'শোনো।'

বলিয়া সে একবার দরজার দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল, 'হঠাৎ মনে হ'লো যেন কৃষ্ণার বাবা ঘুরে বেড়াচ্ছেন। চব্বিশঘণ্টা ঘুরে বেড়াতে দেখতাম কি-না। গা'টা কাঁটা দিয়ে উঠতেই, মনে হ'লো পালাই। আবার ভাবলাম, থাক, কাপড়টা কেচেই নিই। কিন্তু কাপড় কাচতে-কাচতে হুবহু মনে হ'লো, নিচের ওই ঘরে কে যেন তালা খুলছে। মনে হ'লো ইঁদুরে অমনি করছে। কান পেতে শুনতে লাগলাম। কিন্তু না বাপু, ইঁদুরে ও রকম শব্দ কখনও করতে পারে না। ভয়ে তাই পালিয়ে এলাম।'

'চোর-টোর নয় ত' ? দাঁড়াও দেখে আসি।' বলিয়া আলো লইয়া নিচে নামিয়া গেলাম। দেখিলাম, কোথাও কিছু নাই। মনে হইল কোথায় যেন মাত্র একটা ঝিঁ-ঝিঁ পোকা ডাকিতেছে। অমাবস্যার রাত্রি। চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। আকাশে মেঘ জমিয়াছে।

উপরে উঠিয়া আসিতেই কৃষ্ণা জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি অমন হঠাৎ যে নেমে গেলেন দাদা ?'

বলিলাম, 'তোমার বৌদি হঠাৎ ভয় পেয়ে ওপরে উঠে এলো। বললে, মনে হলো কে যেন নিচের এই অন্ধকার ঘরে তালা খুলছে। ইঁদুরে হয়ত' খুট্‌খুট্ করছিল, ভীতু মানুষ—ভয়ে তখন ওর হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণা নতমুখে চুপ করিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল।

বলিলাম, 'কিরে, তুইও যে ভাবতে বসে গেলি! তুইও কি ভয়-টয় পাস নাকি? ভয় কিসের? ভয় পাসনে।'

কৃষ্ণা মুখ তুলিয়া চাহিল। বলিল, 'চলুন দাদা, এ-বাড়ীটা ভাড়ায় বসিয়ে আমরা অন্য বাড়ীতে উঠে যাই।'

'কেন রে, তা কেন?'

কৃষ্ণা ম্লান একটুখানি হাসিল। বলিল, 'না দাদা, বৌদি মিছে বলেনি। ও শব্দ অমিও শুনেছি। ও ইঁদুরের শব্দ নয়।'

আমার গৃহিণী এতক্ষণে জোর পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, 'শোনো। আমার কথা তুমি হেসেই উড়িয়ে দাও।'

বলিলাম, 'কৃষ্ণার কথাটাই বুঝি বিশ্বাস করব মনে করেছ?'

'বিশ্বাস আপনাকে করতেই হবে দাদা, আসুন।' বলিয়া লণ্ঠনটা তুলিয়া লইয়া কৃষ্ণা উঠিয়া দাঁড়াইল।

পাগলীটা আমাদের কোথায় লইয়া যায় দেখিবার জন্য তাহার পিছু-পিছু চলিতে লাগিলাম। কৃষ্ণা আগে-আগে, আর আমরা দু'জনে তাহার পিছু-পিছু। সিঁড়ি ধরিয়া নিচে নামিয়া গিয়া কৃষ্ণা চাবি দিয়া নিচের সেই অন্ধকার ঘরের তালা খুলিল। অন্ধকার ঘরের ইঁদুরগুলো এতক্ষণ ছুটাছুটি করিতেছিল, মানুষ দেখিয়া ছুটিয়া পলাইল। কয়েকটা আরসলা ফর্-ফর্ করিয়া উড়িতে উড়িতে আমাদের গায়ে আসিয়া বসিল। ঘরের মধ্যে আবার আর একটা ঘর। এ-ঘরটা আমি পূর্বে কখনও দেখি নাই। দেখিবার প্রয়োজন হয় নাই। সে-ঘরেরও তালা খুলিয়া, দরজা ঠেলিয়া কৃষ্ণা আগে ঢুকিল। মেয়েটা কি সত্যই পাগল হইল নাকি? কিন্তু পাগলামির কোনও চিহ্নই তাহার দেখিলাম না। ঘরখানা বাক্স-প্যাঁটরা জিনিসপত্রে ঠাসা। লণ্ঠনটা হাত হইতে নামাইয়া কৃষ্ণা একটা বাক্স খুলিল। খুলিয়াই হাতের আলোটা তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল, 'দাদা আসুন!'

কাছে গিয়া যাহা দেখিলাম, বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া সেইখানেই হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকা ছাড়া আর উপায় রহিল না। টাকা ও নোটের তাড়ায় বাক্সটা ভর্তি। সংখ্যায় যে কত হইবে তাহার ইয়ত্তা নাই।

কৃষ্ণা আবার বলিল, 'দেখলেন?'

বলিতে গিয়া নিচের ঠোঁটটি তাহার থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

'এ কি তুমি আগে থেকে জানতে কৃষ্ণা ?

কৃষ্ণার চোখে তখন জল আসিয়াছে। প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া 'না' বলিয়া হাতের লণ্ঠনটা তাহার পাশের একটা বাক্সের উপর নামাইয়া রাখিয়া, সেইখানেই সে বসিয়া পড়িল এবং সেই বাক্সের গায়ে লুটাইয়া পড়িয়া ফুলিয়া-ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমরা দু'জনে মিলিয়া কৃষ্ণাকে কিছুতেই আর থামাইতে পারি না। এতদিন পরে এমন করিয়া তাহাকে এই প্রথম আমি কাঁদিতে দেখিলাম।

ভাই-ভাই

বড় ছেলে বিনোদ পোষ্টাফিসে চাকরি করে, মাহিনা পায় একশ' টাকা; আর ছোট ছেলে কিশোর চাকরিও করে না, মাহিনাও পায় না, খাইবার সময় চারিটি খায় আর টো টো করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়।

বাপ বলেন, 'বলি হাঁরে বিনোদ, কিশোরটার কি হবে বল্ দেখি ?'

বিনোদ বলে, 'হবে আর কি, শেষে খেতে পাবে না।' তোর পোষ্টাফিসে যদি একটা পিওনের কাজ টাজ......'

বিনোদ বিরক্ত হইয়া জবাব দেয়, 'না না সে হবে টবে না, তার চেয়ে দেখি যদি অন্য কোথাও—'

'তাই ছাখ্ বাবা।'

কিন্তু একশ' টাকা বেতন হইলেও বিনোদ আপিসের কেরানী। সকালে চারটি যেমন পারে খাইয়া সে ছুটিতে ছুটিতে আফিসে যায়, ফিরিয়া আসে সন্ধ্যায়, দেখিবার তাহার সময় কোথায় ?

শেষ পর্যন্ত দেখা তাহার আর হয় না।

এদিকে বৃদ্ধ পিতা, মরিবার ভাবনাই তাঁহার সব চেয়ে বেশি। ভাবেন, আর ক'দিনই বা বাঁচিবেন। বড় ছেলেটা না হয় যাহোক্ করিয়া দিন চালাইবে, কিন্তু ছোটটার অবস্থা শেষ পর্যন্ত কি হইবে কে জানে। ভাইএ ভাইএ ভাব হয়ত থাকিতে পারে, কিন্তু বৌএ বৌএ ভাব যে থাকিবে না তাহা সত্য। কখনও থাকে না। কাজেই তিনি এক বুদ্ধি ঠাওরাইলেন। বড় বৌ-মা উমাকে তিনি একদিন তাঁহার কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁ বৌমা, তোমার বোনের সঙ্গে আমি যদি কিশোরের বিয়ে দিই, তাতে কি তোমার কোনও আপত্তি আছে ?'

উমা হাসিয়া বলিল, 'বেশত!'

শ্বশুর বলিলেন, 'তাহ'লে তুমি মা কালই তোমার বাবাকে একখানি চিঠি লিখে দাও, তিনি যেন একবারটি এসে আমার সঙ্গে দেখা করেন।'

উমা ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'দেবো।'

কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। পত্র পাইয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া আসিলেন। দু'টি বোন দুই জা হইয়া একত্রে ঘর-সংসার করিবে, ইহার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে!

শেষ পর্যন্ত তাহাই হইল। উমার বোন শ্যামার সঙ্গে কিশোরের বিবাহ হইয়া গেল। দু'টি বোনই সুন্দরী! মানাইলও চমৎকার। জগদীশচন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। এবার তিনি সুখে মরিতে পারিবেন।

পাঁচ বৎসর পরের কথা।

জগদীশচন্দ্র মরিয়াছেন। উমা ও শ্যামা দুই বোনে ঘর সংসার করিতেছে। বড় বোন উমার একটি ছেলে হইয়াছে। শ্যামার সন্তানাদি এখনও হয় নাই।

কিশোর তখনও বেকার। বিনোদ দেড়শ' টাকা বেতন পায়। বেতন তাহার একশ' হইতে দেড়শ' হইয়াছে সুখের কথা, কিন্তু তাহার মেজাজ এখনও ঠিক তেমনিই আছে।

সকালে উঠিয়াই তাহার চীৎকার শুরু হয়।—'গেল গেল—আমার সব গেল। এই কেশোটার জ্বালায় কিছু আর থাকবার জো নেই দেখছি। এমন যদি করিস ত' এবার ঘাড়ে ধরে বের করে' দেবো বাড়ী থেকে।'

বড়-বৌ উমা বলে, 'কি হ'লো কি গো? সকাল থেকে অমন ষাঁড়ের মতন চেঁচাচ্ছ যে?'

বিনোদ বলে, 'আমার দাঁত মাজবার মাজন কোথায় গেল? এ ঠিক ওই কেশোটার কাজ। বাবুর দাঁত মাজবার মাজন দরকার হয় তাকে কিনে আনতে বোলো।'

বড় বৌ তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'এই নাও তোমার মাজন—আমি নিয়েছিলাম। মিছামিছি ঠাকুরপোকেই সব কাজে দোষ দাও কেন বল ত?'

বিনোদ লাফাইয়া উঠিল।—'দেবো না? বিধবা মেয়ের মত আর কতকাল আমার অন্ন ধ্বংস করবে শুনি! কোথায় সে?'

উমা বলিল, 'বাজারে গেছে।'

বলিয়াই সে তাহার কাছে আগাইয়া গিয়া চুপি চুপি কহিল, 'হ্যাঁগা, অমনি করে' যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথাগুলো বলছ, শ্যামা কি মনে করবে বল দেখি ?'

বিনোদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।—'বাবা খুব চালাক লোক ছিলেন, বুঝলে বড়-বৌ ? এই জন্যেই তোমার বোনের সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে গেছেন। হ'তো ওর অন্য মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ত' এতদিন দেখতাম তুমিও ওকে ঘাড় ধ'রে বের করে' দিয়েছ বাড়ী থেকে।'

উমা বলিল, 'ওগো তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর। যখন তখন মানুষকে আর এমন করে কথার গঞ্জনা দিয়ো না।'

বিনোদ তখনকার মত চুপ করিল বটে, কিন্তু সে আর কতক্ষণ !

খাইতে বসিয়া আবার সে লাফাইয়া উঠিল—'ছি ছি ছি ছি। পচা মাছ ছাড়া বাজারে আর মাছ ছিল না ? ডাকো ত ডাকো ত সেই ষ্টুপিডকে, দেখি একবার আমি !'

উমা বলিল, 'ডেকে কি হবে ? এতগুলি লোকের জন্য দেবে তুমি মোটে তিন আনা পয়সার বাজার, পচা মাছ ছাড়া তোমার জন্যে টাট্‌কা রুই কাতলা সে আনবে কোত্থেকে শুনি ?'

বিনোদ বলিল, 'না না তুমি জানো না বড় বৌ, ওই থেকে ও লাভ করছে।'

বিনোদের ছেলেটাকে কাঁধে চড়াইয়া গান করিতে করিতে নিচের উঠানে কিশোর ঠিক ঘোড়ার মত পা তুলিয়া তুলিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছিল, দাদার কথাটা তাহার কানে যাইতেই সে ভেংচি কাটিয়া সেইখান হইতেই চীৎকার করিয়া উঠিল, 'হ্যাঁ—লাভ করেছে, তোর মাথা করেছে !'

কিশোর দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল, খোকাবাবু তাহার চুলের গোছা দুহাতের মুঠি দিয়া সজোরে টানিয়া বলিল, 'হেট্ হেট্ !'

'ওরে বাবারে বাবারে গেলুম গেলুম।' বলিয়া কিশোর আবার লাফাইতে শুরু করিল। বলিল, 'মাইরি, বলছি, কোন্ শালা লাভ করেছে। কেন, ওই হাঁদাকান্ত বৌদিটা ওর কাছে বসে আছে কিজন্যে মরতে ! কেন, ও বলতে পারছে না, বিড়ি কেনবার জন্যে এক পয়সা আর খোকাবাবুর লেবেনচুষের জন্যে এক পয়সা ওর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যাইনি ?'

বিনোদ বলিল, 'তা হোক্, তুই বেরো আমার বাড়ী থেকে। আমি আর পারছিনে।'

কিশোর বলিল, 'হ্যাঁ এই যে, না বেরোলেই নয়। কেন পারছিসনি শুনি? দে না আমার হাতে দেড়শ' টাকা এনে, তোকে আমি রাজার হালে রেখে দিচ্ছি গ্যাখ্।'

বিনোদ তাহার স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'শুনেছ? কথা শুনেছ হারামজাদার?' তাহার পর দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলিল, 'দাঁড়া, তোকে আমি বার করতে পারি কিনা দেখাচ্ছি।'

বলিতে বলিতে সে খাওয়া এবং কথা দুই শেষ করিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কথা তাহার এত শীঘ্র শেষ করিবার ইচ্ছা মোটেই ছিল না, অথচ শেষ না করিলে আফিসের ওদিকে বেলা হইয়া যায়।

উমা তাহাকে এত করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করে, বলে, 'দুটো মাত্তর মানুষ, দু'বেলা খাচ্ছে, এতে তোমার এতই বা কী খরচ বাপু যে তুমি নাকে কাঁদছ!'

বিনোদ বলে, 'তুমি মেয়েমানুষ, তুমি খরচের কি জান বল ত? আচ্ছা কই তুমিই বল দেখি সত্যি করে'—তোমার বোনের সঙ্গে ওর বিয়ে না হ'লে তুমিই ওকে রোজগার করতে বলতে কি না?'

উমা বলে, 'সে কি আর আমি এখনও বলি না ভাবছ? বলি। কিন্তু ঠাকুরপো কি জবাব দেয় জানো? বলে, তোমরা বড়লোক বৌদি, তোমরা একটা চাকর ত রাখতে, আমাকেই তেমনি তোমাদের চাকর ভাবো না! মাইনে যেমন নিই না, তেমনি আমার বৌটা দু'বেলা খায়, এর ওপর আর কি বলতে পারি বল?'

কিন্তু বিনোদের সেই এক কথা। বলে, 'না না ওর কথায় ভুললে চলবে না বড় বৌ, তুমি নিজের সর্বনাশ নিজে কোরো না। আজ দেখছ দুটো মানুষ, কিন্তু কাল দেখবে ছেলেয় ছেলেয় ঘর ভরে গেছে, তখন—'

বলিয়া বিনোদ একবার চোখ বুজিয়া বোধকরি কিশোরের ঘরভর্তি ছেলে-মেয়ের ছবিটা স্বচক্ষে দেখিয়া লয় এবং দেখিয়াই সে চমকিয়া চীৎকার করিয়া ওঠে, 'না না আমি পারব না বাপু, আমি পারব না সেই ভালো।'

এই লইয়া উমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি তাহার প্রায় প্রত্যহই লাগিয়া থাকে।

সেদিন কিন্তু ঝগড়াটা একটুখানি বেশিই হইয়া গেল। এবং তাহার ফল হইল এই যে, বিনোদ আফিস চলিয়া গেলে, ছেলে কোলে লইয়া মুখ ভারি করিয়া উমা রান্নাঘরে গিয়া দাঁড়াইল। শ্যামা রান্না করিতেছিল, উমা বেশ একটুখানি জোরে জোরেই বলিল, 'শ্যাখ্ শ্যামা, তুই আর কচি খুকি নোস্ যে তোকে রোজ রোজ শিখিয়ে দিতে হবে। ঠাকুরপোকে যা হোক্ একটা কাজকর্ম দেখতে বল্।'

শ্যামা যে বলে নাই তাহা নয়। বরং ঠিক তাহার উল্টা। বলিয়া বলিয়া সে হয়রান হইয়া গিয়াছে। এবং কাল রাত্রেও এই চাকরির কথা লইয়াই স্বামীর সঙ্গে তাহার দারুণ ঝগড়া হইয়াছে।

তাহার উপর আজ এই দিদির কথাটা শুনিয়া শ্যামার হঠাৎ রাগ হইয়া গেল। বলিল, 'কেন দিদি আমরা ত' আর তোর বাড়ীতে বসে খাইনি! ও খাটছে চাকরের মত, আর আমি খাটছি রাঁধুনী হ'য়ে। এইবার ওর একটা কিছু হ'লে হয়! হ'লে আমিও বাঁচি, আমারও গতরটা জুড়োয়।'

এমন কথা শ্যামা কোনোদিনই বলে না।

উমাও রাগ করিল। বলিল, 'কাল থেকে হাঁড়ি যদি তুই ধরিস্ ত তোকে আমি অতি বড় দিব্যি দিলাম শ্যামা। আর তোর বর যেন কাল থেকে চাকরের মত না খাটে। বুঝলি ?'

এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল। শ্যামার দু'চোখ ভরিয়া তখন জল আসিয়াছে দিদিকে শুনাইয়া শুনাইয়া কি যেন সে বলিতে গিয়াও বলিতে পারিল না। ঠোঁট দুইটা তাহার এত বেশি থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল যে শেষ পর্যন্ত তাহার মুখের কথা মুখেই আটকাইয়া রহিল।

শ্যামার দোষ দেওয়া অন্যায়। অকর্মণ্য স্বামীর জন্য তাহাকে যদি দু'বেলা দু'মুঠা খাবার গঞ্জনা সহিতে হয় ত তাহার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

আহারাদির পর কিশোর তাহার উপরের ঘরে গিয়া বসিয়াছিল, শ্যামাও তাহার হেঁশেলের কাজ চুকাইয়া ঘরে ঢুকিল। ঢুকিয়াই দরজার খিলটা বন্ধ করিয়া দিয়া কিশোরের কাছে গিয়া বলিল, 'যা বলছি মন দিয়ে শোনো। চীৎকার করে উঠো না। বুঝলে ?'

কিশোর বলিল, 'বল।'

শ্যামা তখন তাহার দু'হাত হইতে সোনার চুড়ি কয় গাছা টানিয়া টানিয়া খুলিতে আরম্ভ করিল।

কিশোর একটুখানি অবাক্ হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'চুড়ি খুলছ যে?'

'বলছি দাঁড়াও।' বলিয়া দু'হাতে দু'গাছি চুড়ি রাখিয়া বাকি দশগাছি সোনার চুড়ি শ্যামা তাহার স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া বলিল, 'চাকরি পাচ্ছ না তার জন্যে আর তোমার দোষ দিয়ে করব কি, এই চুড়ি ক'গাছা স্যাকরার দোকানে বন্ধক দাওগে, দিয়ে যা পাও তাই নিয়ে তুমি আজ হোক কাল হোক ছোট্ট আমাদের দু'জনের মত একখানি ঘর ভাড়া করে এসো। তারপর চল আমরা চলে যাই।'

'তার মানে?'

'মানে আর কিছু না। তোমার দাদা, তুমি হয়ত সহ্য করতে পার, কিন্তু আমি আর কিছুতেই পারছি না।'

কিশোর কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া চুড়িগুলা নাড়াচাড়া করিতে করিতে কি যেন ভাবিল, তাহার পর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কিন্তু শ্যামা, তারপর আমাদের চলবে কিসে?'

শ্যামা বলিল, 'সে ভাবনা পরে ভেবো। চাকরি পাও ভালই, না পাও দুটো পেট ত', গয়না ত' আমার আরও আছে, বিক্রি করে যাহোক্ একটা কিছু ব্যবসা করবে।'

কিশোর বলিল, 'ঠিক বলেছ। বিড়ির ব্যবসা একটা করবার আমার ভারি ইচ্ছে। বিড়ি আমি নিজেও বাঁধতে জানি।'

শ্যামা তাহাকে আদর করিয়া বলিল, 'তাই হবে লক্ষ্মীটি, তুমি এখন যাও ত'।'

কিন্তু কটু কথাগুলা শ্যামাকে বলিয়া অবধি উমার মনে শান্তি নাই। শ্যামাকে দরজায় খিল বন্ধ করিতে দেখিয়া উমা তাহাদের ঘরের বাহিরে এতক্ষণ কান পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ভিতর হইতে খিল খোলার শব্দ পাইয়া সে একটুখানি দূরে সরিয়া গেল। দেখিল, খিল খুলিয়া জামা জুতা পরিয়া কিশোর বাহির হইয়া আসিতেছে। তাহার পিছু-পিছু নিচে গিয়া উমা কিশোরকে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, 'শ্যামা তোমায় কি বললে ঠাকুরপো?'

কিশোর জবাব দিবার আগেই হাতে তাহার চুড়ি কয়গাছির উপর উমার নজর পড়িল।—'শ্যামার চুড়ি না? কি হবে?'

কিশোর বলিল, 'কেন, কি হবে জানো না? বন্ধক দেবো।'

উমা জিজ্ঞাসা করিল, 'তারপর?'

কিশোর বলিল, 'তারপর তোমাদের দুজনের মনস্কামনা পূর্ণ হবে। আমরা এ বাড়ী থেকে উঠে যাব।'

'কিন্তু তোমাদের চলে যাবার কথা ত' হয়নি ঠাকুরপো, তোমার একটা চাকরির কথা—'

কিশোর তাহাকে কথাটা শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'কেন হবে না বৌদি, দাদা আমাকে পঞ্চাশবার এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছে। কালও ত' বলেছে, তুমি শুনেছ।'

হাত বাড়াইয়া উমা কিশোরের একখানি হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'তা বেশ। কিন্তু আমার একটি কথা তুমি শুনবে ঠাকুরপো? চুড়িগুলো বন্ধক দেবার জন্য কোথায় তুমি দোকানে দোকানে ছুটে বেড়াবে ভাই, তার চেয়ে ওগুলো তুমি আমারই কাছে বন্ধক রাখো। একশ' টাকা তোমায় আমি এক্ষুণি দিচ্ছি।'

কিশোর ফিরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'চল—শ্যামাকে তাই বলবে চল।'

'না ভাই দোহাই তোমার, ওকে তুমি জানাতে পারবে না।'

কিশোর বলিল, 'মাইরি আর কি! তাহ'লে না দিলেই নয়! শেষে বলবে, কই আমার কাছে ত' চুড়ি তুমি রাখোনি ঠাকুরপো।'

উমার মুখখানা সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল, বলিল, 'আমায় তুমি এত অবিশ্বাস কর ঠাকুরপো?'

কিশোর বলিল, 'কি জানি বৌদি, আমি আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারছিনি। ভাবতাম দাদা বুঝি আমার সঙ্গে হাসিরহস্য করছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্যি-সত্যিই আমায় যে বাড়ী থেকে চলে যেতে বলবে—'

বলিতে বলিতে চোখ দুইটি তাহার ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল এবং সে আর মুহূর্তমাত্র অপেক্ষা না করিয়া একরকম ছুটিয়াই সেখান হইতে বাহির হইয়া গেল।

কিন্তু শুধু বাড়ী ভাড়া করিলেই চলে না। নূতন করিয়া সংসার পাতাইতে

হইলে ঝাঁটাগাছটি হইতে আরম্ভ করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় অনেক কিছু বস্তুরই প্রয়োজন। অথচ তাহাদের কিছুই নাই।

শ্যামা বলিল, 'সে সব জিনিস আমরা সংসার থেকেই নেবো। আমার শ্বশুরেরও ত একটা সংসার ছিল। তাছাড়া এই বাড়ীও ত আমার শ্বশুরের। এই বাড়ীরও ত অর্ধেক আমরা পাই।'

বাড়ীর কথা কিশোরের এতক্ষণ মনে ছিল না। এইবার সে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, 'আলবত। এই বাড়ী আমি আজই বিক্রি করব। তারপর থাকতে হয় দু'জনেই ভাড়া-বাড়ীতে থাকিগে।'

বাড়ীর কথা যে উঠিতে পারে, বিনোদ তাহা ভাবে নাই। বলিল, 'ম্বাখো বড়-বৌ, তোমার এই বোনটিকে তুমি যত ভালমানুষ ভাবো তত ভালমানুষ নয়। ওই শ্যামাই ওকে এই সব শেখাচ্ছে।'

উমা বলিল, 'তা কি আর করবে বল। এতদিন ত কোনও কথা ওঠেনি, তুমিই ত এ কাণ্ডটি করলে।'

কিশোরকে আলাদা করিয়া দিবার জন্য বিনোদ তখন মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। বলিল, 'সেই ভালো। বাড়ী ত আব একদিনে বিক্রি করা যায় না। এখন ওকে সংসারের জিনিসপত্র কিছু কিছু দাও, ও যাক্ অন্য বাড়ীতে উঠে, তারপর ভাল একটা খদ্দের পেলেই বাড়ী আমি বিক্রি করে ফেলব।'

শেষ পর্যন্ত তাহাই হইল। কিশোর ও শ্যামা বাড়ী ছাড়িয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেল। উমা এত করিয়া তাহাদের ঠিকানা চাহিল, কিন্তু কিশোর ঠিকানা কিছুতেই দিল না। বোনকে বিদায় করিয়া উমা কাঁদিতে লাগিল। আর তাহার ছেলেটার দায়ে কিশোরকে লুকাইয়া পলাইতে হইল।

ওদিকে শ্যামা তাহার নূতন বাড়ীতে গিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া কিশোরের সঙ্গে পরামর্শ করিতে বসিল। বলিল, 'এবার কি করবে বল দেখি? চাকরির চেষ্টা করবে, না একটা দোকান-দানি যাহোক একটা কিছু—'

কিশোর বলিল, 'চাকরির চেষ্টা আমি অনেক করেছি শ্যামা। ভাল লেখাপড়া শিখিনি কিনা, তাই চাকরি আমায় কেউ দিতে চায় না।

তারচেয়ে আমায় তুমি দুটো টাকা দাও, বাড়ীতে বসে আমি বিড়ি তৈরি করব।'

'সংসার আমাদের তাতে চলবে ত ?'

'না চলে অন্য ব্যবস্থা করলেই হবে।'

শ্যামা তাহাতেই রাজী হইল।

শ্যামা ঘরের কাজকর্ম করিতে থাকে, আর কিশোর বসিয়া বসিয়া বিড়ি বাঁধে আর গল্প করে। বলে, দাঁড়াও না শ্যামা, দাদার ভিরকুটি আমি ভেঙ্গে দিচ্ছি। একটা মাস আমি দেখব, তারপর ওই বাড়ী আমি অন্যের কাছে বিক্রি করে ফেলব, দেখো। তখন বাছাধন বুঝতে পারবে। আমারই মত ওকেও ঠিক এমনি ভাড়া বাড়ীতে এসে বাস করতে হবে।'

শ্যামা বলে, 'তাই কোরো। বাড়ী ত কারও একার নয়, যে টাকা তুমি পাবে সেই টাকা দিয়ে আমরা একটা ছোটখাটো বাড়ীও তৈরি করে নিতে পারব।'

কিশোর বলে, 'এতবড় না হোক এইরকম ত হবে।'

তাহার পর কেমন বাড়ী হইবে তাহারই জল্পনা-কল্পনা চলিতে থাকে। শ্যামা বলে, 'ছোটখাটো একটি টিনের বাড়ী হলেই আমাদের চলে যাবে।'

কিশোর বলে, 'না না না না, টিনের বাড়ী কেন ? টিনের বাড়ীতে বাস করে' আমাদেরই সর্দি লেগে যাচ্ছে, আর ওই ছোট ছেলে—'

হাসিতে হাসিতে শ্যামা বলে, 'ছোট ছেলে আবার কোথায় গো ?'

কিশোর তাহার দাদার ছেলে খোকাবাবুর কথাই বলিয়াছিল। ছেলে-টাকে সে কয়েকদিন দেখে নাই। না দেখিয়া এখন সে কথায় কথায় প্রায়ই এই ছেলেটার কথা বলিয়া ফেলে। বলিয়া ফেলিয়া শেষে অপদস্থ হয়। হাসিয়া বলে, 'বলছিলাম তোমার নিজের ছেলের কথা। আজ না হোক্, হবে ত' একদিন।'

শ্যামা কিন্তু চালাক মেয়ে। ভিতরের রহস্য বুঝিতে পারিয়া সে এই ছেলের কথা লইয়া বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করে না, খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে অন্য কথা পাড়িয়া বসে।

কিশোর সেদিন খুব ভাল করিয়া এক বাণ্ডিল গোলাপী বিড়ি তৈরি করিল। তাহার পর বৈকালে দোকানের বিড়িগুলি দোকানে বিক্রি করিয়া সেই গোলাপী বিড়ির বাণ্ডিলটি পকেটে লইয়া নিতান্ত অন্যমনস্কের মত কিশোর ধীরে ধীরে হাঁটিতে হাঁটিতে গিয়া দাঁড়াইল তাহাদের নিজেদের বাড়ীর দরজায়। বিনোদ বোধহয় তখনও আফিস হইতে ফিরে নাই। উমা তাহার ছেলেকে কোলে লইয়া উঠানে দাঁড়াইয়া কাহার সঙ্গে যেন কথা কহিতেছে। দরজাটা একটুখানি ঠেলিয়া ফাঁক করিয়া সেই ফাঁকের মুখে চোখ রাখিয়া কিশোর অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে বোধকরি ছেলেটার দিকেই তাকাইয়া রহিল। তাহার পর হঠাৎ একসময় দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিতেই দেখিল, উমা যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল সে তাহাদের নূতন ঝি। কলতলায় বসিয়া বসিয়া বাসন মাজিতেছে। হাসিতে হাসিতে কিশোর বলিল, 'তাহ'লে ঝি তোমায় একটা রাখতে হয়েছে দেখছি।'

কিশোর সেই যে গিয়াছে এতদিন পরে এই সে প্রথম আসিল। উমা তাই একটুখানি রাগ দেখাইয়া বলিল, 'এতদিন পরে আজ বুঝি তোমার সময় হ'লো ?'

কিশোর বলিল, 'কি আর করি বৌদি, গরীব মানুষ দিবারাত্রি খাটতে হয়।'

'কাজকর্ম পেয়েছ নাকি ?'

কিশোর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'না কাজটাজ পাইনি, তবে বাড়ী বসে বিড়ি তৈরি করি, তাইতে রোজ কোনরকমে হয় আনা-আষ্টেক।' এই বলিয়া তাহার পকেট হইতে সেই গোলাপী বিড়ির বাণ্ডিলটি বাহির করিয়া কিশোর তাহার বৌদিদির হাতে দিয়া বলিল, 'এইটি দিয়ো দেখি দাদাকে, খেয়ে যদি ভাল বলে ত' রোজ এক বাণ্ডিল করে—'

বলিয়াই একটা ঢোক গিলিয়া একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া বলিল, 'কিন্তু মাইরি তোমার বোনটা এত বোকা, হাতে ধরে' ধরে' বিড়ি বাঁধতে শেখাচ্ছি, বলছি শেখো, তাহ'লে ডবল রোজগার হবে, কিন্তু কিছুতেই শিখতে পারছে না, খালি ফ্যা ফ্যা করে' হাসছে আর সব লণ্ডভণ্ড করে' দিচ্ছে।'

উমাও একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, 'ওকেও আর বিড়ি

বাঁধতে শিখিয়ো না ভাই, আর এ ছোটলোকের কাজ তুমিও আর না করে' বরং অন্য কিছুর চেষ্টা চরিত্তির কর।—আচ্ছা, এখন শ্যামা কেমন আছে বল। ভাল নেই তা আমি বেশ বুঝতে পারছি।'

শেষের কথাটা সে এমন শ্লেষের ভঙ্গিতে বলিল যে, কিশোরের বুকে গিয়া সেটা যেন ধ্বক্ করিয়া বিঁধিল। বলিল, 'তবে আর মিছে জিগ্যেস করছ কেন বৌদি? ভাল নেই বুঝতেই যখন পারছ, তখন তাই ধরে' নাও যে, সে ভাল নেই।'

কিশোরকে দেখিয়া অবধি ছেলেটা তাহার মার কোল হইতে কাকাবাবুর কোলে যাইবার জন্য অনেকক্ষণ হইতেই ছটফট করিতেছিল। কিশোর এইবার তাহাকে হাত বাড়াইয়া লইতে গেল, কিন্তু উমা বলিল, 'থাম্ বাবা থাম্। ভারি ত কাকাবাবু, কাকীমাকে নিয়ে গিয়ে তার দুর্গতির আর সীমে কিছু রাখে নি, তার ওপর সেই যে গেছে, তা একটা খবর দেবার নাম নেই। আজ এলো এক বাণ্ডিল বিড়ি হাতে নিয়ে।'

এই বলিয়া সে ছেলেটাকে তাহার কোলের উপর আরও ভাল করিয়া চাপিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বলি হ্যাঁ হে, স্ত্রীকে পোষবার ক্ষমতা নেই তবু ত নিয়ে গেলে খুব বাহাদুরী করে'। তার না হয় মরবার ফুরসুত নেই বুঝলাম, কিন্তু আমাদেরও ত ঠিকানাটা দিতে পার, একবার নিজে গিয়েই না হয় দেখে আসি।'

কিশোর বলিল, 'না, সে আর তোমাকে দেখতে হবে না বৌদি, সে বেশ আছে।'

উমা তাহার মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলিল, 'হ্যাঁ তোমার মত স্বামীর হাতে পড়ে বেশ যে কেমন আছে তা আমি বেশ ভাল করেই বুঝছি। বলি—গয়না-গুলো কি এরই মধ্যে সবই গেল, না এখনও কিছু আছে?'

কিশোর বলিল, 'সে সব কথা জানবার ত' তোমার কোনও দরকার নেই বৌদি।'

'দরকার আছে কি না তা তুমি কেমন করে' বুঝবে বল। এক মার পেটের বোন, মা মরবার পর হতভাগীকে আমি নিজের হাতে মানুষ করেছি, তা নইলে কোথায় গয়না বেচছে না বিড়ি বাঁধছে তা আমি দেখতে যেতাম না।'

বলিতে বলিতে চোখ দুইটা তাহার জলে ভরিয়া আসিল।

কিশোর তাহার সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া আর একবার হাত বাড়াইয়া বলিল, 'ছেলেটাকে একবার দেবে বৌদি ?'

উমা পিছন ফিরিয়া বলিল, 'না আর ছেলেকে ভালবেসে কাজ নেই। নিজের ছেলেপুলে হলে তাদের কেমন করে' বিড়ি বাঁধতে শেখাবে সেই কথা ভাবোগে যাও। এই নাও তোমার—'

বলিয়া তাহার অত যত্নের বাঁধা গোলাপী বিড়ির বাণ্ডিলটা উমা তাহার পায়ের কাছে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া সিঁড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেল। ছেলেটা তাহার কাকাবাবুর দিকে হাত বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতক্ষণ দেখা গেল কিশোর সেইদিক পানে একদৃষ্টে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল, তাহার পর দেখিল, সারা উঠানময় বিড়িগুলা ইতস্তত: ছড়াইয়া পড়িয়াছে। অমন সকরুণ দৃষ্টিতে বিড়িগুলির দিকে তাহাকে তাকাইতে দেখিয়া কলতলা হইতে বৃদ্ধা ঝি বলিয়া উঠিল, 'আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি বাবা, দাঁড়াও।'

এই বলিয়া কলে হাত ধুইয়া সে বোধ হয় বিড়িগুলি কুড়াইয়া দিবার জন্যই আগাইয়া আসিতেছিল কিন্তু কিশোরের দুই চোখ বাহিয়া তখন জল গড়াইতেছে, তাহাই সে বোধ করি ওই ঝির কাছে গোপন করিবার জন্য তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া দরজা খুলিয়া একরকম ছুটিয়াই সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তাহারই কিছুদিন পরে বিনোদের বাড়ীতে ভারি একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটিল। ঘটনাটা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি শোচনীয়।

বাড়ীর বৃদ্ধা ঝি বিনোদের ছেলেটিকে লইয়া দরজার কাছে বসিয়াছিল। রাস্তার ধূলাবালি লইয়া ছেলেটি খেলা করিতেছে এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে উমা ডাকিল, 'ঝি !'

দরজা ঠেলিয়া ঘরে ঢুকিয়া ছেলের দিকে পিছন ফিরিয়া ঝি তাহার সঙ্গে কথা বলা শেষ করিয়া বাহিরে আসিয়াই দেখে, ছেলে নাই! এদিক ওদিক তাকাইয়া পথের উপর খানিকটা ছুটাছুটি করিয়া ছেলেকে কোথাও সে খুঁজিয়া পাইল না। রাস্তাটা গলি রাস্তা। লোকজনের চলাচল খুব কম, গাড়ীঘোড়া ত' চলেই না। তবু সে ইহাকে উহাকে যাহাকে পাইল তাহাকেই

জিজ্ঞাসা করিল, এ-বাড়ী সে-বাড়ী খুঁজিয়া দেখিল, কিন্তু ছেলের সন্ধান কেহই দিতে পারিল না।

অবাক্ কাও !

ইহারই মধ্যে ছেলে তাহা হইলে গেল কোথায় ?

ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি পড়িয়া গেল। ঝি কাঁদিতে লাগিল, উমা কাঁদিতে লাগিল, আফিস হইতে বিনোদ আসিয়া খুঁজিতে আর কোথাও বাকি রাখিল না।

কেহ বলিল, 'ছেলেধরায় নিয়ে গেছে।'

কেহ বলিল, 'খবরের কাগজে সেদিন দেখছিলাম বটে, ছেলেমেয়ে আজকাল বড্ড চুরি যাচ্ছে।'

আবার কেহ কেহ বলিতে লাগিল, 'ছেলে যাবে কোথায় মশাই, ছেলে আপনি পাবেন।'

এমনি পাঁচ জনের পাঁচ কথায় বিনোদের মাথা একেবারে গোলমাল হইয়া গেল। কি যে করিবে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাগলের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল।

পাশের বাড়ীর এক নিরঞ্জনবাবু বলিলেন, 'এখনও বসে আছেন কেন বিনোদবাবু, পুলিশে একটা খবর দিয়ে আসুন। গায়ে সোনার গয়না ছিল ত ?'

ঘাড় নাড়িয়া বিনোদ বলিল, 'হঁ্যা।'

'ব্যস, তবে আর বলতে হবে কেন দাদা, যে বাজার পড়েছে আজকাল, ওরই লোভে কেউ হয়ত তুলে নিয়ে গেছে, গয়নাগাঁটি খুলে নিয়ে পথের ধারে এতক্ষণ হয়ত বসিয়ে দিয়ে গেছে। যান আপনি পুলিশে একটা ডায়েরী করে আসুন।'

বিনোদ তৎক্ষণাৎ পুলিশ থানায় একটা ডায়েরী লিখাইয়া আসিল।

রাত্রে আর সেদিন কাহারও খাওয়া হইল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে উমা একবার বলিল, 'ছেলেটাকে ঠাকুরপো নিয়ে যায়নি ত'—হ্যাগা।'

বিনোদ বলিল, 'সে আগে নিজের খাবার যোগাড় করুক, তারপর ছেলে নিয়ে যাবে। পাগল হয়েছ ?'

খবরটা যে কিশোরকে একবার জানাইবে তাহারও উপায় নাই। তাহার ঠিকানা কেহই জানে না।

আফিস হইতে আসিবার পথে ট্রাম হইতে নামিয়া বিনোদ রোজই একবার থানায় খবর লইয়া আসে—ছেলের কোনও সংবাদ তাহারা পাইয়াছে কিনা। সে দিনও অমনি থানা হইতে বাহির হইতেছে, এমন সময় দেখিল, ফুটপাতের উপর দিয়া কিশোর কোথায় যাইতেছে। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া বিনোদ ডাকিল, 'কেশো!'

কিশোর পিছন ফিরিয়া দাদাকে দেখিয়াই হাসিতে লাগিল।

'হাসছিস্ যে বড়? এদিকে আমার যে সর্বনাশ হয়ে গেছে তার কিছু খবর রাখিস্ হতভাগা?'

কিশোর তেমনি হাসিতে হাসিতে জবাব দিল, 'কি সর্বনাশ?'

বিনোদ বলিল, 'খোকাকে কে চুরি করে' নিয়ে গেছে।'

কিশোর তখনও হাসিতে লাগিল।—'তাই নাকি?'

হাসি দেখিয়া বিনোদের কেমন যেন সন্দেহ হইল। দৃঢ় মুষ্টিতে কিশোরের একখানা হাত সে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'তুই জানিস তাহ'লে—বল কোথায় আছে?'

কিশোর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'আমি জানি না। বাঃ, আমার সঙ্গে তোমার কিসের সম্বন্ধ?'

বিনোদ বলিল, 'শোন্ তবে, এইদিকে আয়।'

বলিয়া টানিতে টানিতে বিনোদ একরকম জোর করিয়াই তাহাকে থানার ভিতর ঢুকাইল।

জমাদার সাহেব মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি খবর বিনোদবাবু?'

কিশোরকে দেখাইয়া বিনোদ বলিয়া উঠিল, 'আমার ছেলের খবর এ জানে—ধরুন একে, নইলে পালাবে।'

জমাদার সাহেব তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দুস্থানী সেপাই-এর দিকে ইঙ্গিত করিতেই টপ করিয়া আগাইয়া গিয়া কিশোরকে সে ধরিয়া ফেলিল এবং শুধু ধরিয়া ফেলিয়াই ক্ষান্ত হইল না, আর একজন সেপাই দড়ি আনিল, হাতকড়া আনিল এবং সেই সব দিয়া কিশোরকে তাহারা উত্তমরূপে বন্ধন

করিয়া রুলের গুঁতা লাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'বল্ এবার ছেলে কোথায় আছে ?'

কিশোর তখনও হাসিতেছে, বিনোদের মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'ছেলে তোমার চাই ?'

বিনোদ জবাব দিবার আগেই জমাদার সাহেব দাঁত মুখ খিঁচাইয়া তাহাকে মারিতে উঠিলেন। বলিলেন—'চল্ শুয়ার, ছেলে কোথায় রেখেছিস বের করে' দিবি চল্ !'

কিশোর আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলে তোমার চাই ?'

বিনোদ হেঁটমুখে পায়চারি করিতে করিতে কি যেন ভাবিতেছিল, মুখ তুলিয়া বলিল, 'হাঁ—চাই—চাই !'

কোমরে দড়ি ও হাতে হাতকড়া—কিশোরকে ঘিরিয়া দুই-তিন জন সেপাই আগে আগে চলিল। পশ্চাতে বিনোদ ও জমাদার সাহেব। বিনোদের মুখে কথা নাই।

কিশোর আগে আগে পথ দেখাইয়া যেখানে তাহাদের লইয়া গেল—কোন ভদ্রলোক সেখানে বাস করে বলিয়া মনে হইল না। সন্ধ্যায় তখন পথে পথে গ্যাসের আলো জ্বলিয়াছে। পাশে একটা মাঠের উপর দিয়া নোংরা বস্তীর একটা অতি সঙ্কীর্ণ পথ। পুলিশ-কনেষ্টবল দেখিয়া চারিদিকে তখন লোক জড়ো হইয়া গিয়াছে।

অতিকষ্টে জনতা সরাইয়া ছোট্ট একটা খোলার বস্তির মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। দরমার বেড়া দেওয়া ছোট একটি টিনের ঘর। তাহারই দাওয়ায় অন্ধকারে মনে হইল একটি মেয়ে যেন লণ্ঠন জ্বালিতেছে আর বলিতেছে,—'দাঁড়া বাবা, আলোটা আগে জ্বেলে নিই, তারপর ঘোড়া ঘোড়া খেলব। দাঁড়া—বিরক্ত করিসনে।'

হ্যারিকেনের আলো জ্বলিয়া উঠিতেই দেখা গেল, যে-মেয়েটি আলো জ্বালিতেছিল সে আমাদের শ্যামা, আর যে-ছেলেটি পিঠে চড়িয়া কচি কচি ছোট দুটি হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়াছে—তাহারই জন্য যত কিছু—নিরুদ্দিষ্ট খোকাবাবু!

উঠানে লোক দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়া শ্যামা বলিয়া উঠিল, 'কে ?'

বলিয়াই সেইদিক পানে তাকাইতেই দেখে, হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি-

বাঁধা তাহার স্বামী, সঙ্গে বিস্তর লোকজন! ব্যাপারটা সে প্রথমে কিছুই বুঝিতে পারে নাই, পরে যখন দেখিল, বিনোদ তাহার কাছে আগাইয়া আসিয়া ছেলেটাকে কোলে তুলিয়া লইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আর কোনও কথাই বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না। নীরবে সেইখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

খোকাবাবু কিন্তু তাহার বাবার কোল হইতে কাকাবাবুর কোলে যাইবার জন্য হাত বাড়াইয়া কাঁদিতে শুরু করিয়াছে। নির্বোধ শিশু,—জানে না যে, তাহার কাকাবাবুর হাত দুইটা শক্ত লোহার কড়া দিয়া বাঁধা, কোলে লইবে কি, তখন তাহার নড়িবার শক্তি নাই! নিরুপায় কিশোরের চোখ দিয়া তখন দর্ দর্ করিয়া জল গড়াইতেছে!

চোর ধরা পড়িয়াছে ভাবিয়া পাশের একজন সেপাই কিশোরের পেটে এমন জোরে এক রুলের গুঁতা মারিল যে, যন্ত্রণায় সে একেবারে মুস্‌ড়াইয়া পড়িল।

এতক্ষণ পরে বিনোদের বোধ করি তাহা সহ্য হইল না। ছেলেটাকে কোল হইতে নামাইয়া দিয়া সে সিপাইটার কাছে গিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে চীৎকার করিয়া উঠিল,—'কে তোকে এমন করে' মারতে বললে ষ্টুপিড, ও যে আমার—'

ভাই কথাটা মুখ দিয়া বিনোদ বোধ করি উচ্চারণ করিতে পারিল না, সজলচক্ষে জমাদার সাহেবের দিকে তাকাইয়া বলিল, 'ওকে ছেড়ে দিন।'

কিশোরকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিয়া জমাদার সাহেব বিনোদের কাছে আগাইয়া গেলেন। বলিলেন, 'এতক্ষণ তবে কি আপনি আমাদের সঙ্গে তামাসা করছিলেন বিনোদবাবু?'

বিনোদ বলিল, 'তামাসা কি রকম?'

জমাদার সাহেব বলিলেন, 'হ্যাঁ চলুন, এইবার তাহলে আপনাকে থানায় যেতে হবে।'

'কে নিয়ে যেতে পারে কই দেখি!' বলিয়া কিশোর তাহার বিশাল বক্ষ এবং আজানুলম্বিত দুই বাহু প্রসারিত করিয়া দাদাকে তাহার আগলাইয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বেরিয়ে যাও তোমরা আমার বাড়ী থেকে, নইলে এক্ষুনি একটা খুনোখুনি করে' ফেলব, বলে দিচ্ছি। আমার রাগ ভারি খারাপ।'

'বিশ্বাস নেই, শালা গুণ্ডা!' বলিয়া সেপাই কয়জন ত' আগেই বাহির হইয়া গেল এবং তাহাদের পিছু পিছু জমাদার সাহেবও বাহির হইয়া যাইতে পথ পাইলেন না।

নারীজন্ম

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া বাধে।

ঝগড়া বাধিবার কারণ এমন বিশেষ কিছুই নয়। প্রায় দশ-বারো বৎসর তাহাদের বিবাহ হইয়াছে, অথচ সন্তানাদি এখনও হয় নাই। স্ত্রীর বিশ্বাস, কবচ-মাদুলী ধারণ করিলে ছেলে-মেয়ে যা-হোক একটা কিছু হইবেই হইবে, অথচ স্বামীর ধারণা—কবচ-মাদুলীতে কিছুই হয় না, ও-সব শুধু ফাঁকি দিয়া পয়সা আদায় করিবার ফন্দী।

কঙ্কাবতী বলে, 'আমাদের সেই পুতুলকে ত চেনো! বাবা ভৈরবনাথের মাদুলী নিয়ে পুতুলের হয়েছিল।'

অপূর্ব বলে, 'না নিলেও হ'তো।'

এ-রকম কথা সে অনেকবার শুনিয়াছে, তবু বলিতে ছাড়ে না। বলে, 'না বাপু, ঠাকুর-দেবতায় বিশ্বেস নেই, এমন মেলেচ্ছ ত আমি কখনও দেখিনি! একবারটি এনেই ছাখো না! না হয়, না হবে। তখন ত আর তোমায় আমি বলতে যাব না।'

হয়রান হইয়া গিয়া শেষে অপূর্ব বলে, 'আচ্ছা, তাই দেবো এনে।'

কিন্তু ওই মুখেই বলে আনিয়া দিবে, শেষ পর্যন্ত কাজে কিছুই করে না।

লজ্জায় ও-কথা বার-বার বলাও চলে না, অথচ না বলিলেও নয়। বাড়ীতে অন্য কোনও লোক নাই—যাহাকে দিয়া আনাইতে পারে। মা নাই, বাবা নাই, হিতৈষী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন কেহ কোথাও নাই, পোড়া তাহার এই অদৃষ্টের জন্য কঙ্কাবতী এক-এক দিন কাঁদিতে বসে।

অপূর্ব কতরকম করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করে। বলে, 'ছাখো, ছেলে হওয়া-না-হওয়া ভগবানের হাত। কেন তুমি এমন করছ বল ত? এই ত আমরা বেশ আছি দু'জনে।'

কঙ্কাবতী বলে, 'বেশ আবার কোথায় আছি? ছেলে দেখলেই আমার

বুকের ভেতরটা কেমন যেন ক'রে ওঠে। তাও যদি পরের একটা ছেলেও পেতাম ত তাই নিয়েই দিন কাটতো।'

আগে তাহাদের বাসা ছিল কলিকাতার একটা বড় রাস্তার উপর। কর্মব্যস্ত কোলাহলময়ী মহানগরীর কোন্ অতল তলায় তাহারা তলাইয়া থাকিত, কেহ কাহারও খবর রাখিত না। কিন্তু এবার তাহারা উঠিয়া আসিয়াছে ছোট্ট একটি গলির মধ্যে। গলিতে গাড়ী-ঘোড়া চলে না। পাথর দিয়া বাঁধানো বন্ধ গলি। দু'পাশে মাত্র সারি সারি কয়েকখানি বাড়ী। কোনোটি একতলা কোনোটি-বা দোতলা।

এত দিন ধরিয়া কঙ্কাবতী যাহা চাহিতেছিল, এ পাড়ায় আসিয়া তাহার তাহাও মিলিয়াছে।—আড়াই-তিন বছরের চমৎকার একটি ফুটফুটে ছেলে।

ছেলেটি দেখিতে এত সুন্দর যে, দেখিলেই তাহাকে ভালবাসিতেই ইচ্ছা করে।

প্রথম দিন তাহাকে সে কেমন করিয়া দেখে, সেই কথাই বলি।

সেদিন বৈকালে এক বিস্কুটওয়ালা আসিয়াছে বিস্কুট বেচিতে। পাড়ার ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তাহাকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। কঙ্কাবতী তাহার একতলা বাড়ীর জানালার পর্দাটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া তাহাই দেখিতেছিল। ছোট বড় নানান বয়েসী ছেলে-মেয়ে, বিস্কুট কিনিবার জন্য প্রত্যেকেই একটি করিয়া পয়সা লইয়া আসিয়াছে। কঙ্কাবতী ভাবিল, হায় রে অদৃষ্ট, তাহারও যদি এমনি একটা ছেলে থাকিত ত আজ সে তাহাকেও এমনই বিস্কুট কিনিতে পাঠাইত। ভাবিতে ভাবিতে সেই ছেলে-মেয়ের দলের মধ্যে হঠাৎ তাহার নজর পড়িল—অত্যন্ত সুন্দর একটি ছেলে চুপ করিয়া তাহাদের একপাশে দাঁড়াইয়া আছে। বিস্কুট লইয়া সকলেই একে-একে চলিয়া গেল। গেল না শুধু সেই ছেলেটি। হাতে তাহার পয়সা নাই এবং পয়সা না থাকিলে বিস্কুট যে পাওয়া যায় না, তা সে জানে। অত্যন্ত করুণ দৃষ্টিতে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া সে বিস্কুটওয়ালার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। কঙ্কাবতী তৎক্ষণাৎ একটি পয়সা লইয়া জানলার পথে হাত বাড়াইয়া ডাকিল, 'খোকা, নিয়ে যাও।'

নিঃসঙ্কোচে ছেলেটি আগাইয়া আসিল এবং হাত পাতিয়া পয়সা লইয়া গিয়া বিস্কুট কিনিল।

কঙ্কাবতী ভাবিয়াছিল, সে বিস্কুট লইয়াই চলিয়া যাইবে, কিন্তু আশ্চর্য, খোলা দরজার পথে ঘরে প্রবেশ করিয়া ছেলেটি তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং বিস্কুট দুইটি তাহার হাতের কাছে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, 'নিন্!'

এমন ছেলে কঙ্কাবতী কখনও দেখে নাই। হাসিয়া বলিল, 'আমি নিজের জন্যে আনিয়েছি নাকি রে ক্ষ্যাপা ছেলে? খাও, তুমি খাও, এইখানে ব'সে ব'সে খাও।'

তাহার পর দু'জনের কত কথা! কঙ্কাবতী কতক-বা বুঝিতে পারিল, কতক-বা পারিল না।

'তোমার নাম কি, বাবা?'

'পিন্টু পাপু।'

'পিন্টুবাবু?'

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া বলে, 'হ্যাঁ।'

'তোমার বাড়ী কোথায় পিন্টুবাবু?'

ছোট্ট একটি কচি আঙুল বাড়াইয়া পাশের বাড়ীখানি দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'উ—ই!'

কঙ্কাবতী তাহাকে কোলে লইয়া আদর করিয়া চুমা খাইয়া একবার এখানে দাঁড়াইল, একবার ওখানে দাঁড়াইল, কি যে করিবে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। স্বামী তাহার অনেকক্ষণ বাহির হইয়া গিয়াছে, এইবার ফিরিবে হয় ত। আজ সে পিন্টুবাবুকে দেখাইয়া তাহাকে অবাক্ করিয়া দিবে।

কাজেও ঠিক তাহাই হইল। কিছুক্ষণ পরেই অপূর্ব আসিল।

কঙ্কাবতীর কোলে এমন সুন্দর একটি ছেলে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কার ছেলে গো? আহা, বেশ ছেলেটি ত!'

কঙ্কাবতী হাসিয়া বলিল, 'নিজের ছেলে চিনতে পার না? এ যে আমার ছেলে গো! না পিন্টুবাবু?'

পিন্টুবাবু কি যে বুঝিল কে জানে, ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

'দেখলে?' বলিয়া দু'জনেই হাসিতে লাগিল।

পরিচয় তাহাদের আজকাল অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। কঙ্কাবতী হইয়াছে পিন্টুবাবুর কাকীমা, আর অপূর্ব হইয়াছে কাকাবাবু।

তবে কাকাবাবুর সঙ্গে ভাব হওয়া অবধি ছেলেটার পক্ষপাতিত্ব যেন তাহার উপরেই একটুখানি বেশি। কাকাবাবুর সঙ্গে বসিয়া বসিয়া ছবির বই যখন সে দেখে, তখন আর সে ভুলিয়াও তাহার কাকীমার দিকে ফিরিয়া তাকায় না।

অপূর্ব যে শুধু তাহাকে ছবি দেখায় তাহা নয়, মাঝে মাঝে কাগজের উপর ছবি তাহাকে আঁকিতেও হয়।

পিন্টু বলে, 'হাঁচ্ কৈ, হাঁচ্ ?'

পাতার পর পাতা উল্‌টাইয়া অপূর্ব হাঁসের সন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু হাঁস যখন কোথাও আর পাওয়া গেল না, তখন সে নিজেই একটা কাগজের উপর পেন্সিল দিয়া হাঁস আঁকিতে বসিল। একটা শেষ হইলে পিন্টু বলিল, 'আদেক্‌তা।'

অপূর্বকে আবার আর একটা আঁকিতে হইল।

আঁকিতে আঁকিতে হঠাৎ এক সময় অপূর্ব মুখ তুলিয়া দেখিল, দূরে দাঁড়াইয়া কঙ্কাবতী তাহাদের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। দু'জনের চোখোচোখি হইতেই কঙ্কাবতী হাসিয়া ফেলিল।

অপূর্ব বলিল, 'কি দেখছ অমন ক'রে ?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'দেখছি, কেমন মানিয়েছে।'

অপূর্ব বলিল, 'ছেলের সঙ্গে ত' আলাপ হলো, এইবার ছেলের মা'র সঙ্গে পরিচয়টা করো।'

কঙ্কাবতী তাহার কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিল, 'করেছি।'

'অত চুপি চুপি কেন ?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'দরজায় হয়ত দাঁড়িয়ে আছে। চব্বিশ ঘণ্টাই ওকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি ওইখানে।'

তা সে মিথ্যা বলে নাই। গলিতে ঢুকিলেই দেখা যায়, কালো রঙের পাতলা ছিপছিপে একটি মেয়ে চট্ করিয়া দরজার আড়ালে লুকাইয়া দড়াম্ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দেয়। ওই পিন্টুর মা,—উহারই নাম সুন্দরী !

তবে সুন্দরী নাম যে তাহার কেন রাখা হইয়াছিল, সুন্দরীকে দেখিয়া সহজে সে-কথা বুঝিবার উপায় নাই। গর্বের বস্তু শুধু তাহার এই ছেলেটি। এত সুন্দর ছেলে যে তাহার কোন দিন হইতে পারে, সে কথা সে নিজেও জানিত না। তাই মুখে তাহার ছেলের কথা চব্বিশ ঘণ্টা লাগিয়াই আছে।

'ছেলেটাকে ভাই সবাই ভালবাসে। ওই যে ঐখানে ওই লালরঙের বাড়ীটা আছে দেখেছ?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'না দিদি, আমি ত' বাড়ী থেকে বেরোই না। কেমন ক'রে দেখবো বল?'

সুন্দরী বলিল, 'বেরোতে হয় না ভাই, দরজায় দাঁড়ালেই দেখা যায়।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'তার পর?'

সুন্দরী বলিল, 'ঐ বাড়ীর যিনি মালিক—সেই কিশোরীবাবু ভাই পিন্টুকে আমার বড্ডো ভালবাসে। কাপড় দেয়, জামা দেয়, পয়সা-কড়ি এটা-সেটা ত হরদম দিচ্ছেই।'

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

সুন্দরী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'বিশ্বেস হ'লো না? চুপ ক'রে রইলে যে?'

কঙ্কাবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ছ্যাখো দেখি দিদি, বিশ্বাস কেন হবে না?'

সুন্দরী কিছুতেই থামিতে চাহিল না। বলিল, 'বরটি কোথায়? রয়েছে নাকি?'

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ।'

সুন্দরী বলিল, 'আচ্ছা, তবে আর-একদিন আসব। ব'সে ব'সে গল্প করা যাবে।'

শেষে একদিন সত্যই আসিল।

আসিয়াই ছেলের গল্প! পিন্টুকে কে কবে একজোড়া জুতা কিনিয়া দিয়াছিল, কখন সে একবার কাহার সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে গিয়া এই এ—ত বড় বড় পুতুল আনিয়াছিল—এই সব।

বলিল, 'ষ্টোভে তোমার এক পেয়ালা চা তৈরি কর না, ভাই। দুজনে খাওয়া যাক। খেতে খেতে গল্প করি।'

কঙ্কাবতী তৎক্ষণাৎ ষ্টোভ জ্বালিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিল।

সুন্দরী বলিতে লাগিল, 'সেই যে সেদিন কিশোরীবাবুর কথা বললাম না, ওই কিশোরীবাবুর বৌকে আমার পিন্টু বলে সই-মা। সইএর কাছে গিয়ে মাঝে মাঝে আমি ভাই চা খেয়ে আসি। সই কিন্তু আমাদের বয়েসী নয় ভাই, আমাদের চেয়ে অনেক বড়। মাগীর ছেলেপুলে হ'লো না!'

এই বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সুন্দরী বলিল, 'সেই জন্যেই ত পিন্টুকে ওরা অত ভালবাসে। তা ভাই, মাগীর হাতে পয়সা আছে। বাড়ীঘরদোর সবই নিজের। কে যে খাবে, তার ঠিক নেই।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'আছে হয়ত কেউ ভাইপো, ভাগ্নে। বিষয়-সম্পত্তি থাকলে খাবার লোকের ভাবনা!'

ঘাড় নাড়িয়া সুন্দরী বলিল, 'না ভাই, সে খবর আমি নিয়েছি। কেউ কোথাও নেই।'

এই বলিয়া সুন্দরী একটুখানি থামিয়া একবার এদিক ওদিক তাকাইল। তাহার পর আবার বলিতে শুরু করিল, 'তা ভাই, তোমরা দুটিতে বেশ আছ। ছেলেপুলে হয় নি, তাই জানো না, নইলে হ'লে একবার বুঝতে মজা! ছেলে হওয়ার ভাই অনেক জ্বালা। এ কেমন একেবারে ঝাড়া-হাত-পা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, খাও-দাও ফুর্তি কর। আর আমার দ্যাখো-দেখি, চার-চারটে দেওর, কাজ নেই কর্ম নেই, বিধবা মেয়ের মত দুবেলা খাচ্ছে আর ঘুমোচ্ছে।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'ছেলের ঝঞ্ঝাট ত তোমাকে পোয়াতে হয় না দিদি। ছেলে ত দেখছি মা-ছাড়া যার-তার কাছে বেশ থাকে।'

ঠোঁট উল্টাইয়া সে এক অপরূপ মুখভঙ্গী করিয়া সুন্দরী বলিল, 'তা আর থাকতে হয় না! ভাল যে বাসে না, তার কাছে কই এক দণ্ড থাকুক দেখি! তোমরা ভালবাসো, তোমাদের কাছে থাকে।—তা ভাই, মিছে কথা বলব কেন, তোমাদের ও বড্ডো ভালবাসে। বাড়ী গিয়ে অবধি শুধু কাকাবাবু আর কাকাবাবু, কাকীমা আর কাকীমা—'

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

সুন্দরী বলিল, 'কেন, চুপ ক'রে রইলে যে? ভাল বাসে না?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'ও ছেলের আবার ভালবাসা, দিদি! ও দুদিন বাদেই ভুলে যাবে।'

সুন্দরী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না ভাই, ও ভোলে না। ওই যে ওই কাঁঠালগাছ-ওলা বাড়ীটা, ওই বাড়ীতে একজন ভাড়াটে এসেছিল ভাই, লোকটি ভারি ভালমানুষ, বাপ না কে ম'রে গেল, তাই দেশে চ'লে গেল। পিন্টুকে আমার সে-মিন্‌সেও খুব ভালবাসতো, বুঝলে? পিন্টু তখন আরও ছোট। সে একদিন পিন্টুকে না বাজারে নিয়ে গিয়ে পায়ের জুতো থেকে আরম্ভ ক'রে কোট, পেন্ট্‌লু, মায় মাথার একটা টুপি পর্যন্ত দিলে কিনে। পিন্টু সে কথা আজও ভোলেনি ভাই, ওর মনে আছে, আশ্চয্যি কাণ্ড!—দ্যাখো, তোমার চায়ের জল হয়ত ফুটছে।'

ষ্টোভ নিবাইয়া দিয়া কঙ্কাবতী চা তৈরি করিতে বসিল।

সুন্দরী কিন্তু তখনও থামিল না। বলিল, 'আজ না দাও, তোমরাও ত' একদিন ওকে জামা-কাপড় সবই দেবে, তখন ও আর কিছুতেই ভুলবে না ভাই, তুমি দেখো।'

প্রকাশ্যে কঙ্কাবতী হাসিতে পারিল না, কিন্তু এ-সব শুনিয়া মনে-মনে মানুষের হাসিবারই কথা।

চায়ের পেয়ালাটি সুন্দরীর হাতের কাছে আগাইয়া দিয়া কঙ্কাবতী বলিল, 'খাও দিদি।'

ভাবিল, এবার বুঝি সে থামিবে।

অথচ চা তাহার ঠাণ্ডা জল হইয়া গেল, কথা কিন্তু তখনও ফুরাইল না।

এমন সময় বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'কে?'

'আমি। খোলো!'

অপূর্ব আসিয়াছে।

সুন্দরীর সম্মুখে কঙ্কাবতী দরজা খুলিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। কিন্তু সুন্দরীই আগে বলিয়া উঠিল, 'দাও না খুলে ভাই, ঠাকুরপোর সামনে বেরোব, কথা বলব, তাতে আর লজ্জা কিসের? আমার ভাই, ও সব বালাই নেই।'

কঙ্কাবতী দরজা খুলিয়া দিল।

অপূর্বই লজ্জিত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল, সুন্দরী কিন্তু নিঃসঙ্কোচে হাসিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাতে তোমার ও কি জিনিস, ঠাকুরপো ?'

অপূর্ব্ব থমকিয়া দাঁড়াইল। হাতে তাহার একটি খেলনার হাঁস। দেখিতে অবিকল জীবন্ত হাঁসের মত। দম দিয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিতেই হাঁসটা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। বলিল, 'পিন্টুর জন্যে কিনে আনলাম।'

সুন্দরী বলিল, 'দাম নিশ্চয়ই অনেক নিয়েছে ? এ-সব ঠুনকো জিনিস কি জন্যে আনলে ঠাকুরপো ? এ ত' ও এক্ষুনি হাতে পাবা মাত্র দেবে ভেঙে ! তার চেয়ে ওই দামে ওর একটা সিল্কের জামা হ'তো।'

পিন্টুর জন্য চমৎকার একখানি সিল্কের জামাও অপূর্ব আনিয়া দিয়াছে। ভাল ভাল পাখী, কুকুর, হাঁস, কত মজার মজার খেলনা, পেট টিপিলেই কথা কয়, স্প্রিংএ দম দিলেই চলিতে আরম্ভ করে,—সে সব ত ধরিতে গেলে রোজই আসে।

প্রত্যহ অতি প্রত্যূষে ঘুম ভাঙিতেই পিন্টু তাহার কাকাবাবুর বিছানার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। ঘুমন্ত অপূর্বর গায়ে হাত দিয়া ডাকে, 'কাকাবাবু!'

হাসিয়া হাত বাড়াইয়া অপূর্ব তাহাকে তাহার বুকের কাছে টানিয়া আনে। আদর করিয়া চুমা খাইয়া তৃপ্তি যেন তাহার আর কিছুতেই হয় না।

শয্যাত্যাগ করিয়া অপূর্ব বলে, 'আমি মুখ-হাত ধুয়ে আসি, তুমি ততক্ষণ তোমার কাকীমার সঙ্গে গল্প কর।'

পিন্টু তাহার কাকীমার কাছে গিয়া বসে।

তাহার পর অপূর্বর সঙ্গে বসিয়া পিন্টু চা খায়, বিস্কুট খায়, হাসে, গল্প করে, ছবি দেখে, খেলা করে। দু'জনেই খেলা করিতে করিতে এত বেশি উন্মত্ত হইয়া ওঠে যে, অপূর্বকে বাজার যাইতে হইবে, সে কথা তাহার আর মনেই থাকে না।

কঙ্কাবতী বলে, 'ওঠো, বাজারে যাও, না ওর সঙ্গে খেলা করেই দিন তোমার কাটবে ?'

পিন্টু ঝোঁক ধরিয়া বসে, কাকাবাবুর সঙ্গে সেও বাজারে যাইবে। বড়

রাস্তার উপর বাজার। চারিদিকে গাড়ী-ঘোড়া লোকজনের হট্টগোল। এই এতটুকু ছেলেকে লইয়া বাজারে গেলে তাহাকে সামলাইতেই সময় যাইবে। অনেক করিয়া বুঝাইয়াও অপূর্ব কিছুতেই তাহাকে বুঝাইতে পারে না। শেষে বাধ্য হইয়া বলে, 'চল তবে নিয়েই যাই।'

শেষে এমন হয় যে, প্রত্যহই তাহাকে বাজারে লইয়া যাইতে হয়।

পিন্টুকে বুকে করিয়া বাজারের থলি হাতে অপূর্ব সেদিন বাড়ী ফিরিল —বেলা তখন প্রায় এগারোটা। কঙ্কাবতীর উনান তখন কতবার যে পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে, আবার কতবার যে নূতন করিয়া কয়লা দিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

'হ্যাগা, আমি ত' ভেবে ভেবে মরি! আজ এত দেরি হ'লো যে?'

পিন্টুকে কোল হইতে নামাইয়া অপূর্ব বলিল, 'নাঃ, কাল থেকে আর তোমায় নিয়ে যাচ্ছি না।'

কঙ্কাবতী দেখিল, অপূর্বর নূতন জামার হাত দুইটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা কবিল, 'নতুন জামা ছিঁড়লো কেমন ক'রে? কই যাবার সময় ত' ছেঁড়া ছিল না!'

অপূর্ব বলিল, 'মারামারি করলাম একটা লোকের সঙ্গে। ব্যাটাকে খুব মেরেছি। আর সেই মারতে গিয়েই জামাটা গেল ছিঁড়ে।'

'সে কি গো! কেন?'

'কেন! জুতো পায়ে দিয়ে ব্যাটা তাকিয়ে পথ চলে না, পিন্টুর পা'টা দিয়েছিল মাড়িয়ে!'

'জুতো দিয়ে মাড়িয়ে দিয়েছে! পায়ে তা হ'লে লেগেছে বল? কই দেখি বাবা।' বলিয়া কঙ্কাবতী পিন্টুর পা দুইটি দেখিতে যাইতেছিল। অপূর্ব বলিল, 'মাড়ায় নি। আর একটু হলেই মাড়াতো।'

কঙ্কাবতী ঈষৎ হাসিয়া বাজারের জিনিসপত্র বাছিতে বসিল। যে স্বামী তাহার, কাহাকেও জোর করিয়া একটা কথা বলিতে পারে না, সে-ই আজ একটা অতি তুচ্ছ কারণে মারামারি করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে!

পিন্টুকে খাওয়াইয়া তাহার মা'র কাছে পাঠাইয়া দিয়া কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাগা, ছেলেটাকে তুমি খুব ভালবেসে ফেলেছ, না?'

অপূর্ব থতমত খাইয়া কি যে জবাব দিবে খুঁজিয়া পাইল না। বলিল, 'ওকে দেখলেই ত' ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কেন, তুমি ভালবাস না ?'

আর কিছু না বলিয়া কঙ্কা চলিয়া যাইতেছিল, অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, 'ও কথা কেন জিগ্যেস করলে বল ত ?'

কঙ্কাবতী ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'এমনি।'

কিন্তু ছেলেটাকে অপূর্ব সত্যই ভালবাসিয়াছে। বেশিক্ষণ আজকাল সে আর বাড়ীর বাহিরে থাকে না। ফিরিয়া আসিয়াই জিজ্ঞাসা করে, 'আমায় দেখতে না পেয়ে ছেলেটা খুব কাঁদছিল, না ?'

কঙ্কাবতী বলে, 'না, কাঁদবে কেন ? জিগ্যেস করছিল, কোথায় গেল কাকাবাবু ?'

'হ্যাঁ, খুঁজেছিল তা হ'লে বল। খুঁজবেই ত'। ও যা ছেলে, কাকাবাবু কাকাবাবু করেই অস্থির।'

কঙ্কাবতী বলে, 'কিন্তু কি হবে ভালবেসে ? একে ত পরের ছেলে, তায় আবার আমাদের বাসা-বাড়ী, আজ আছি কাল নেই।'

'হুঁ' বলিয়া কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অপূর্ব বলে, 'শেষ পর্যন্ত এ বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া আমাদের ভারি মুশকিল হবে দেখছি।'

কঙ্কাবতী বলে, 'অথচ এবাড়ী আমাদের ছাড়তেই হবে।'

'কেন ?'

'কেন আবার! উঠোনটা সিমেণ্ট ক'রে দেবার কথা ছিল, তা ত দিলে না, জলের কলটায় জল ভাল আসে না, তা ছাড়া বর্ষাকাল আসছে, একতলা বাড়ীতে থাকলে বেরিবেরি হবে দেখো।'

অপূর্ব হাসিয়া বলে, 'পাগল, তাই আবার হয় নাকি ? কত বড় বড় লোক একতলা বাড়ীতে থাকে।'

এমনই করিয়া বাড়ী সম্বন্ধে কোনও কথা বলিলেই অপূর্ব হাসিয়া উত্তর দেয়। আর অপূর্ব যতই হাসিয়া উড়ায়, কঙ্কাবতী ততই দোষ বাহির করিতে থাকে।

বলে, 'ঝি আজ আসবে না ব'লে গেছে, ওই রইল প'ড়ে তোমার ওই বাসনের গাদা কলতলায়। মাজতে আমি পারব না।'

অপূর্ব বলে, 'কেন গো, এত রাগ কেন ?'

'রাগ হবে না? এমন বাড়ী নিলে শেষকালে যে, কলে জল পর্যন্ত আসে না। ছির্-ছির্ ক'রে এমনি সরু ধারায় জল পড়ছে।'

মিস্ত্রী ডাকিয়া কলটা সেই দিনই অপূর্ব ঠিক করিয়া দিল।

কঙ্কাবতী তখন ক্রমাগত উঠানের উপর হোঁচট খাইতে থাকে। বলে, 'বাবা রে বাবা! কলকাতা শহরে যে এমন বাড়ী থাকতে পারে, তা আমার ধারণা ছিল না। খোয়ায় আমার পা একেবারে গেল! একজোড়া জুতো এনে দিও, পায়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াব।'

কোন দিন বা দরজা-জানালার কপাটগুলো ঠুকিয়া ঠুকিয়া ভাঙিয়া ফেলিতে চায়।—'যেমন বাড়ী, তার তেমনি কপাট! বর্ষার জল খেয়ে খেয়ে এমনি হাঁ হয়ে গেছে যে, জোড়ে-জোড়ে লাগতে পর্যন্ত চায় না।'

অপূর্ব দেখে আর হাসে।

কঙ্কাবতী বলে, 'হুঁ, তা হাসবে বই কি! আমার হয়েছে মরণ! দেখবে তোমার বাড়ীর গুণ?'

বলিয়া হন্ হন্ করিয়া কঙ্কাবতী ভাঁড়ার-ঘর হইতে চিনির টিনটা আনিয়া অপূর্বর পায়ের কাছে নামাইয়া দিয়া বলে, 'দ্যাখো।'

চিনিতে পিঁপড়া ধরিয়াছে। অপূর্ব বলে, 'কি দেখব?'

'কেন, দেখতে পাচ্ছ না? আদ্ধেক জিনিস ত' পিঁপড়েতেই খেয়ে ফেললে।'

'সেও কি বাড়ীর দোষ নাকি?'

কঙ্কাবতী বলে, 'তা তুমি জানবে কেমন ক'রে বল? হালদারপাড়ার বাড়ীতে আমাদের একটা পিঁপড়ে ছিল? আর শুধু কি পিঁপড়ে নাকি? ইঁদুর দেখেছ এ বাড়ীতে? এক-একটি ইঁদুর এই এ্যা—ত বড়-বড় ঠিক, একএকটি বেড়ালের মত। প্লেগ হলেই বুঝবে মজা!'

এবার অপূর্ব হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে।—'সে কি গো! কলকাতায় প্লেগ হবে কি?'

কঙ্কাবতী বলে, 'কেন, শরৎবাবুর শ্রীকান্ত বই-এ পড়নি? ইঁদুর থাকলে প্লেগ হয়! হবে যখন, তখন এবাড়ী ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না।'

এই বলিয়া সে চিনির টিনটা লইয়া আবার তেমনি হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যায়।

তাই বলিয়া কঙ্কাবতী যে পিন্টুকে ভালবাসে না, তাহা নয়।

অপূর্ব হয় ত বাড়ীতে নাই, এমন সময় পিন্টুর কচি গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, 'কাকীমা, দদ্দা খোলো!'

তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া দিয়া কঙ্কাবতী দরজা খুলিয়া তাহাকে ঘরে আনিল। ঘরে আজকাল ছেলে ভুলাইবার কোনও বস্তুরই অভাব নাই। হাতের কাছে তাহার ছবির বই খুলিয়া ছবি দেখাইতে দেখাইতে কঙ্কাবতী চুপি-চুপি ডাকে, 'পিন্টু!'

'উঃ।'

কঙ্কাবতীর ধারণা, ছোট ছেলে তাহার মুখ দিয়া যাহা বলে, অনেক সময় তাহাই সত্য হইয়া ফলিয়া যায়, তাই সে তাহার মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করে, 'আমার কবে ছেলে হবে বল ত বাবা!'

পিন্টু কিছুই বুঝিতে পারে না, ছবির বইয়ের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে বলে, 'থেলে দেখব।'

ছোট একটি ছেলের ছবি বাহির করিয়া কঙ্কাবতী বলে, 'এই ছেলে আমার হবে, না পিন্টু?'

পিন্টু বলে, 'না, আমাল্ হবে।'

'দূর হাবা ছেলে! এসো, তোমায় ছেলে দেখাই।' বলিয়া পিন্টুকে কোলে লইয়া কঙ্কাবতী দেওয়ালের বড় আরশিটার কাছে গিয়া দাঁড়ায়। বলে, 'ও কে রে?'

আঙুল বাড়াইয়া পিন্টু তাহার নিজের চেহারাটিকে দেখাইয়া বলে 'পিন্টু পাপু'। বলিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে থাকে।

কঙ্কাবতী ঘুরিয়া ফিরিয়া নানারকম করিয়া নিজেকেই বারে বারে দেখে আর ভাবে, এই ছেলে আজ যদি তাহার নিজের ছেলে হইত!—'এমনি একটি পিন্টুবাবু আমারও হবে, না পিন্টু?'

কি জানি কি ভাবিয়া পিন্টু বলিয়া বসে, 'হ্যাঁ।'

আনন্দে কঙ্কাবতী তখন পিন্টুকে তাহার বুকের উপর চাপিয়া ধরে। চাপিয়া ধরিয়া মুখে তাহার সশব্দে একটি চুমা খায়।

অপূর্বর দালালীর কাজ। আফিসের কেরানীর মত ঠিক দশটার সময়

বাড়ী হইতে সে বাহির হয় না। কিন্তু যখন হউক বাহির তাহাকে বাড়ী হইতে একবার হইতেই হয়। অথচ এই বাহির হইবার সময় প্রত্যহ পিন্টুকে লইয়া কি বিপদে যে পড়ে, তাহা আর বলিবার নয়। ছোট ছেলে, না বুঝিয়া নির্বোধের মত কাকাবাবুর সঙ্গে যাইবার জন্য প্রতিদিন সে কাঁদিতে শুরু করে। কোনওদিন-বা অপূর্বকে চোরের মত লুকাইয়া পালাইতে হয়, আবার কোন দিন কঙ্কাবতী দয়া করিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখে।

সেদিন অমনি অনেক কষ্টে অপূর্ব বাহির হইয়া গিয়াছে, পিন্টুকে কোলে লইয়া কঙ্কাবতী কিছুতেই আর ভুলাইতে পারিতেছিল না। বাসিনী-ঝি দূরে বসিয়া বাসন মাজিতেছিল, বলিল, 'দাও দিদিমণি, ওকে তা হ'লে আমার কাছে দাও, আমি হনু-বুড়োকে ধরিয়ে দিয়ে আসি।'

হনু-বুড়োর নামে পিন্টু চুপ করিল।

কঙ্কাবতী বলিল, 'এইবার তুমি এইখানে ব'সে ব'সে ছবি ভাখো পিন্টু, আমি ততক্ষণ তোমার এই জামাটা সেলাই ক'রে ফেলি। কেমন?'

পিন্টু ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'না।'

কঙ্কাবতীর গলাটা সে দুহাত দিয়া জড়াইয়া ধরিল। নিচে সে কিছুতেই বসিবে না।

বাসিনী অনেকক্ষণ হইতেই এই দিকে মুখ ফিরাইয়া ফিরাইয়া দেখিতেছিল। বলিল, 'বেশ মানিয়েছে দিদিমণি! এমনি যদি তোমার একটি হ'তো! আচ্ছা, হাঁ দিদিমণি, তোমার কি একেবারেই হয় নি?'

হয় নাই সত্য। কিন্তু সেই সত্য কথাটা বলিতে কঙ্কাবতীর লজ্জায় যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল। বলিল, 'হয়েছিল বাসিনী, হয়েই ম'রে গেছে। বাঁজা আমি নই।'

বলিতে গিয়া চোখ দুইটা জলে ভরিয়া আসিল।

বাসিনী বলিল, 'আমারও এক বোনঝির, দিদিমণি, ঠিক তোমার মত। একটি হয়ে সেই যে ম'রে গেছে, তার পর আর হয় নি। বাবা তারকনাথের মাদুলী দিলাম, অনেক জায়গায় অনেক কিছু করলাম, দিদিমণি! এইবার সবুষেবাড়ীর ওষুধ দিয়েছি, পেয়ারাপাতার সঙ্গে বেটে খেতে হয়, তিন দিন আঁশ অম্বল বন্ধ। দেখি কি হয়।' বলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাসিনী আবার জিজ্ঞাসা করিল, 'দিদিমণির মা আছে?'

কঙ্কাবতী ঘাড় নাড়িল,—'না।'

'দিদি ?'

'না।'

বাসিনী বলিল, 'তবে আর ও-সব কে করবে বল দিদিমণি। মা বেঁচে থাকলে এত দিন হয় ত' তোমায় কত ওষুধ খাওয়াতো।'

এমন সময় ওদিকের বারান্দার রেলিং ধরিয়া সুন্দরী আসিয়া দাঁড়াইল।—'কি কথা হচ্ছে গো তোমাদের ?'

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল। বাসিনী বলিল, 'দিদিমণির অম্‌নি একটি ছেলের কথা হচ্ছে, মা।'

সুন্দরী বলিল, 'আ! ছেলে ছেলে আর করিস্‌ নি মা, ছেলের জ্বালা আমি বুঝি। আমারও যদি না হতো ত আমি আর চাইতাম না বাছা, পরের ছেলে মানুষ করতাম।'

বাসিনী একবার সেই দিক পানে মুখ তুলিয়া তাকাইয়া দেখিল সে গিয়াছে কিনা, তাহার পর চুপি-চুপি বলিল, 'দেখলে দিদিমণি, শুনলে ওর কথা ? ছেলেটা ও তোমাকে দিয়ে মানুষ করিয়ে নিতে চায়।'

এ সহজ কথাটুকু বাসিনীও বুঝিয়াছে। কঙ্কাবতী বলিল, 'চুপ !'

বাসিনী চুপ করিল না। বলিল, 'কি যে বল দিদিমণি তার ঠিক নেই। আমি চুপ করবার মানুষ নই দিদিমণি। পাঁচসিকে পয়সা দিও, আমি তোমায় সর্‌ষেবাড়ীর ওষুধ এনে দেবো, পেয়ারাগাছ আমাদের বাড়ীতেই আছে।'

তাহার পর বাসন মাজিয়া বাসিনী চলিয়া যাইতেছিল। বলিল, 'দরজাটা ভেজিয়ে দাও দিদিমণি।'

কঙ্কাবতী দরজা বন্ধ করিতে গিয়া চুপি-চুপি ডাকিল, 'বাসিনী, শোনো !'

'আমায় ডাকছ, দিদিমণি ?'

'হ্যাঁ ডাকছি।' বলিয়া দু'টি টাকা তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া একটা ঢোক গিলিয়া কঙ্কাবতী একবার এদিক ওদিক তাকাইয়া ঠিক চোরের মত চুপি-চুপি বলিল, 'তোমার সর্‌ষেবাড়ীর ওষুধ আমায়—'

বাকি কথাটা সেও আর শেষ করিতে পারিল না, বাসিনীরও আর জানিবার প্রয়োজন হইল না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল 'বুঝেছি, দিদিমণি।'

রাত্রিতে সে দিন আহারাদির পর অপূর্ব বিছানায় শুইয়া ছিল। ঘরের কাজকর্ম সারিয়া কঙ্কাবতীও খাটের উপর স্বামীর কাছে গিয়া বসিল। বলিল, 'আজ একটা ভারী মজা দেখলাম। পিন্টু কিছুতেই যেতে চায় না, তবু ওর কাকা আজ ওকে কাঁদাতে কাঁদাতে তুলে নিয়ে গিয়ে দিয়ে এলো ওর সই-মার কাছে।'

অপূর্ব বলিল, 'সই-মা ওকে ভালবাসে না, ভালবাসে ওই কিশোরীবাবু। পিন্টুর মা ভাবে, বুড়ো বুঝি ওর বাড়ীখানা পিন্টুকেই দিয়ে যাবে, তাই ওকে ও জোর ক'রে ওখানে পাঠিয়ে দেয়।'

কোন কথা না বলিয়া অপূর্ব একটু হাসিল মাত্র।

কঙ্কাবতী বলিল, 'তুমি আর ওরকম ক'রে ভালবেসে ছেলেটাকে ধ'রে রেখো না। বুঝলে? ওতে ওর মা হয়ত রাগ করে। ভাবে বাড়ীটা যদি-বা পেতো ত তোমার জন্যেই হয়ত পাবে না।'

অপূর্ব এবারেও শুধু হাসিল।

'না গো হাসি নয়, সত্যি।'

অপূর্ব বোধ হয় রাগ করিয়াই বলিল, 'তা হ'লে কি করতে হবে শুনি? মেরে তাড়িয়ে দিতে হবে?'

'তাই কি আমি বলছি নাকি?

'না বললেও মতলব তোমার আমি বুঝতে পারি।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'ছাই পারো।'

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল।

কঙ্কাবতী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিয়া বলিল, 'ঘুমোলে নাকি?'

অপূর্ব বলিল, 'না।'

'বল—কি বুঝতে পার।'

অপূর্ব বলিল, 'তোমার ইচ্ছে, ছেলেটাকে আমি যেন না ভালবাসি। বল—সত্যি কিনা?'

ঘাড় নাড়িয়া কঙ্কাবতী বলিল, 'হ্যাঁ, সত্যি। কিন্তু কেন বল দেখি?'

'কেন আবার। পরের ছেলে, কোন্ দিন হয়ত আমরাই চ'লে যাব, তখন কষ্ট পেতে হবে। কেমন, এই না?'

কঙ্কাবতী মাথা হেঁট করিয়া স্বামীর হাতের আংটিটি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, 'না। আমার কষ্ট হয়। মনে হয়, আমার ছেলে হ'লো না ব'লেই—'

অপূর্ব চোখ বুজিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। খানিক পরেই তাহার হাতের উপর টপ্ করিয়া এক ফোঁটা জল পড়িতেই সে চোখ চাহিয়া হাত বাড়াইয়া কঙ্কাবতীর মুখখানি তুলিয়া ধরিতেই দেখিল, সে কাঁদিতেছে। বলিল, 'এ কি! তুমি কাঁদছ, কঙ্কা?'

আঁচলে চোখ মুছিয়া কঙ্কা বলিল, 'না।'

বলিয়াই সে তাহার স্বামীর বুকের কাছে লুটাইয়া পড়িল।

পিন্টুকে এমন করিয়া ভালবাসিলে কঙ্কাবতীর যে কষ্ট হয়, তাহার যে সন্তানাদি হয় নাই, সেই কথাটাই বেশি করিয়া মনে পড়ে, অপূর্ব তাহা বুঝিয়াছে; এবং বুঝিয়াছে বলিয়াই সেই দিন হইতে পিন্টুর জন্য যাহা কিছু সে কিনিয়া আনে, কঙ্কাবতীর সম্মুখে তাহা সে পিন্টুর হাতে দিতে পারে না। আড়ালে ঘরের বাহিরে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলে, 'চট্ ক'রে এইটি নিয়ে গিয়ে তোমার বাড়ীতে রেখে এসো। নইলে ভেঙ্গে যাবে। যাও।'

পিন্টু সেটি তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া আনন্দে লাফাইতে লাফাইতে আবার ফিরিয়া আসে। সম্মুখে কঙ্কাবতীকে দেখিবামাত্র তাহার পা দুইটা দু'হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া বলে, 'দেখে এলুম।'

'কি দেখে এলে, বাবা?'

পিন্টু বলে, 'মোটোরকার।'

কঙ্কাবতী বুঝিতে না পারিয়া বলে, 'বেশ। আজ আমরা মোটরে চ'ড়ে বেড়াতে যাব।'

'তবে নিয়ে আচি।' বলিয়া পিন্টু আবার তাহাদের বাড়ীর দিকে ছুটিতে থাকে; এবং কিয়ৎক্ষণ পরে টিনের একটি রং-করা মোটরকার আনিয়া কাকীমার কাছে নামাইয়া দিয়া বলে, 'চলো।'

অপূর্ব তখন বাড়ীর বাহির হইয়া গিয়াছে। কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'এ গাড়ী তোমার কখন এলো বাবা? কে দিলে?'

পিন্টু বলিল, 'কাকাবাবু ডিলে।'

কঙ্কাবতী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

অপূর্ব আসিবামাত্র কঙ্কাবতী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমায় একটা মোটরগাড়ী এনে দিতে পার?'

'কেন?'

'পিন্টুকে দেবো।'

ব্যাপার যে কি ঘটিয়াছে, অপূর্ব তাহা বুঝিতে পারিল। বলিল, 'ওটা যে এনেছি, তা আমার মনেই ছিল না কঙ্কা, তাই বাড়ী থেকে বেরোবার সময় ওটা তার হাতে দিয়ে চ'লে গেলাম।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'বুঝতে তা হ'লে পেরেছ?'

'কি বুঝতে পেরেছি?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'আমায় লুকিয়ে দেওয়া তোমার অন্যায় হয়েছে।'

অপূর্ব বলিল, 'লুকিয়ে ত দিই নি।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'দিয়েছ। কিন্তু আর যেন দিও না। ওতে ভাবছ, আমি সুখে থাকব, কিন্তু না, ওতে কষ্ট আমার আরও বাড়বে। যা দেবে, দেখিয়েই দিও।'

এই কথার পর পিন্টুকে কিছু দেওয়া একরকম বন্ধই হইয়া গেল। অপূর্ব আর বাজার হইতে তাহার জন্য কিছুই কিনিয়া আনে না। পিন্টু ঘরে আসিয়া ঢুকিলে অপূর্ব প্রাণপণে নিজেকে তাহার কাছ হইতে সরাইয়া রাখে। একান্তই পিন্টু যখন 'কাকাবাবু' বলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসে, দু'হাত বাড়াইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ছবি দেখিতে চায়, তখন আর সে কোনও প্রকারেই নিজেকে বিমুখ করিয়া রাখিতে পারে না, কঙ্কাবতীর দিকে একবার তাকাইয়া বলে, 'ওগো দেখেছো? এ আমি কি করি বল দেখি?'

এই বলিয়া পিন্টুকে সে তাহার বুকের উপর জড়াইয়া ধরিয়া তাহার সেই সুকোমল সুন্দর মুখখানির দিকে, সেই কাচের মত স্বচ্ছ সুগভীর চঞ্চল দুটি ঘনকৃষ্ণ চক্ষু-তারকার দিকে একাগ্র মুগ্ধ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিয়া তাহার সেই আরক্তিম ওষ্ঠপ্রান্তে একটি চুম্বন করিয়া বলে, 'যাও, এবার তুমি তোমার কাকীমার কাছে যাও।'

কিন্তু পিন্টু সেখানে কিছুতেই সহজে যাইতে চায় না, কাকাবাবুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহারই কাঁধে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এমনি করিয়াই দিন চলে।

এক এক দিন সব-কিছু ভুলিয়া গিয়া পিন্টুকে লইয়া ছেলেমানুষের মত খেলা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া অপূর্ব ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেয়। শেষে কঙ্কাবতী যখন তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, তখন হঠাৎ তাহার সেদিনের সেই কথাটা মনে পড়িয়া যায়। মনে পড়ে, নিঃসন্তান কঙ্কাবতীর শুষ্ক ম্লান মুখখানি, তাহার সেই ব্যাকুল মিনতি, আর আকুল ক্রন্দন।—সত্যই ত! পাগলের মত এ কি সে করিতেছে? বলে, 'হ্যাঁ, এইবার হয়েছে পিন্টু, অনেক খেলা হয়েছে, আর খেলে না। যাও, তুমি তোমার মা'র কাছে যাও।'

ছেলেটার মুখখানা নিমেষেই কেমন যেন ম্লান হইয়া ওঠে, অভিমানক্ষুব্ধ দুটি কাতর চক্ষু তুলিয়া অপূর্বর মুখের পানে কেমন যেন একরকম করিয়া চাহিয়া থাকে।

কঙ্কাবতী বলে, 'হ্যাঁগা, তা হ'লে ও-সব তুমি আমার মন ভোলাবার জন্যে বল, না?'

অপূর্ব মুখ তুলিয়া বলে, 'কি সব?'

কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে কঙ্কাবতীর প্রথমে লজ্জা করে, তাহার পর একটুখানি ইতস্ততঃ করিয়া ধীরে ধীরে বলে, 'এই যে বল, তোমার ছেলে না হ'লে কোনও দুঃখু নেই···'

'হ্যাঁ, নেই-ই ত! নাই বা হ'লো ছেলে।' বলিতে বলিতে পিন্টুর হাতে ধরিয়া তাহাকে সেখান হইতে উঠাইয়া দিয়া অপূর্ব বলে, 'চল, তোমায় দিয়ে আসি। বড্ডো বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে, চল।' বলিয়া তাহাকে ঘরের বাহির করিয়া দিয়া দরজাটা অপূর্ব তাহার মুখের উপরেই ধড়াস্ করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়।

অপূর্বর জামা-কাপড় গুছাইতে গিয়া কঙ্কাবতী দেখিল, সাদা জামার গায়ে অসংখ্য লাল লাল পিঁপড়া উঠিয়াছে। কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া তাহার পকেট হইতে বাহির করিল একটা কাগজে মোড়া কয়েকটি 'লজেঞ্জ'। পিন্টুর জন্য আনিয়া হয়ত তাহা আর কঙ্কাবতীর ভয়ে দিতে পারে নাই।

মোড়কটি কঙ্কাবতী পকেট হইতে বাহির করিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া পিঁপড়া তাড়াইতেছিল, এমন সময় গুট্-গুট্ করিয়া পিন্টু আসিয়া হাজির!

মুখ তুলিয়াই কঙ্কাবতী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দরজা বন্ধ ছিল, কেমন ক'রে এলি? কে খুলে দিলে?'

পিন্টু বলিল, 'কাকাবাবু।'

'কোথায় তোর কাকাবাবু?'

কচি কচি হাতের ছোট্ট একটি আঙুল বাড়াইয়া পিন্টু কলতলাটা দেখাইয়া দিল। বলিল, 'ওই যে!'

অপূর্ব তখন কল-ঘরে গিয়া ঢুকিয়াছে।

বাহিরে আসিতেই কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, ও কখনই-বা ডাকলে আর তুমি কখনই-বা দরজা খুলে দিলে? কই, ওর ডাক ত আমি শুনতে পাই নি!'

অপূর্বই কি শুনিত পাইয়াছিল নাকি? ও-বেলা যাহাকে এমন করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে, এ-বেলায় সে যদি আবার না ডাকিতেই আসিয়া দাঁড়ায় ত তাহার জন্য দরজা তাহাদের খুলিয়া রাখা উচিত ভাবিয়াই সে অন্যমনস্কের মত বন্ধ দরজাটি হঠাৎ খুলিতে গিয়াই দেখে, নিতান্ত অপরাধী চোরের মত ছেলেটা চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

স্বামী তাহার কোনও কথা বলিতেছে না দেখিয়া কঙ্কাবতী বলিল, 'কাজকর্ম সবই ত তোমার গেছে! এখন আমি বুঝতে পারছি, কি আছে আমার কপালে শেষ পর্যন্ত।'

কথাটা শুনিবামাত্র অপূর্বর সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। কাহার উপর রাগ করিয়া জানি না, সে তাহার বসিবার ঘরে গিয়া একটা বই খুলিয়া চুপ করিয়া বসিল।

এমন সময় শুনিল, পাশের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়াইয়া কে একটা লোক যেন জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'কে রয়েছেন মশাই বাড়ীতে?'

অপূর্ব উঠিয়া গিয়া বলিল, 'কেন?'

দেখিল, জানালার পর্দা সরাইয়া যিনি মুখ বাড়াইয়াছেন, তিনি কিশোরীবাবু। তাঁহার এই আকস্মিক আবির্ভাবে কঙ্কাবতী সেখান হইতে ছুটিয়া পলায়ন করিয়াছে, ঘরের মাঝখানে একেবারে ভ্যাবাচাকা খাইয়া

দাঁড়াইয়া আছে মাত্র পিন্টু। পিন্টুর হাতে-মুখে লজেঞ্জ। কথা বলিবার উপায় নাই।

কিশোরীবাবুকে দেখিয়া মনে হইল, তিনি খুব রাগিয়াই আসিয়াছেন। চোখ দুইটা বড় বড় করিয়াই বলিলেন, 'দেখুন মশাই, ছেলেটাকে আমার যা-তা খাইয়ে দিলেন আপনারা শেষ ক'রে! ওকে আর যেন কিছু খাওয়াবেন না। আপনার বাড়ীতে খেলেই ওর পেটের অসুখ হয়। বুঝলেন ?'

জবাব দিতে গিয়া অপূর্বর গলার আওয়াজ আটকাইয়া আসিতেছিল, তবু সে অতি কষ্টে বলিল, 'বুঝলাম।'

'শুধু বুঝলাম নয়, আমি অনেক দিন থেকেই দেখছি, কিছু বলছি না তাই! আমি বলি কি—আপনাদের ভালবাসা একটুখানি কম করুন।'

অপূর্বর বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। পা দুইটা তখন তাহার থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। হাত যেন অবশ। রাগের মাথায় কি যে তাহার হইল কে জানে, কাঁপিতে কাঁপিতে পিন্টুর কচি একখানি হাত সে তৎক্ষণাৎ সজোরে চাপিয়া ধরিল এবং হিড়্ হিড়্ করিয়া ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ঘরের বাহিরে লইয়া গিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'নিয়ে যান মশাই আপনার ছেলে। এক্ষুণি নিয়ে যান।'

পিন্টু কাঁদিল না, মুখে একটি কথাও বলিল না, সজলনয়নে শুধু সে তাহার কাকাবাবুর দিকে ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া রহিল। কিন্তু নিষ্ঠুর কাকাবাবু তাহার সেদিকে একবার ফিরিয়াও তাকাইল না।

অপূর্ব অনেকক্ষণ ধরিয়া গুম হইয়া চুপ করিয়া শুইয়াছিল, চা তৈরি করিয়া আনিয়া কঙ্কাবতী তাহার হাতের কাছে ধরিয়া দিয়া বলিল, 'নাও, চা খাও, ওঠো।'

'খাই।' বলিয়া অপূর্ব উঠিয়া বসিল। কিন্তু সে কি মূর্তি! মুখের পানে তাকাইতে ভয় করে—এত গম্ভীর। বলিল, 'ছাখো, ছেলেটা যদি কেঁদে কেঁদে অস্থির হয়ে ওঠে, তা হ'লেও তুমি দরজা খুলো না।'

কঙ্কাবতী ম্লান একটুখানি হাসিয়া বলিল, 'বেশ।'

'বেশ নয়, খুলেছ কি এবার তোমাকেই আমি শাস্তি দেবো।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'দিও।'

অপূর্ব বলিয়া উঠিল, 'কিন্তু আমি ওকে প্রথমে ডাকতে যাই নি, তুমিই ডেকেছ।'

এ-কথার কি আর জবাব দিবে? কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

তাহার পর কাহারও মুখে কোনও কথা নাই। দু'জনেই চুপ!

চা খাইতে খাইতে অপূর্বই আবার প্রথমে কথা কহিল। বলিল, দেখো ত! কিশোরীবাবু এলো আমায় শাসন করতে! বেশ করেছি, ছেলেটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

কঙ্কাবতী এবারেও কোন কথা বলিল না।

অপূর্ব ঠিক উন্মত্তের মত হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল, 'ঠিক হয়েছে! আমার উপযুক্ত শাস্তিই হয়েছে কঙ্কা! যেমন পরের ছেলেকে ভালবাসতে গিয়েছিলাম, ঠিক তার উপযুক্ত প্রতিফল আমি পেয়ে গেছি।'

এই বলিয়া আবার সে আপন মনেই বিড়-বিড় করিয়া কি যেন বলিতে বলিতে চা খাইতে শুরু করিল।

সেদিন গভীর রাত্রিতে হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ পাইয়া কঙ্কাবতীর ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। দেখিল স্বামী কখন তাহার বিছানা হইতে উঠিয়া গিয়াছে। বলিল, 'কে গো, কোথায় গেলে তুমি? দরজা খুললে কি জন্যে?'

'নাঃ, কিছু না।' বলিয়া অপূর্ব আবার ফিরিয়া আসিয়া শয়ন করিল। বলিল, 'হঠাৎ কি মনে হ'লো জানো? মনে হলো—ছেলেটা যেন ডাকছে। তা ও-ছেলেকে বিশ্বাস ত নেই, এসেছে হয়ত এই রাত্রিতে বিছানা থেকে উঠে! তাই না ভেবে আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। দেখলাম, না, কোথাও কিছুই নেই, বাতাসে বোধহয় অমনি শব্দ হচ্ছিল।'

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

অপূর্ব বলিল, 'দিনের বেলা হ'লে আমি খুলতাম ভেবেছ? কখ্খনো না। ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে ওইখানে যদি মাথা খুঁড়ে রক্ত বের করতো—তবু খুলতাম না। খবরদার বলছি, তুমিও যদি খোলো কোনদিন ত কিছু বাকি রাখব না ব'লে দিচ্ছি।'

ঠোঁটের ফাঁকে কঙ্কাবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'ঘুমোও।'

কিন্তু অন্ধকারে তাহার কথাটাই মাত্র শুনিতে পাওয়া গেল, তাহার হাসি কেহ দেখিল না।

পরদিন প্রাতে বাহিরে রাস্তার উপর পিন্টুর কান্নার শব্দ পাইয়া অপূর্ব আর স্থির থাকিতে পারিল না; জানলার কাছে গিয়া কপাট দুইটা একটুখানি ফাঁক করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, হাতের ইশারায় ছেলেটাকে একবার ডাকিবে।

কাঁদিতে কাঁদিতে পিন্টু বলিতেছিল, 'কাকাবাবুর কাথে দাবো।'

কিন্তু তাহার নিজের কাকা তখন তাহাকে দুই হাত দিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। জোর করিয়া তাহাকে কিশোরীবাবুর বাড়ী দিয়া আসিবে।

পাশের দরজা হইতে পিন্টুর মা—সুন্দরীর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। 'কাঁদুক্-গে ঠাকুরপো, তুমি যাও, ওকে দিয়ে এসো ওর সই-মার কাছে। কাকাবাবু! কাকাবাবুর ও শুকনো ভালবাসায় দরকার নেই ভাই। আমাদের ঠুনকো ছুটো খেলনায় পেট ভরবে না। তার ওপর আবার মা'র! অতটুকু ছেলেকে আমার মেরে সেদিন বের ক'রে দিয়েছে বাড়ী থেকে—বুড়ো মিন্‌সে!'

অপূর্বর পায়ের তলা হইতে সমস্ত পৃথিবী যেন সরিয়া যাইতে লাগিল। মাথার ভিতরটা এমনভাবে ঘুরিয়া গেল যে, সে সেইখানেই বসিয়া পড়িতে বাধ্য হইল।

কঙ্কাবতী রান্নাঘরে কাজ করিতেছিল তাই রক্ষা, সুন্দরীর কোনও কথাই সে শুনিতে পায় নাই। এ-ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'ওখানে অমন ক'রে ব'সে যে? তাই ডাকো না ছেলেটাকে একবার, এসে খানিকক্ষণ ব'সে না-হয় চা-টা খেয়েই যাক্। নইলে তুমি যে এমন ক'রে ম'রে যাবে।'

অপূর্ব রাগিয়া উঠিল।—'মরার ওপর খাঁড়ার ঘা তুমি আর দিও না কঙ্কা! তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর। ও ছেলের নাম তুমি আর আমার মুখের সামনে কোরো না বলছি।'

অপূর্বর মুখ-চোখের চেহারা দেখিয়া কঙ্কাবতী ভয় পাইয়া গেল। ভাবিল, একি! তবে কি এই ছেলেটার জন্য স্বামী তাহার পাগল হইয়া যাইবে না কি?

কিন্তু পাগল সে হয় নাই।

সে দিন গেল, তাহার পরদিন গেল, তাহার পরদিন। উপরি-উপরি

তিনটা দিন নির্বিঘ্নে পার হইয়া গেল। এই তিন দিনের মধ্যে অপূর্ব একটিবারের জন্যও পিন্টুর নাম পর্যন্ত মুখে আনিল না।

তিন দিন পর্যন্ত অপূর্ব কোনোরকমে প্রাণপণে মুখ বুজেছিল, চারদিনের দিন আর পারিল না। দুপুরে সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, ফিরিল রাত্রিতে।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'মুখখানি অমন শুকনো যে?'

'কি জানি।' বলিয়া কথাটাকে উড়াইয়া দিয়া জামা-জুতা খুলিয়া সে হাত-পা ধুইয়া গামছা খুঁজিতে গিয়া দেখিল, আলনার উপর পিন্টুর ছোট্ট একখানি জামা ঝুলিতেছে। জামাখানি একবার নাড়াচাড়া করিয়া বলিল, 'এটা আর এখানে কেন? ওব মা ত দাঁড়িয়ে থাকে চব্বিশঘণ্টা রাস্তায়, ওকে দিয়ে দিও।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'দেবো।'

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল। রাস্তার একটা গ্যাসের আলো হইতে প্রচুর আলো তাহার উঠানে আসিয়া পড়ে, সেই দিক্ পানে একদৃষ্টে কিয়ৎক্ষণ তাকাইয়া থাকিবার পব সে আবার কথা কহিল। বলিল, 'ছেলেটাকে কই আর রাস্তাতেও ত দেখা যায় না, কোথাও গেছে না কি?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'যাবে কেন? তুমি বেরিয়ে যাবার পর আজ ওকে দেখলাম যে।'

এতক্ষণ ধরিয়া অপূর্ব বোধকরি এই কথাই শুনিতে চাহিতেছিল। আনন্দে একেবারে যেন আত্মহারা হইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেখলে? আজই দেখলে? কোথায়? হতভাগা ছেলেটাকে কই আমি ত কোনও দিন দেখতে পাই না।'

কঙ্কাবতী বলিল, 'বিকেলে তখন আমি জানলার কাছে ব'সে ব'সে চুল বাঁধছিলাম, অনেকক্ষণ থেকেই জানলাটা কে যেন খুট্ খুট্ ক'রে নাড়্‌ছিল, বললাম, 'কে'? কোনও সাড়া পেলাম না। ভাবলাম, বাতাসে অমন করছে হয় ত। কিন্তু চুপ করতেই আবার শুনি তেম্‌নি খুট্ খুট্ শব্দ। আবার ডাকতে যাচ্ছি, এমন সময় শুনলাম—পিন্টুর গলার আওয়াজ। খুব চুপি-

চুপি বলছে, 'কাকীমা, দাবো?' আমি বাপু আর পারলাম না থাকতে, মুখখানি শুকনো, দেখে ভারি দয়া হলো, বললাম, 'এসো।' ধীরে-ধীরে আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। এসেই কি বললে শুনবে? বললে, 'কাকাবাবু আমাকে মাব্বে না কাকীমা?' এমন মুখখানি ক'রে বললে বাপু যে আমার চোখে তখন জল এসে গেছে।

অপূর্ব উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহারও দু'চোখ ছাপাইয়া তখন জল আসিয়াছে। কঙ্কাবতীর কাছে তাহার এ দুর্বলতা গোপন করিবার জন্যই বোধকরি সে আর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে-ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল, একবার উঠানে গিয়া দাঁড়াইল, একবার কলতলার দিকে গেল, বিনা প্রয়োজনেই একবার দরজার কাছে গিয়া হাত দিয়া দেখিল, দরজাটা ভাল করিয়া ভেজানো আছে কি না, তাহার পর অতি সন্তর্পণে চোখ দুইটা একবার মুছিয়া লইয়া আবার সে কঙ্কাবতীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কি বললে?'

কথাটা প্রথমে সে ভাল বুঝিতে না পারিয়া তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল, তাহার পর বলিল, 'বলব আবার কি? কিছুই বললাম না।'

অপূর্ব চীৎকার করিয়া উঠিল, 'কিছুই বললে না? তুমি ত বেশ মানুষ তা হ'লে। কেন, বললেই পারতে,—না, মারবে না। কাকাবাবু মেরেছে কখনও যে মারবে?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'না বাপু, তা বলি নি। বেশিক্ষণ ত ছিল না। মা বকবে বলে সে চলে গেল।'

অপূর্ব বলিল, 'হুঁ। তা হ'লে লুকিয়ে এসেছিল। ভারি চালাক ছেলে, অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ যে!'

এই বলিয়া খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া কঙ্কাবতীকে অপূর্ব আবার বকিতে শুরু করিল, 'কিন্তু তোমার মত বোকা মেয়ে আমি আর কখনও দেখি নি। ছেলেটাকে একটা জবাব দিতে পারলে না? ছি!'

কঙ্কাবতী বলিল, 'ওগো চুপ কর। ছোট ছেলে, ও তোমার জবাবের কি বোঝে? জবাব নাই-বা দিলাম।'

অপূর্ব রাগিয়া উঠিল। বলিল, 'জানি। ও-ছেলের ওপর তোমার কি মনোভাব, তা আর আমার জানতে বাকি নেই। বুঝলে? জবাব তুমি দেবে কেন?'

'কি মনোভাব শুনি?'

'সে যাই হোক্।' অপূর্ব বলিল, 'নিজের ছেলে হয় নি বলে হিংসেয় তুমি ম'রে যাচ্ছ, তা কি আর আমি বুঝি না ভেবেছে? ও ছেলেকে তুমি কোন্ দিন বিষ খাইয়ে মেরে ফেলতেও পার।'

স্বামীর মুখে এ-কথা শুনিবে, তাহা সে কোনো দিন ভাবে নাই। কঙ্কাবতীর সর্বশরীর থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। দেওয়াল ধরিয়া সে নিজেকে কোনও প্রকারে সামলাইয়া লইয়া কাঠের মত শক্ত হইয়া সেইখানেই চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অপূর্ব কিন্তু তখনও থামে নাই। তখনও সে চীৎকার করিয়া বলিতেছিল, 'খবরদার বলছি ডাইনী, তুমি ও ছেলেকে কোনো দিন তোমার কাছে ডাকবে না। আমার অসাক্ষাতে কোনো দিন যদি ডেকেছ শুনতে পাই ত তোমায় আমি খুন ক'রে ফেলব।'

স্বামী তাহার নিশ্চয়ই পাগল হইয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে ওই কথা বলে কখনও?

কঙ্কাবতী প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, পিন্টুকে তাহার কাছে ডাকা দূরে থাক্, সে আর ও-ছেলের কোনও কথাতে পর্যন্ত থাকিবে না।

কিন্তু অপূর্বর সেই দিন হইতে কি যে হইয়াছে, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না, অধিকাংশ সময় ঘরের বাহিরেই থাকে, বাড়ী যদি বা ফেরে ত কঙ্কাবতীর দিকে একবার ফিরিয়াও তাকায় না, শুধু পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

তাই বলিয়া কঙ্কাবতীরও রাগ করিয়া পড়িয়া থাকা চলে না। খাইবার সময় স্বামীকে তাহার উঠাইতেই হয়; অথচ উঠাইলেও খায় না। খাইতে বসিয়া এটা-সেটা একবার মুখে দিয়া নাড়াচাড়া করিয়াই উঠিয়া পড়ে।

কঙ্কাবতী বলে, 'ও কি! হয়ে গেল খাওয়া?'

'হুঁ' বলিয়া এমন গম্ভীরভাবে অপূর্ব চুপ করিয়া থাকে যে, আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে কঙ্কাবতীর ভরসা হয় না।

অথচ অপূর্বর শরীর দিন দিন শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কোনও কাজেই

আর তাহার ভাল করিয়া মন নাই। সকালে বাজার করিতে যায় ত দুইটা জিনিস আনে আর পাঁচটা ভুলিয়া বসিয়া থাকে। কঙ্কাবতী কিছু বলিলে বলে, 'নাও না বাপু ওতেই কোনো রকমে চালিয়ে।'

কঙ্কাবতী বলে, 'আমার না হয় ওতেই চলবে, আমার জন্যে ত ভাবি নি, ভাবছি তোমার জন্যে।'

নিতান্ত উদাসীনের মত অপূর্ব বলে, 'থাক, আর ভেবে কিছু হবে না।'

এই বলিয়া কঙ্কাবতীকে সে আরও বেশি করিয়া ভাবাইয়া তোলে।

কঙ্কাবতী ভাবে, বুঝি শুধু তাহারই জন্য স্বামীর এই দশা। সে যদি বন্ধ্যা না হইত, পেটে যদি তাহার ছেলে মেয়ে যা-হোক একটা-কিছুও হইত, তাহা হইলে স্বামী হয় ত তাহার এমন করিয়া পরের ছেলেকে ভালবাসিয়া কষ্ট পাইত না। মনে হয়, ইহার জন্য সমস্ত অপরাধ—সমস্ত দোষ যেন তাহারই।

কিন্তু কি করিবে সে, হে ভগবান্!—কঙ্কাবতী এক একদিন পড়িয়া পড়িয়া খুব খানিকটা কাঁদিয়া শেষে রাত্রির অন্ধকার আকাশের পানে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া হাত জোড় করিয়া তাহার ব্যাকুল প্রার্থনা জানায়—'তুমিই ইহার একটা উপায় করিয়া দাও ঠাকুর!'

নিজের ছেলে না হউক, পরের ছেলে পিন্টুকে লইয়া দিন তাহাদের বেশ ভালই কাটিতেছিল। তাহার নিজের না কাটুক, স্বামী তাহার বেশ ভালই থাকিত, মুখে অন্তত তাহার হাসি দেখিতে পাইত। আর আজকাল তাহার সেই মুখ হইয়া গিয়াছে ম্লান, এ লোক তাহার জীবনে কোনো দিন হাসিয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

কঙ্কাবতীর মনে হইল, তা হোক্ তাহার কষ্ট, পিন্টু আসুক।

কিন্তু পিন্টুকে কোনো দিন স্বামী তাহার নিজে ডাকিবে বলিয়া মনে হয় না, অথচ তাহারও ডাকিবার যো নাই। ছেলেটা যদি নিজে হইতে আসে তবেই। নিজে হইতে আসিলে তাহাকে সে যে তাড়াইয়া দিবে না, এ কথা সত্য।

পিন্টুকে আজকাল আগলাইয়া রাখা হইয়াছে। কিন্তু ছোট ছেলে, ফাঁক পাইলেই তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়ায়। বৈকালে যখন ফিরিওয়ালাদের

ডাক শুরু হয়, সাধারণত সেই সময়েই দেখা যায়—বাড়ী হইতে পিন্টু ছুটিয়া বাহির হইয়া আসে। কিন্তু অপূর্ব আজকাল আর সে সময় বাড়ী থাকে না।

ছেলেটাকে ডাকিতে অপূর্ব সেদিন তাহাকে নিষেধ করিয়াছে। কঙ্কাবতীর মনে হইল, উহা তাহার দুরন্ত অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। পিন্টুকে তাহার চোখের সম্মুখে দেখিলে মান অভিমান ভাসিয়া যাইবে।

এই ভাবিয়া কঙ্কাবতী সেদিন জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, বিকেলে চারটের পর বাড়ী ফিরতে পার না?'

অপূর্ব বলিল, 'কেন?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'বিকেলটা বড় একা-একা ঠেকে। বাসিনী ঝি আজ দু'দিন হলো আসে না, কোথায় গেছে।'

'আচ্ছা, দেখব চেষ্টা ক'রে।' বলিয়া অপূর্ব বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

পিন্টু কখন বাড়ী হইতে বাহির হইবে ভাবিয়া সে দিন হইতে কঙ্কাবতী রোজ বৈকালে তাহার জানলার কাছটিতে পর্দা সরাইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। পিন্টুকে দেখিবামাত্র ডাকে, 'এসো।'

পিন্টু ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়ায়।

কঙ্কাবতী ঠিক আগেকার মতই আবার তাহাকে কোলে লইয়া আদর করে, খাবার খাওয়ায়, বই খুলিয়া ছবি দেখায়। আসল কথা—স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় ছেলেটাকে কোনোরকমে ছলে কৌশলে ধরিয়া রাখে।

তাহার পরে যখন দেখে, অপূর্ব আর কিছুতেই আসিল না, তখন সে তাহাকে ছাড়িয়া দেয়।

এমনই করিয়া দিন চলে।

তাহার পর, দিন তিন-চার পরে কঙ্কাবতীর অনুরোধের কথা স্মরণ করিয়াই কি না জানি না, হঠাৎ এক দিন বৈকালে অপূর্ব বাড়ী আসিয়া উপস্থিত।

কিন্তু সর্বনাশ কাণ্ড, আসিয়াই দেখে, এত নিষেধ সত্ত্বেও পিন্টুকে তাহার কোলের কাছে বসাইয়া কঙ্কাবতী কি যেন তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়াছে।

অপূর্বকে দেখিবামাত্র কঙ্কাবতী পিন্টুকে উঠাইয়া দিয়া বলিল, 'যাও, তোমার কাকাবাবু এসেছে।'

ছেলেটা কিন্তু খাবার ছাড়িয়া কিছুতেই যাইতে চাহিল না।

অপূর্ব বলিল, 'এত করে বারণ করলাম, তবু ডাকলে ?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'নিজের জন্যে ডাকিনি গো, ডেকেছি তোমার জন্যে। নইলে যে গেলে !'

'আর আমার অপমানটা বুঝি কিছু নয় ? কিশোরীবাবু বাড়ী এসে অপমান ক'রে গেল, ওর মা আমায় শুনিয়ে শুনিয়ে—'

কঙ্কাবতী বলিল, 'তুমি ভালবাস জানলে ও-সব একদিন সবাই ভুলে যাবে। যা রে যা তোর কাকাবাবু ডাকছে।'

অপূর্ব বলিল, 'না ডাকি নি। তুমি আগে জবাব দাও, আমার বারণ তুমি শুনলে না কেন।'

কঙ্কাবতীর হঠাৎ রাগ হইয়া গেল। বলিল, 'জানি তোমার মরণ-দশা ধরেছে, তা নইলে তুমি এমন করবে কেন ? বেশ করেছি, ডেকেছি। যে যা বলে, আমায় বলবে। তুমি যাও।'

অপূর্ব চীৎকার করিয়া উঠিল, 'কি বললে ?'

'বললাম, বেশ করেছি ডেকেছি। তুমি যাও বাপু, তোমায় কিছু বলি নি, তোমার মাথার ঠিক নেই।'

অপূর্ব রাগে একেবারে অধীর হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, 'মুখের ওপর জবাব ! বেশ করেছ ? এই নাও তবে তার শাস্তি। বলিয়া পায়ের কাছে কাঁসার যে-গ্লাসটা পড়িয়া ছিল, তাহাই তুলিয়া লইয়া সজোরে সে কঙ্কাবতীর দিকে ছুঁড়িয়া মারিল।

সর্বনাশ ! ধাঁ করিয়া গ্লাসটা লাগিয়াছে ছেলেটার কপালে।

পিন্টু চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কপাল কাটিয়া গিয়া গল্ গল্ করিয়া কাঁচা রক্ত বাহির হইয়া অসিয়াছে। কঙ্কাবতী তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে তুলিয়া জল আনিয়া ধুইতে বসিল। ছেলের কান্না শুনিয়া সুন্দরী ছুটিয়া আসিল, তাহার দেওররা আসিল এবং মুহূর্তের মধ্যে চারিদিকে একটা হৈ-চৈ গোলমাল বাধিয়া গেল।

আসল ব্যাপারটা কঙ্কাবতী গোপন করিতেছিল—'ছেলেটা হঠাৎ আছাড় খেয়ে···'

কিন্তু ছেলে বলে, 'না, কাকাবাবু মেলে।'

কাকাবাবু! অপূর্ব! সবাই অবাক্!

গালাগালি দিতে দিতে সুন্দরী তাহার ছেলে লইয়া চলিয়া গেল এবং তাহার পিছু পিছু বাড়ী হইতে অন্যান্য সকলেই বাহির হইয়া গেল পর কঙ্কাবতী দেখিল, সে একাই পড়িয়া আছে, স্বামীও তাহার সেই গোলমালের সময় লজ্জায় বোধ করি মুখ দেখাইবার ভয়ে বাড়ী হইতে পলায়ন করিয়াছে।

কিন্তু সে গেল কোথায়? মনের অবস্থা তাহার যে-রকম হইয়াছে, তাহাতে এ-সময় বাড়ীর বাহিরে থাকাও বিশেষ নিরাপদ নয়।

কঙ্কাবতী অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল এবং ছেলের ভাবনা ছাড়িয়া দিয়া স্বামীর ভাবনা ভাবিতে ভাবিতেই সে যেমন পারিল, চারটি রান্না করিয়া বন্ধ ঘরের মধ্যে উন্মাদিনীর মত ছটফট করিতে লাগিল।

বাহিরে রাস্তার উপর জুতার শব্দ হইলেই সে জানলার কাছে গিয়া দাঁড়ায়, আবার হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসে। পিন্টুর কান্না থামিয়াছে কি না, তাহাই জানিবার জন্য একবার তাহাদের দেওয়ালের কাছে কিছুক্ষণ কান পাতিয়া থাকে, একবার বিছানায় গড়াগড়ি দিয়া খানিকটা কাঁদে, একবার ঘড়ির পানে তাকায়, একবার শোয়, একবার উঠিয়া বসে,—এমনই করিয়া কয়েক ঘণ্টা অতিক্রম করিবার পর, ধীরে ধীরে চোরের মত অপূর্ব যখন তাহাদের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল, পাড়াটা তখন একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, রাত্রি তখন একটা।

কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় ছিলে?'

অপূর্ব চুপ করিয়া রহিল।

'খেতে দিই?'

'দাও।'

ছেলেটার কথা জিজ্ঞাসা করিতে অপূর্বর ভয় করিতেছিল।

কঙ্কাবতী নিজেই বলিল, 'ভাল আছে।'

অপূর্ব তাহার মুখের পানে তাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কেমন ক'রে জানলে?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'কাঁদতে কাঁদতে চুপ করে বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। কই, আর ত কোনও শব্দ পাচ্ছি নে।'

গায়ের জামাটা খুলিয়া অপূর্ব কঙ্কাবতীর হাতে দিল। কিন্তু দেওয়ালের

গায়ে অসাবধানে সেটা রাখিতে গিয়া জামার পকেট হইতে ঠক্ করিয়া ছোট একটি শিশি মেঝেয় পড়িয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল।

অপূর্ব হাত-পা ধুইবার নাম করিয়া কল-তলায় গিয়া পিন্টুর দেওয়ালের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, ঔষধের তীব্র গন্ধে চারিদিক্ ভরিয়া উঠিতেই তাড়াতাড়ি ঘরে আসিয়া দেখিল, কঙ্কাবতী তখন একেবারে অপ্রস্তুত হইয়া গিয়া কাঁচের টুকরাগুলি কুড়াইতেছে।

'ভাঙ্‌লে ত? বেশ করলে।' বলিয়া অপূর্ব তাড়াতাড়ি তাহার পকেট হইতে আরও গোটাকতক শিশির মত কি-যেন বাহির করিয়া আলমারির মাথার উপর লুকাইয়া রাখিয়া আবার কলতলায় চলিয়া গেল।

কঙ্কাবতীর কৌতূহল হইতেই হাত বাড়াইয়া জিনিসগুলি বাহির করিয়া দেখিল, কোনোটাই এমন কিছু গোপনীয় বস্তু নয়।—কাগজে মোড়া এক প্যাকেট তূলা, একটা ব্যাণ্ডেজ, আর ছোটবড় কয়েকটা শিশিতে কি-সব যেন ঔষধ। একটা শিশির গায়ে মাত্র কাগজের লেবেলে বাঙলায় লেখা— অপূর্ববাবুর ছেলের জন্য, দুঘণ্টা অন্তর, চারবার।

গত কয়েক দিন ধরিয়া বাসিনী-ঝি কোথায় গিয়াছে, এখনও ফিরে নাই। একা-একা কঙ্কাবতীর কষ্ট হইতেছিল। অপূর্ব বলিল, 'অন্য ঝি নিয়ে আসব?'

কঙ্কাবতী বলিল, 'আহা, মানুষটি বড় ভাল। ওকে ছাড়িয়ে দেওয়া কি ভাল হবে? গেছে কোথায় বোনের বাড়ী, আসবে হয় ত' আজ-কালের মধ্যেই।'

অপূর্বর মেজাজ আজকাল সর্বদাই রুক্ষ। বলিল, 'বেশ! তবে কষ্টের কথা আমায় আর যেন বোলো না।'

কঙ্কাবতী চুপ করিয়া রহিল।

অপূর্ব বলিল, 'এ বাড়ীতে আমরা ত আর ছ' সাত দিন মাত্র আছি। মাস শেষ হ'লেই ত চ'লে যাব। তখন তোমার ও ভাল ঝি থাকবে কোথায় শুনি?'

কিন্তু এ বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার কথা অপূর্ব তাহাকে একদিনও বলে নাই। কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'সত্যি?'

অপূর্ব বলিল, 'নিশ্চয়। এ-পাড়ায় আবার মানুষে থাকে!'

কঙ্কাবতীর তাহাতে আপত্তি নাই, বরং ভালই। ছেলেটার কাছ হইতে দূরে চলিয়া যাওয়াই উচিত। বলিল, 'তবে আর এ ক'টা দিনের জন্যে কেন বাপু, বাসিনীই আসুক।'

বাসিনী আসিয়াছে। কঙ্কাবতীর আনন্দের আর সীমা নাই।

সেদিন সকালে কঙ্কাবতী জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁগা, আজ মঙ্গলবার ত'?'

অপূর্ব বলিল, 'হ্যাঁ, কেন?'

'এমনিই জিগ্যেস করলাম।'

তাহার পর দেখা গেল, সেদিন অতি প্রত্যূষেই কঙ্কাবতী স্নান করিয়াছে। স্নান করিয়া একপিঠ কালো চুল এলাইয়া দিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া সূর্যদেবকে প্রণাম করিয়া আবার সে তাহার স্বামীর কাছে আসিয়া হাতে এক গণ্ডুষ জল লইয়া বলিল, 'এতে একবার পায়ের আঙুলটা দাও না ডুবিয়ে। পাদোদক নেবো।'

অপূর্বের মুখে হাসি ফুটিল। বলিল, 'হঠাৎ এত ভক্তি যে?'

পাদোদক খাইয়া হাঁটু গাড়িয়া একটি প্রণাম করিয়া কঙ্কাবতী ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'কেন, ভক্তি কি তোমায় করি না না কি?'

বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'কত পাপ হয় ত করেছি জীবনে, তাই তোমায় একটা ছেলেও দিতে পারলাম না। দেখি ভক্তি করলে যদি কিছু হয়।'

তাহার পর রান্না শেষ করিয়া অপূর্বকে খাওয়াইয়া সে নিজে খাইতে বসিল। অপূর্ব তখন বাড়ী হইতে বাহির হইবার উদ্যোগ করিতেছে।

কঙ্কাবতী কিন্তু খাইতে বসিয়াই উঠিয়া পড়িল।

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, 'এ কি! উঠলে যে?'

কঙ্কাবতী তাড়াতাড়ি হাতটা তাহার ধুইয়া আসিয়াই কিসের যেন যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হইয়া মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। বলিল, 'আমার শরীরটা কেমন যেন করছে।'

অপূর্বকে আজকাল সহজে সে বাড়ী হইতে বাহিরে যাইতে দিতে চায় না, ভাবিল, হয় ত বা ইহাও তাহারই জন্য একটা ছল। বলিল, 'কি হচ্ছে কি?'

কঙ্কাবতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না, সেইখানেই শুইয়া পড়িয়া বলিল, 'ভয়ঙ্কর পেট কামড়াচ্ছে।'

অপূর্ব বলিল, 'পাদোদক খেয়েছ কিনা, সেই জন্তেই। ও এক্ষুণি সেরে যাবে, একটু ঘুমোও। আমি আসি।' বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

বাড়ী যখন ফিরিল, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। দরজায় কড়া নাড়িয়া প্রথমে সাড়া পাইল না। অন্য দিন জানলার পথে আলো দেখা যায়, আজ আলোও জ্বলে নাই। তবে কি যাহা ছল ভাবিয়া উপেক্ষা করিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল, তাহা সত্য? পেটের যন্ত্রণা কঙ্কাবতীর বাড়িয়াছে কি না তাই-বা কে জানে! জানলার পথে ডাকিল, 'কঙ্কা!'

ওদিকে দরজা খোলার শব্দ হইল। তাড়াতাড়ি গিয়া দেখে, আলু-থালু বেশে কাপড়-চোপড় অসামাল অবস্থায় কাঁপিতে কাঁপিতে কঙ্কাবতী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিয়াছে এবং অতি কষ্টে দরজা খুলিয়া সে সেইখানেই শুইয়া পড়িয়াছে।—'তবে কি তোমার সত্যিই অসুখ, কঙ্কা?'

অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে কঙ্কাবতী বলিল, 'জ্ব'লে গেল।'

'কি হয়েছে বল ত? জ্বর?'

গায়ে হাত দিয়া দেখিল, জ্বর নয়।

'ওঠো এখান থেকে।' বলিয়া তাহাকে এক রকম আড়্‌কোলা করিয়া তুলিয়াই অপূর্ব বিছানার উপর আনিয়া শোয়াইল। তাহার পর তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া তাহার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে কঙ্কা?'

তন্দ্রাচ্ছন্ন কঙ্কাবতীর কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

'কঙ্কা! কঙ্কা!' বলিয়া বার-কতক নাড়িয়া দিতেই কঙ্কাবতী চোখ চাহিল। চোখ দুইটা লাল!—'কি হচ্ছে বল ত?'

অতি কষ্টে কঙ্কাবতী বলিল, 'এসেছ? এসো।'

অপূর্ব জিজ্ঞাসা করিল, 'কি হচ্ছে তোমার?'

কঙ্কা বলিল, 'মরে যাব। বাসিনীকে দিয়ে ছেলে হবার ওষুধ—' এই বলিয়া মাথাটা একবার এপাশ ওপাশ করিয়া অপূর্বকে জড়াইয়া ধরিয়া থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'পেয়ারাপাতা দিয়ে বেটে খেয়েছি।'

অপূর্ব আর কিছু শুনিতে চাহিল না। তাহাকে তেমনি অবস্থায় ফেলিয়া

রাখিয়াই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল এবং তৎক্ষণাৎ ট্যাক্সি করিয়া একজন ডাক্তার ডাকিয়া আনিল।

ডাক্তার বলিলেন, 'এক্ষুণি হাসপাতালে নিয়ে চলুন।'

তাহার পর তাহারা দু'জনে তৎক্ষণাৎ সেই ট্যাক্সিতে তুলিয়া লইয়াই কঙ্কাবতীকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে লইয়া চলিল।

হাসপাতালে গিয়া কি হইল, সে শোচনীয় দুঃসংবাদ আর শুনিয়া কাজ নাই। সামান্য একটা গাছের শিকড় খাইয়া যে হতভাগী তাহার নারীজন্ম সার্থক করিতে চাহিয়াছিল, সমস্ত দিবারাত্রি প্রাণপণে যুঝিয়াও তাহাকে আর বাঁচানো গেল না। বাসিনী-ঝির সন্ধান করিতে গিয়া দেখা গেল, সে পলায়ন করিয়াছে। পুলিশ তাহার পিছু লাগিয়া রহিল।

কঙ্কাবতীর সহস্র স্মৃতিবিজড়িত গৃহে আর একাকী সে বাস করিতে পারিবে না বলিয়া সেই যে অপূর্ব হাসপাতালে গিয়াছিল, সেই অবধি আর বাসায় ফিরে নাই। তালা-দেওয়া দরজা তেমনি বন্ধই পড়িয়া রহিল।

বাসা বদল করিবার জন্য দিন দুই-তিন পরে কোথা হইতে যে অপূর্ব ফিরিয়াছে, কিছুই জানি না। কিন্তু কঙ্কাবতীর যে কি হইল, কোথায় গেল, তাহার সংবাদ কেহ একবার ভুলিয়াও জিজ্ঞাসা করিল না।

শুধু এই জীবন-নাট্যের মূল কেন্দ্র সেই ছেলেটির কপালের ঘা তখন শুকাইয়া গিয়াছে, সে-ই শুধু বৈকালে জানলার কাছে আসিয়া খুট্ খুট্ করিয়া আওয়াজ করিতে করিতে অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল,—'কাকীমা! কাকীমা দাবো?'

সে আওয়াজ অপূর্বর কানে যাইতেই সে ছুটিয়া জানলার কাছে গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু এমনই দুর্দৈব, প্রাণ ভরিয়া ছেলেটাকে একবার শেষ দেখা দেখিবার আগেই দরবিগলিত অশ্রুধারায় তাহার চোখের সম্মুখে সব-কিছু ঝাপ্সা হইয়া গেল।

পিন্টু হঠাৎ মুখ তুলিতেই দেখিল, তাহার কাকাবাবু দাঁড়াইয়া আছে।

● স্ব-নির্বাচিত গল্প ●

সেদিনের মারের কথা বোধ হয় সে এত শীঘ্র ভুলে নাই। কাকীমার বদলে কাকাবাবুকে দেখিয়া তাই বোধকরি সে মারের ভয়েই ছুটিয়া পলায়ন করিল।

অপূর্ব কি করিবে, কিছুই বুঝিতে পারিল না। কাঠের মত শক্ত হইয়া জানালার শিক ধরিয়া তেমনই নিস্তব্ধভাবে সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে শুনিল, পিন্টুদের বাড়ীর ঝি-মাগী বোধকরি সুন্দরীকে শুনাইয়া শুনাইয়া চীৎকার করিতেছে,—'ব্যথা উঠেছে ত' আমি কি কর্‌ব মা! ছেলে যদি তোমার হাসপাতালেই হয় বলছ,—একথা দেওরকে বলো না, গাড়ী ডেকে হাসপাতালে দিয়ে আসুক।'

ভয়

বেলা তিনটা হইতে সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ষ্টেশনে গাড়ী আসে না। ষ্টেশন খাঁ-খাঁ করে।

ষ্টেশন-মাষ্টার বাসায় চলিয়া যান। এসিষ্ট্যাণ্ট্ যিনি, তাঁহার না থাকিলে নয়। টেলিগ্রাফের যন্ত্র-সাজানো টেবিলটির কাছে একটি টুলের উপর তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে হয়।

খালাসীদের মধ্যে কেহ কেহ বা এই সময়টায় গ্রামের ভিতর চাল-ডাল কিনিতে যায়, কেহ-বা ঘুমায়, আবার কেহ বা আধ মাইল-খানেক দূরে ফটকের কাছে গিয়া জটলা করে।

এই ফটকটি রেল-কোম্পানীর ফটক। পাকা একটি সড়ক এখানে রেল-লাইনের উপর দিয়া পার হইয়া গিয়াছে। সড়কের উপর গাড়ী-ঘোড়া লোকজনের যাতায়াত। আজকাল আবার মোটর-'বাস' চলিতেছে। ট্রেনের সঙ্গে ধাক্কা লাগিবার সম্ভাবনা। কাজেই রেল-কোম্পানীকে এখানে একটি ফটক তৈরী করিতে হইয়াছে। এবং শুধু ফটক নয়—ফটকের কাছে টালির একখানি ছোট ঘর। ফটকরক্ষী রাম সিং-এর জন্য।

খালাসীদের মজলিস বসে রাম সিং-এর এই ঘরখানির মধ্যে। মজলিসের প্রধান আকর্ষণ—রঞ্জন। কালোরঙের পাতলা ছিপছিপে ঢ্যাঙা এবং কুঁজো একটি লোক। কাজকর্ম কোথাও কিছু করে না। ষ্টেশনেই ঘরবাড়ী, আত্মীয়-স্বজন কেহ তাহার কোথাও আছে কিনা কে জানে, ট্রেন আসিয়া দাঁড়াইলে যাত্রীদের কাছে ভিক্ষা করিয়া কাঁদিয়া-কাটিয়া হাত পাতিয়া যাহা পায়—তাহাই লইয়া গিয়া রাম সিং-এর কাছে গচ্ছিত রাখে, রাম সিং-এর হাতে-গড়া রুটি খাইয়া তাহার দিন কাটে, রাত্রে ওই ফটকের ঘরের মধ্যে রাম সিং-এর কাছে শোয়।

অদ্ভুত এই রঞ্জন।

খালাসীরা সুবিধা পাইলেই তাহাকে লইয়া জটলা পাকায়। রঞ্জন ভারি মজার মজার গল্প বলে। তাহারা শোনে।

রঞ্জন বলে, তাহার সাহস নাকি অত্যন্ত বেশি।

বলিয়া আরম্ভ করে,—'একদিন—অমাবস্যার রাত। চারিদিকে ঘুটঘুটে আঁধার। কোলের মানুষ চেনা যায় না। আছি শ্বশুরবাড়ীতে; বৌ-এর সঙ্গে কয়েকদিন ধরেই ঝগড়া চলছিল। হঠাৎ সেদিন রাগারাগি হলো। রাত তখন দুপুর। এমন রাগারাগি হলো যে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বেরিয়ে পড়ে যাই কোথায়?

বাইরে এসে ভাবলাম—বাড়ী যাওয়া যাক।

বাড়ী সেখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে। সেই অন্ধকার রাত। হাতে না আছে লণ্ঠন, না আছে একটা ছড়ি।

চলতে লাগলাম।

চলেছি ত চলেইছি। ধানের মাঠে-মাঠে রাস্তা। বর্ষাকাল। মাঠে কাদা হয়েছে। ছপ্ ছপ্ ক'রে মাঠগুলো পার হয়ে উঠলাম গিয়ে পাকা-রাস্তায়। পাকা-রাস্তার দু'পাশে বাঁশের ঝাড়ে বাতাস লেগে কট্ কট্ ক'রে শব্দ হচ্ছে, জঙ্গলের মাঝখানে শেয়ালগুলো মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছে। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। অন্য লোক হ'লে হয়ত মরেই যেতো। আমার সাহস খুব বেশি, তাই সে-সব কিছু গ্রাহ্য না ক'রে হনহন ক'রে এগিয়ে চল্‌লাম।

কিছু দূর গিয়ে রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে ডানহাতি একটা নদী পেরোতে হয়। প্রকাণ্ড নদী। ওপারে হয়ত জল একটুখানি আছে, কিন্তু এপারে শুধু বালি।

নামলাম নদীতে। জায়গাটার নাম শ্মশান-ঘাটা। আশ-পাশের গাঁয়ের লোক সেখানে মড়া পোড়ায়। দিনের বেলা সে-পথ দিয়ে হেঁটে যেতে লোকে ভয় করে। আমারও গা'টা একবার ছম ছম ক'রে উঠলো। কিন্তু ওই পর্যন্তই। ভয় কিসের? বালির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। মস্ মস্ ক'রে শব্দ হচ্ছে। হঠাৎ কি যেন একটা নরম জিনিসের গায়ে পা ঠেকলো। থমকে দাঁড়ালাম। দেশ্‌লাই থাকলে জ্বেলে দেখতাম। কিন্তু কিছু নেই। পা দিয়ে নেড়ে-চেড়ে বুঝলাম—হাত, পা, মাথা, চুল—সবই রয়েছে, একটা আস্ত মানুষ। হঠাৎ মনে পড়লো, কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, নদীর ধারে দু'তিনখানা গাঁয়ে ভয়ানক কলেরা হচ্ছে। হয়ত সেই কলেরার মড়া। না পুড়িয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে গেছে। তা হোক্। পাশ কাটিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু যেতে গিয়ে, দেখি—চলা দায়। যেদিকে যাই, সেইদিকেই হয়ত কারও হাত মাড়িয়ে ফেলি,

কারও পা, কারও-বা মাথার খুলিতে হোঁচট্ খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিই। সুমুখেই দেখি, কয়েকটা শেয়াল খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ ক'রে চীৎকার করতে করতে ছুটোছুটি করছে, মড়া নিয়ে টানাটানি ক'রে তারা ঝগড়া বাধিয়েছে হয়ত।

আরও খানিকটা এগিয়ে যেতেই মনে হলো যেন সেই নদীর মাঝখানে জনকয়েক কালো কালো লোক ব'সে ব'সে ফিস্ ফিস্ ক'রে গল্প করছে। ভাবলাম হয়ত তারা গ্রাম থেকে মড়া নিয়ে এসেছে। কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, 'কে ?'

একটা লোক যেন কথা বলতে যাচ্ছিল, মনে হলো বাকি লোকগুলো এক সঙ্গে ফিস্ ফিস্ ক'রে তাকে নিষেধ করলে। ব্যাপার কি বুঝতে পারলাম না।

'কে হে তোমরা, কথা কইছ না যে!' বলে যেই একটুখানি এগিয়ে গেছি, দেখি না, সবাই মিলে একসঙ্গে কঁক্-কঁক্ গঁক্-গঁক্ করতে করতে বালির ওপর থপ্ থপ্ ক'বে লাফিয়ে লাফিয়ে দূরে স'রে গেল।

বুঝলাম, মানুষ নয়, মানুষ ব'লে ভুল করেছিলাম। ওগুলো শকুনি।

ভাবলাম, ভূতপ্রেত কত-কি থাকতে পারে, কাজ নেই আর বেশিক্ষণ শ্মশানে থেকে। তাড়াতাড়ি নদীটা পার হয়ে যাই।

তাড়াতাড়ি নদী পার হচ্ছি। সুমুখে জল। জলে নামতেই দেখি, আমার আগে-আগে জলের ওপর ছপ্ ছপ্ ক'রে কে যেন এগিয়ে যাচ্ছে। এবার আর ভাল ক'রে না দেখে কথা কইব না ভে'বে আমিও তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল্লাম। কাছাকাছি আসতেই অন্ধকারেও চিনতে পারা গেল—কালো মত লম্বা একটা মানুষ। ভয়ে ভয়ে বল্লাম,—'কে ?'

'আমি।'

যাক্, বাঁচা গেল। তবু একটা সঙ্গী মিলেছে।

বল্লাম, 'কোত্থেকে আস্‌ছ ? যাবে কোথায় ?'

কোত্থেকে আস্‌ছে সে-কথা আর বল্লে না। বল্লে, 'যাব পাথরকুচি।'

বললাম, 'চল তোমার সঙ্গেই যাই। ভালই হলো।'

পাথরকুচি থেকে আমাদের গ্রাম ক্রোশখানেক দূরে।

দু'জনে নদী পার হ'লাম।

ওপারে গিয়ে—সে যায় আগে-আগে, আমি যাই পিছু-পিছু।

চলা-পথে অনেকদিন হাঁটিনি, ভাবলাম, পাথরকুচির লোক, পথ সে চেনে নিশ্চয়ই। চসুক যেদিকে যাচ্ছে।

দু'একটা কথা জিগ্যেস করলাম। জবাব দেয় না।

বললাম, 'তুমি কি জা'ত ?'

বললে, 'বাউরি।'

তা হবে। গরীব লোক। সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যেয় হয়ত মদ খেয়ে কোথাও পড়েছিল। জ্ঞান হ'তেই আবার উঠে সে বাড়ী চলেছে। নেশা হয়ত এখনও ঠিক কাটেনি, তাই ভাল ক'রে কথা বলছে না।

দু'জনে চলেছি ত চলেইছি। পথ আর ফুরোয় না।

বল্লাম, 'এ কিরে, কোন্‌দিকে চলেছিস্‌? পথ ঠিক চিনিস্‌ ত ?'

বললে, 'হ্যাঁ।'

ক'ঘণ্টা চলেছি ঠিক মনে নেই। দু'জনে একটা বাগানের ভেতর গিয়ে ঢুকলাম। পাশেই একটা ইঁটের পাঁজা। হঠাৎ একটা শব্দ হ'তেই দেখি, ইঁটের পাঁজার কাছে সাদা একটা বাছুর যেন ছুটোছুটি করছে। পাশেই একটা গাছের কাছে যেন সুড়ুৎ করে আর একটা শব্দ হলো। সেদিকে তাকাতেই দেখলাম, তিনটি ছোট ছোট বেঁটে বামনের মত মানুষ আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে। মানুষ তিনটে অদ্ভুত রকমের। তিনজনেরই মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, পা-গুলো উল্টো দিকে বাঁকানো। ভূতের পা শুনেছি ওইরকম হয়। তবে কি ভূত নাকি ?

এতক্ষণে আমার গায়ের লোমগুলো খাড়া হ'য়ে উঠলো।

খুব জোরে জোরে বলে' উঠলাম,—রাম ! রাম !

ব্যস্‌, যেই 'রাম' 'রাম' বলা, আমার সঙ্গের সেই লোকটা দেখতে দেখতে ওই বামন তিনটের মত ছোট হয়ে গেল। এতক্ষণে বুঝলাম—ওরে শালা, তুমি মানুষ নও,—তুমিও ভূত !

আমি দেখলাম, ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যদি যাই ত বেটারা পেয়ে বসবে। আর অন্ধকারে সেই অজানা রাস্তায় যাবই বা কোথায় ? বুক ফুলিয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাম-নাম উচ্চারণ করতে লাগলাম ? ভূত চারটে তখন ইঁটের পাঁজার কাছে সরে গেছে। সেই যে বাছুরের মত যেটাকে দেখেছিলাম, সেটাও ঠিক তাদেরই মত সঙ্গীদের কাছে এসে

দাঁড়ালো। সেটার রঙটা কিন্তু সাদাই রইলো। সে-ব্যাটা বোধ হয় সাহেব-ভূত। এই পাঁচটা ভূত তখন সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে পাঁচ-দুগুনে দশটা প্রকাণ্ড লম্বা লম্বা হাত বের ক'রে আমায় ডাকতে লাগলো—'আঁয়! আঁয়! আঁয়!

রাম-নাম কর্‌ছি আর কি করব ভাবছি, হঠাৎ দূরের গাঁয়ে একটা মোরগ ডেকে উঠলো। ঠাণ্ডা বাতাস অনেকক্ষণ থেকেই বইছিল। বুঝলাম—সকাল হয়ে গেছে।

বাঁচা গেল।

চারিদিক ফরসা হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে ভূতগুলো হঠাৎ আমার চোখের সুমুখ থেকে একে-একে কেমন ক'রে যে কোন্‌দিক দিয়ে উধাও হ'য়ে গেল বুঝতে পারলাম না।'

এম্‌নি একটি-দুটি নয়,—কত গল্প!

গল্প শুনিয়া শুনিয়া শেষে এমন হইল যে, খালাসীগুলা রঞ্জনের কাছে গল্প শুনিতেও ছাড়ে না, অথচ অন্ধকারে একা কোথাও যাইতে হইলে ভয়ে মরে।

দু'একজন খালাসী রঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করে, 'আচ্ছা, এত এত কাণ্ড যে করেছ রঞ্জন, তোমার ভয় কোনোদিন পায়নি?'

কথাটা রঞ্জন হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। বলে, 'পাগল! নিজে ভয় পেলে কি এত-সব করতে পারি, তাহ'লে এতদিন মরেই যেতাম।'

'তা বটে!'

সে কথা সত্যি।

সেদিন সায়েব-ভূতের গল্প চলিতেছিল।

একটা সায়েব-ভূত কেমন করিয়া রঞ্জনের হাত হইতে একদিন একটা পাঁঠার মুণ্ডু কাড়িয়া লইতে আসিয়াছিল—তাহারই গল্প।

রাত্রি তখন প্রায় এগারোটা। সন্ধ্যায় একটুখানি জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল। তাহার পর চাঁদ ডুবিয়া গিয়া আবার চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেছে।

রাম সিং বাহিরে লাইনের ধারে বসিয়া গাঁজা টানিতেছিল। রঞ্জনও গাঁজা খায়।

নিজের খাওয়া শেষ হইলে রামসিং ডাকিল, 'এসো রঞ্জন, টানবে ত এসো।'

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকাইয়া বলিল, 'নিয়েই এসো না কল্‌কেটা এইখানে।'

রাম সিং বলিল, 'গাড়ী পেরোবে, আমার যাবার উপায় নেই। তুমি এসো।'

চারজন খালাসী বসিয়া বসিয়া গল্প শুনিতেছিল। রঞ্জন তাহাদেরই একজনকে বলিল, 'যা না ভাই, নিয়ে আয় কল্‌কেটা।'

কেহই আর যাইতে চায় না। এ-উহার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে থাকে।

রঞ্জনও ওঠে না।

সকলেরই মনে কেমন যেন সন্দেহ হইল। একজন খালাসী বলিয়া উঠিল, 'কেন, তোমারও ভয় পাচ্ছে নাকি রঞ্জন ?'

রঞ্জন খুব জোরে হো হো করিয়া খানিকটা হাসিয়া বলিল, 'দূর বোকা! হাতী-ঘোড়া গেল তল……শেষকালে কিনা এই কল্‌কে আনতে যেতে আমার ভয়! তোরা সব হলি কি রে! আমি এত কাণ্ড করলাম আর তোরা এই সামান্য ঘর থেকে বেরিয়ে কল্‌কেটা এনে দিতে পারিস না ?'

রঞ্জন আর কিছুতেই উঠে না। বলে, 'শোন্, তারপর কি হলো শোন!' বলিয়া তাহার অর্ধসমাপ্ত গল্পটি আবার আরম্ভ করিবার আগে একবার গলাটা তাহার পরিষ্কার করিয়া লয়। ওদিকে গাঁজার কলিকার আগুন হয়ত নিভিয়া গেল; মন তাহার পড়িয়া থাকে সেইখানেই। অথচ সেখানেও যাইতে পারে না, গল্পও তেমন জমে না।

অবশেষে রাম সিং নিজেই উঠিয়া আসিয়া কলিকাটা রঞ্জনের হাতে দিয়া তাহাকে এই অবস্থা-সঙ্কট হইতে বাঁচায়।

কিন্তু তাহার এই অনুরক্ত শ্রোতাকয়টির সেইদিন হইতে মনে কেমন যেন একটা খট্‌কা লাগিয়া থাকে।

তবে কি রঞ্জনের সব বানানো গল্প নাকি ?

সত্য গোপন করিয়া চিরকাল ধরিয়া একটা মানুষ কখনও পৃথিবীর আর-সকলকে ঠকাইতে পারে না। সত্য একদিন প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে নিজে ঠকে।

রঞ্জনের বেলাও তাহাই হইল।

একটু একটু করিয়া একদিন সকলে জানিয়া ফেলিল যে, রঞ্জন অত্যন্ত ভীতু। তাহাই সে গোপন করিয়া এতদিন সকলকে উল্টা বুঝাইয়াছে।

তখন আর যায় কোথা!

খালাসীরা তাহাকে ক্ষেপাইতে থাকে। যে তাহাকে দেখিতে পায় সে-ই একটুখানি বলিতে কসুর করে না।

'কি হে, রঞ্জন যে! বল না তোমার সেই মাম্‌দো-ভূতের গল্পটা, বল না শুনি।'

'আচ্ছা রঞ্জন, কেমন ক'রে তুমি ভূতের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলে?'

'ক'বার করেছিলে মনে আছে?'

রঞ্জনের কালো মুখও লাল হইয়া উঠে। কখনও-বা তাহাদের ধমক্ দিয়া সরাইয়া দেয়, কখনও-বা নিজেই সরিয়া পড়ে।

ক্ষেপায় না শুধু রাম সিং। সে-ই তাহার একমাত্র আশ্রয়!

ফটকের ঘরে গল্প বলার মজলিস এখন ভাঙ্গিয়াছে।

বেলা তিনটা হইতে ছ'টা পর্যন্ত সময়টা এখন যেন তাহার আর কাটিতেই চায় না। রাম সিং-এর কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কখনও-বা বসিয়া বসিয়া গাঁজা টানে।

গাঁজা টানিতে টানিতে তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা হয়।

রাম সিং বলে, তাহার আপনার বলিতে আর কেহ নাই।

রঞ্জনও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'আমারও। একটি মেয়ে ছিল তার শ্বশুরবাড়ীতে। কচি একটি মেয়ে রেখে শুন্‌ছি সেটাও মরেছে।'

এমনি করিয়া এই দুই আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুবান্ধবহীন প্রৌঢ়ের দিন কাটিতে থাকে।

রাম সিং বলে, 'আমি আর বাঁচবো না ভাই।'

রঞ্জন বলে 'আমিও।'

কিন্তু মরা-বাঁচার কর্তা যিনি, তিনি হয়ত ইহাদের এই কথাবার্তা শুনিয়া অলক্ষ্যে থাকিয়া একটুখানি হাসেন।

মরিব বলিলেই মরা হয় না।

মৃত্যু যখন আসে তখন একেবারে অকস্মাৎ আসিয়া পড়ে। কাহারও মুখ চাহিয়া কখনও সে থমকিয়া দাঁড়ায় না।

বছরখানেক পরে রাম সিং সত্যই একদিন শয্যা গ্রহণ করিল এবং সাতদিন ক্রমাগত জ্বর-ভোগের পর একদিন সকালে সে ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল 'রঞ্জন!'

রঞ্জন কাছেই বসিয়াছিল। বলিল, 'কি।'

রাম সিং বলিল, 'চললাম।'

'সে কি রামসিং! ছি, ওকথা বলতে নেই।'

বলিয়া বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া রঞ্জন কাঁদিয়া ফেলিল।

চোখের জল গোপন করিবার জন্য যেমনি সে মুখ ফিরাইয়াছে, রাম সিং আবার ডাকিল, 'রঞ্জন!'

চোখ মুছিয়া রঞ্জন বলিল, 'কি! কি হয়েছে তোমার বল ত' রাম সিং?'

রামসিং বলিল, 'বুকের ভেতরটা আমার কেমন যেন করছে রঞ্জন। কেউ আমার নেই জানি, তবু আজ মরতে কেমন যেন কষ্ট হচ্ছে ভাই!'

শিয়রের কাছে রঞ্জন চুপ করিয়া বসিয়াই রহিল।

রাম সিং তাহাকে আরও কাছে সরিয়া আসিতে বলিয়া চুপি চুপি বলিল, 'কিছু টাকা আছে। অনেক দিন থেকে জুগিয়ে রেখেছিলাম। তোমাকেই দিয়ে গেলাম, তুমি খরচ কোরো।'

বলিয়া সে তাহার বালিসের তলাটি দেখাইয়া দিয়া হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার পরও সে আধঘণ্টা বাঁচিয়া ছিল, কিন্তু তাহাকে ঠিক বাঁচিয়া থাকা বলে না, সে যেন মৃত্যুকে প্রাণপণে ঠেকাইয়া রাখিবার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র।

চেষ্টা সফল হইল না।

আরও দশজন ঠিক যেমন করিয়া মরে রাম সিংও মরিল ঠিক তেমনি করিয়াই।

রাত্রি তখন প্রভাত হইয়াছে।

ষ্টেশন-মাষ্টার নিজে কয়েকজন খালাসী এবং রঞ্জনকে সঙ্গে লইয়া শবদাহ করিয়া ষ্টেশনে ফিরিয়া যখন আসিলেন বেলা তখন প্রায় দুইটা।

সকলেই বলিতে লাগিল, 'বুড়ার টাকা ছিল।'

ষ্টেশন-মাষ্টার রঞ্জনকে কাছে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি ত শেষ পর্যন্ত কাছেই ছিলে ওর, টাকাকড়িগুলো কি করলে বল দেখি ?'

রঞ্জন এদিক-ওদিক তাকাইয়া ঢোঁক গিলিয়া বলিল, 'কই, টাকাকড়ির কথা ত কিছু আজ্ঞে,—জানিনা আমি !'

কথাটা রঞ্জন গোপন করিল।

ভাবিয়াছিল, দুনিয়ায় তাহার আর নিজের বলিতে কেই-বা আছে, খাইতে পরিতে দিবারও কেহ নাই, সুতরাং রাম সিং-এর এই টাকার কথা কাহাকেও সে বলিবে না। তাহাই লইয়া সে যেখানে হোক্ চলিয়া যাইবে এবং এই টাকাগুলি ভাঙ্গিয়াই জীবনের বাকি কয়টা দিন কাটাইয়া দিবে।

ষ্টেশন-মাষ্টার বিশ্বাস করিলেন না।

বলিলেন, 'এখন তুই কি করবি ভেবেচিস ? থাকবি কোথায় ?'

রঞ্জন বলিল, 'এইখানে যেখানে-হোক্ পড়ে' থাক্‌ব হুজুর।'

'খাবি কি ? গাঁজার পয়সা কে জোগাবে ?'

রঞ্জন কি জবাব দিবে প্রথমে ভাবিয়া না পাইয়া হাতজোড় করিয়া ভয়ে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, 'গাড়ীতে গাড়ীতে ভিক্ষে করব হুজুর, দু'-এক পয়সা যা পাই…'

তাহার কান্না দেখিয়া মাষ্টারের দয়া হইল। বলিলেন, 'তার চেয়ে তুই এক কাজ কর রঞ্জন। রাম সিং-এর কাজটা তুই নে। ওই ঘরে গিয়ে থাক্, আঠারো টাকা মাইনে, মন্দ কি, তোর ভালই হবে।'

কিন্তু তাহাতে রঞ্জনের আপত্তি আছে।

দিনের বেলা কাজ করিতে আপত্তি নাই, কিন্তু রাত্রে—ওখানে ওই নিরিবিলি জায়গায় একা, তাহার উপর রাম সিং যে ঘরে তাহার চোখের সুমুখে মরিয়াছে, সেই ঘরে বাস করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

ষ্টেশন-মাষ্টার হাসিলেন। রঞ্জনের সাহসের কথা তখন জানাজানি হইয়া গেছে। তিনিও জানিতেন। বলিলেন, 'চুপ ক'রে রইলি যে ? ভয় পাবে ? দূর বোকা ! ভয় কিসের ?'

এমন সময় ঘরের ভিতর ক্রিং ক্রিং করিয়া টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজিল। মাষ্টার-মশাই ভিতরে চলিয়া গেলেন।

তাহার স্থির সিদ্ধান্ত কিছুই আর সেদিন হইল না। একজন খালাসী গিয়া রাম সিং-এর কাজ করিতে লাগিল।

ষ্টেশন-ঘরের বাহিরের বারান্দায় ওজন-করা লোহার যন্ত্রটার উপর কাপড় গায়ে দিয়া জড়োসড়ো হইয়া রঞ্জন দিবারাত্রি শুইয়া থাকে।

মাষ্টার-মশাই লোকটি খুব ভাল মানুষ। প্রথম দিন তাহাকে তিনি বাসায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া এক পাতা ভাত দিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দিন কেহ আর তাহাকে ডাকে নাই।

ট্রেনের কয়েকজন যাত্রীর কাছে ভিক্ষা করিয়া তিন আনা পয়সা পাইয়াছিল। তাই দিয়া দুপুরে সে গাঁজা কিনিয়া আনিয়া ফটকের কাছে বসিয়া বসিয়া সারাদিন সে গাঁজাই খাইয়াছে আর ভাবিয়াছে—কি করা যায়!—

খালি-পেটে গাঁজা টানিয়া নেশা তাহার বেশ ভালই ধরিয়াছিল, সন্ধ্যার আগেই সে ফটকের কাছ হইতে উঠিয়া আসিয়া আবার তাহার সেই নির্দিষ্ট স্থানটিতে আসিয়া বসিল।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল মনে নাই। সকালে ঘুম ভাঙিতেই রঞ্জন তাহার কোমরে হাত দিয়াই চমকিয়া উঠিল। এদিক-ওদিক হাত্‌ড়াইয়া, কাপড় ছাড়িয়া, উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখিল, রাম সিং-এর-দেওয়া তাহার সেই টাকার থলেটি উধাও!

কে লইয়াছে, কেমন করিয়া লইয়াছে কিছুই সে বুঝিতে পারিল না। এ সম্বন্ধে কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিবার উপায় নাই, চেঁচাইয়া কাঁদিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে পারে না,—কি যে করিবে বুঝিতে না পারিয়া হতভম্বের মত রঞ্জন ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইয়া মাথায় হাত দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

মাথাটা তাহার ঘুরিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, তাহার চোখের সুমুখে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও যেন ঘুরিতেছে!

একটি দিনের মধ্যেই রঞ্জনের অবস্থা হইল ঠিক পাগলের মত। দেখিয়া মনে হইতে লাগিল, এই একটি দিনেই তাহার বয়স যেন বাড়িয়া গেছে। চোখ দুইটা কোটরে ঢুকিয়াছে, গাল দুইটি বসা, চুলগুলো উস্কোখুস্কো, দৃষ্টি

উদাস। একদিকে যাইতে আর-একদিকে যায়, ডাকিলে সাড়া দেয় না, কি বলিতে যে কি বলে নিজেই তাহা বুঝিতে পারে না।

টাকার শোকে পুরা দু'টি দিন সে জলগ্রহণ করিল না।

তিন দিনের দিন গলা দিয়া আর কথা বাহির হয় না। একেবারে মরিবার মত অবস্থা।

ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহার বাসা হইতে ষ্টেশনে আসিতেছিলেন, হঠাৎ পথের মাঝখানে হাতজোড় করিয়া টলিতে টলিতে রঞ্জন তাঁহার পথ আগ্‌লাইয়া দাঁড়াইল।—'হুজুর।'

'কিরে। এ কি চেহারা তোর?'

রঞ্জন বলিল, 'ফটকের চাকরিটি আমায় দিন।'

মাষ্টার-মশাই বলিলেন, 'দিতেই ত চেয়েছিলাম রে গাধা!'

রঞ্জন বলিল, 'আজ তাহ'লে আমি আমার ছোট নাতনীটিকে নিয়ে আসি হুজুর। তাকেই কাছে রাখব।'

মাষ্টারের দয়া হইল। বলিলেন, 'তাই যা। আমার বাসায় খেয়ে যাস্।'

দু'দিন না খাইয়া অন্তরাত্মা তাহার কাঁদিতেছিল; খাবার নামে মাষ্টার-মশাই-এর পায়ের কাছে একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া একটি প্রণাম করিয়া বলিল, 'যে-আজ্ঞে।'

ফটকের চাকরিটি করিবার ইচ্ছা তাহার মোটেই ছিল না, তবু তাহাকে করিতে হয়।

পেটের জ্বালা বড় জ্বালা!

মানুষ দেয় ত বিধাতা দেয় না। টাকাগুলি থাকিলে এ-কষ্ট আর সহ্য করিতে হইত না।

সাত বছরের ছোট নাতনীটি। নাম কালী, পায়ে মল, নাকে নোলক,—চব্বিশ-ঘণ্টা দাদামশাই-এর কাছে-কাছে থাকে, রান্নার সময়ে এটা-সেটা যোগাড় করিয়া দেয়, শুকনো কাঠ কুড়াইয়া আনে, ফুঁ দিয়া উনান ধরায়, এক-এক-দিন তরিতরকারি আনিবার জন্য একলাই সে হাটে যায়। দূর হইলেও হাটে যাওয়ার কষ্ট কিছুই নাই। যাইবার সময় রঞ্জন তাহাকে 'বাসে' চড়াইয়া দেয়, পানিহাটির হাটের কাছে পথের ধারে গিয়া নামে, আসিবার

সময় আবার 'বাসে' চড়িয়া আসে। বাসওয়ালারা সকলেই তাহাকে চেনে। টিকিট করিতে হয় না।

রঞ্জন দিনের বেলা বলে, 'কালী, ঘুমো।'

তাহার পর সন্ধ্যা হইতে তাহার জাগিবার পালা। ঘুম পাইলেও রঞ্জন তাহাকে ঘুমাইতে দেয় না। গল্প বলিয়া বলিয়া জাগাইয়া রাখে, কোনোদিন যদি-বা ঢুলিয়া ঢুলিয়া পড়ে ত' রঞ্জন তাহাকে সজোরে একটা চিম্‌টি কাটিয়া দেয়, শেয়াল ডাকিলে ভয় দেখায়, গাছের তলায় অন্ধকারটাকে দেখাইয়া বলে, 'ওইখানে ভূত আছে, ঘুমোলেই ধ'রে নিয়ে যাবে।' বলিয়া নিজেই সে চোখ বুজিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে।

কিন্তু কালীর সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! দিনের বেলা যতই সে ঘুমাক না কেন, সন্ধ্যা হইলে রাজ্যের ঘুম আসিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরে, চোখ দুইটা ছোট হইয়া আসে। রঞ্জনের পায়ের কাছে মাটির উপরেই সে ঘুমাইয়া পড়িতে চায়।

রঞ্জন বলে, 'আসুক্ তবে রাম সিং, ধরুক্ তোকে!'

রাম সিং-এর আসা তেমন আশ্চর্য কিছু নয়!

সেদিন সে রাত্রের ট্রেনখানা পার করিয়া উত্তর দিকের ফটকটা বন্ধ করিবে, এমন সময় রাস্তার ধারের ওই বাঁশগাছের তলা হইতে এমন একটা শব্দ তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল যে, সে না পারিল ছুটিয়া পলাইতে, না পারিল সাহস করিয়া আগাইয়া দেখিতে!—অবিকল রাম সিং-এর গলার কাশির খুক্‌খুক্ শব্দ! কালী ছিল দূরে দাঁড়াইয়া, তাহাকেও কাছে ডাকিবার মত সামর্থ্য নাই, রঞ্জনের আপাদ-মস্তক তখন শিহরিয়া উঠিয়াছে, মাথার ভিতরটা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, পা-দুইটার অবস্থা নিতান্ত খারাপ,—সে যেন কাঠের পা! না পারে আগাইতে, না পারে পিছাইতে!

আর-একদিন অম্‌নি—রাত্রি তখন দুইটা বাজিয়া গেছে, সাড়ে-তিনটার গাড়ীটা পার করিবার জন্য রঞ্জনের ঘুম ভাঙিয়াছে। অন্ধকার রাত্রি। কালী আর কিছুতেই উঠে না! যত উঠাইবার চেষ্টা করে, ততই সে হাউ-মাউ করিয়া কাঁদিয়া ওঠে। অবশেষে ভাবিল, সে নিজেই বাহির হইবে। হাতে লণ্ঠন—ভাবনা কি! রাম সিং তাহার অনিষ্ট কিছু করিবে না।

সাহসে ভর করিয়া হড়াম্ করিয়া দরজা খুলিয়া যেমন বাহির হওয়া আর অম্‌নি—

'বাপ্‌রে !'

বলিয়া লণ্ঠন-সমেত ডিগ্‌বাজি খাইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঞ্জন একেবারে ফটকের কাছে !

মরে নাই—এই তাহার চৌদ্দপুরুষের ভাগ্য !

হাত ফুটিয়াছে, নাক ফুটিয়াছে, পায়ের খানিকটা ছড়িয়া গিয়া রক্ত পড়িয়াছে। লণ্ঠনের কাঁচটা অত্যন্ত পুরু, ছিট্‌কাইয়া দূরে পড়িয়াও সেটা ভাঙ্গে নাই।

সেইদিন হইতে তাহার ধ্রুব বিশ্বাস—রাম সিং এখনও সে জায়গাটার মায়া পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও সে রোজই সেখানে আসে। সাদা ধপ্‌ধপে কাপড় পরিয়া খড়ম্ পায়ে দিয়া দরজার কাছে হাত পাতিয়া সে গাঁজা খাইতে চায় !

সেদিন তাহাকে সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে।

রঞ্জনকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত, এবং ভালবাসিত বলিয়াই বোধ করি সেদিন সে তাহাকে ভয় পাইয়া পড়িয়া যাইতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল, তাহা না হইলে কলিকাটা হয়ত চাহিয়াই বসিত।

রঞ্জন ভাবে তাহার সাহস আজকাল অত্যন্ত বাড়িয়াছে বলিয়াই এখানে সে কাজ করিতে পারে, অন্য লোক হইলে কবে পলাইত তাহার ঠিক নাই।

অন্ধকার রাত্রে একটুখানি বাতাস বহিলেই রাস্তার পাশে বাঁশ-ঝাড়গুলো ঝড়্ ঝড়্ কট্ কট্ করিয়া নানারকম শব্দ করিতে থাকে, 'বাস্' চলাচল থামিবামাত্র শেয়াল-ডাকা শুরু হয়, তাহার উপর ভূতের উৎপাত !

যে তাহার টাকা চুরি করিয়াছে রঞ্জন তাহাকে মনে-মনে অভিসম্পাত করে। আজ যদি তাহার সে টাকাগুলি থাকিত ! হায় হায়, বৃথাই তাহা হইলে এ লাঞ্ছনা তাহাকে আর সহ্য করিতে হইত না। হে ভগবান্ ! যে তাহার টাকা লইয়াছে সে যেন মরে। ওই টাকা তাহার যেন শ্রাদ্ধে খরচ হয় !

বলিতে বলিতে ঝর্ ঝর্ করিয়া সে কাঁদিয়া ফেলে।

এম্‌নি করিয়াই দিন চলে।

কালী এখন বেশ বড় হইয়াছে। রান্নাবান্না নিজেই করে। কিন্তু ঘুম তাহার এখনও ঠিক তেমনিই আছে।

রঞ্জন তাহাকে গালাগালি দেয়।—'মর্‌ হারামজাদী, ওই ঘুমিয়ে-ঘুমিয়েই মর্‌ তুই।'

কালী হাসে। বলে, 'এত গালাগালি কেন দাও বলত তুমি, লোকে শুন্‌লে যে হাসে!'

রঞ্জন আজকাল সমস্ত দুনিয়াটার উপরেই সর্বদা চটিয়াই থাকে। বলে, 'হাসে ত তোর কি হারামজাদী! তুই মর্‌ না! মলেই ত আমি বাঁচি।'

'আমিও বাঁচি।' বলিয়া কালী রাগ করিয়া ঘরের কাজ-কর্ম ফেলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

রঞ্জন তখন আবার নিজেই ধীরে ধীরে উঠিয়া যায়। গায়ে হাত দিয়া বলে, 'রাগ করেছিস দিদি? ছি! বুড়োর উপর রাগ করতে আছে?'

বলিয়া নিজেই খানিকটা কাঁদে। বলে, 'আমার কপাল! নইলে এত লোক মরে, আর আমি বেঁচে থাকি!'

ফটকের দক্ষিণ দিকে মাইলখানেক দূরে ছোট্ট একখানি গ্রাম, নাম—হরিশপুর।

হরিশপুরে সেদিন এক মহা অঘটন ঘটিল। বিদেশী এক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন—গ্রামে হোমিওপ্যাথী ডাক্তারী করিতে। ভাবিয়াছিলেন, ছোট গ্রাম, ওখানে বসিলে হয়ত পয়সা-কড়ি হইতে পারে। তাই শহর ছাড়িয়া একা আসিয়া হরিশপুরে তিনি বাস করিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল—ভবিষ্যতে উন্নতি যদি কোনোদিন করিতে পারেন তখন মেয়েছেলে আনিবেন।

কিন্তু এম্‌নি বিধির নির্বন্ধ যে, মেয়েছেলে তাঁহাকে আনিতে হইল না, হঠাৎ সকালে একদিন তাঁহার কলেরা হইল এবং সেই নির্বান্ধব অবস্থায় স্ত্রী-পুত্র-কন্যা আত্মীয়-স্বজন হইতে বহুদূরে রাত্রি আটটার সময় হরিশপুর গ্রামেই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

কলেরা হইবার পর হইতেই গ্রামের লোক সেবা-যত্নের ত্রুটি কিছুই করে

নাই। দুপুরে তাঁহার বাড়ীতে একখানা টেলিগ্রামও করিয়াছে কিন্তু তখনও পর্যন্ত দেশ হইতে কেহ আসিয়া পৌঁছে নাই।

মুশকিল বাধিল সৎকারের ব্যবস্থা লইয়া। মৃতদেহ এমন করিয়া ঘরের মধ্যে ফেলিয়া রাখা চলে না, তাহার উপর কলেরা রোগী, গ্রাম হইতে যত শীঘ্র বাহির করিয়া দেওয়া যায় ততই ভালো, অথচ মুখাগ্নি করিবার লোক একজন দেশ হইতে না আসা পর্যন্ত কি-ই বা করা যায়—এই লইয়া সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িল।

শীতকাল। এম্নিই সহজে লোকজন ঘরের বাহির হইতে চায় না, তায় আবার রাত্রিকালে ক্রোশখানেক পথ অতিক্রম করিয়া শ্মশানে যাইতে কেহই প্রথমে রাজী হইল না। পরে জনকয়েক ছোকরাকে অতিকষ্টে রাজী করাইয়া ডাকিয়া আনা হইল। বাড়ী-বাড়ী কাঠ-কয়লা সংগ্রহ করিয়া গাড়ী বোঝাই দিয়া একজন চাষার ছেলে সেগুলা সর্বাগ্রে শ্মশানে ফেলিয়া দিয়া আসিল। যে চারজন লোক দয়া করিয়া শবদাহের জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কথা হইল, মৃতদেহটিকে তাহারা গ্রাম হইতে বাহির করিয়া লইয়া গিয়া ফটকের কাছে কোথাও নামাইয়া রাখিয়া অপেক্ষা করিবে। এখনও যখন লোকজন কেহ তাঁহার দেশ হইতে আসিল না, রাত্রি সাড়ে-বারোটা কিম্বা দেড়টার ট্রেনে নিশ্চয়ই আসিবে, এবং আসিলে তাহাকে ওই ফটকের পাশ দিয়াই গ্রামে আসিতে হইবে, সুতরাং ওই পথে তাহাকে একেবারে শ্মশানে লইয়া যাওয়াই ভালো।

সেদিন বোধকরি অমাবস্যার রাত্রি। কোলের মানুষ চেনা যায় না—এত অন্ধকার। একজন লণ্ঠন লইয়া আগে আগে চলিল, আর বাকি চারজনে ছোট একটি দড়ির খাটিয়ায় মৃতদেহ লইয়া পশ্চাতে চলিতে লাগিল। চারজনে ভারি মৃতদেহ অতখানা পথ বহিয়া লইয়া যাওয়া শক্ত। মাঝে মাঝে নামাইয়া কাঁধ পাল্টাইয়া ফটকের কাছে তাহারা যখন আসিয়া পৌঁছিল, সাড়ে-বারোটার গাড়ীটা তখনও আসে নাই। সবেমাত্র একটা 'বাস্' পার হইয়া গেল বলিয়া ফটক তখনও খোলা। রঞ্জনের ঘরে আলো জ্বলিতেছিল। দেখা গেল, সে খাইতে বসিয়াছে।

শব-বাহকেরা পরামর্শ করিল যে, জানিতে পারিলে রঞ্জন হয়ত মৃতদেহ এখানে নামাইতে দিবে না সুতরাং তাহাকে কিছু না জানানোই উচিত।

এই ভাবিয়া নীরবে তাহারা ফটক পার হইয়া খাটিয়াটাকে ধীরে-ধীরে লাইনের পাশে নামাইয়া রাখিয়া সকলে মিলিয়া রঞ্জনের ঘরের দরজার কাছে গিয়া ডাকিল, 'কি করছ রঞ্জন, খেতে বসেছ নাকি ?'

এত রাত্রে লোকজন দেখিয়া রঞ্জন অবাক্ হইয়া একবার তাহাদের মুখের পানে তাকাইল। কিন্তু কাহাকেও ভাল চিনতে না পারিয়া বলিল, 'কে ?'

গুরুপদ বলিল, 'আমি গুরুপদ—হরিশপুরের। চিনতে পারছ না ?'

গুরুপদকে রঞ্জন চেনে। বাজারের ফেরত 'বাস্' হইতে নামিয়া প্রায়ই সে রঞ্জনের কাছে গাঁজা খাইয়া যায়।

গুরুপদ বলিল, 'খাও, ততক্ষণ আমরা তামাকটা তৈরী করি। সাড়ে-বারোটার গাড়ীতে একজন লোক আসবে ভাই, কে আর যায় ষ্টেশন পর্যন্ত, ভাবলাম, এই পথেই ত' আসবে, তার চেয়ে এইখানে ব'সে ব'সে তামাকটাও খাওয়া যাক্, গল্পও করা যাক্।'

এত রাত্রে গল্প করিবার লোক পাইয়া রঞ্জন অত্যন্ত খুশী হইয়াই তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া বাহিরে আসিল।

গাঁজা খাইয়া গল্প করিতে করিতে ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল।

কিন্তু বসিয়া বসিয়া আরও এক ছিলিম গাঁজা খাইয়া তাহারা বহুক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও দেখিল, হরিশপুরের কোনও লোক সে-পথ দিয়া পার হইল না। এ ট্রেনেও কেহ আসে নাই।

অবার সেই রাত্রি দেড়টায় ট্রেন।

তাহার পর তিনটায়।

রঞ্জন বলিল, 'নিয়মকানুন সব ঘন-ঘন বদলাচ্ছে। বুঝলে গুরুপদ, আগে বেশ ছিল। আমার হয়েছে মুশকিল। রাত জেগে-জেগে হয়রান হয়ে গেলাম ভাই।'

গুরুপদ জিজ্ঞাসা করিল, 'তাহ'লে ত সারারাতই তুমি এক রকম জেগে রইবে বল ?'

বাহাদুরী করিয়া রঞ্জন বলিল, 'জেগে কি রকম? এই শীতকালে ঠায় এই পথের ধারে বসে বসে আমায় পাহারা দিতে হয় সেই তিনটে পর্যন্ত। তিনটের পর একটু গড়িয়ে নিই। অভ্যেস হয়ে গেছে, বুঝলে গুরুপদ, অভ্যেস্ হয়ে গেছে।'

গুরুপদ তাহার সঙ্গীদের চোখের ইশারা করিয়া বলিল, 'আর কেন, ওঠো তাহ'লে! উঠি রঞ্জন।'

এতক্ষণ বেশ ছিল। রঞ্জন বলিল, 'বসোই না। দেড়টার ট্রেন আর কতক্ষণ! দেখেই যাও।'

'না, সে আর আসবে না বোধ হয়।' বলিয়া গুরুপদ তাহার সঙ্গীদের ফটকের বাহিরে লইয়া গিয়া চুপি-চুপি বলিল, 'যাহয় হবে এবার, দেখা যাবে কাল সকালে। শীতে আর আমাদের কর্মভোগ কেন, চল বাড়ী যাই।'

বাড়ী যাইবার ইচ্ছা সকলেরই। কিন্তু তবু এ ব্যাপারটা কেমন যেন কাহারও উচিত বলিয়া মনে হইল না। মৃতদেহ পড়িয়া রহিল পথের পাশে —তাহারা বাড়ী চলিল—

অনুচিত বুঝিয়াও এক-পা এক-পা করিয়া আগাইতে আগাইতে তাহারা মাঠের মাঝে অনেকখানি পথ চলিয়া আসিল।

হঠাৎ সেই ঘন অন্ধকার শীত-রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে কাহার যেন একটা বিকট চীৎকার তাহাদের কানে আসিয়া বাজিতেই সকলেই একসঙ্গে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল।

উৎকর্ণ হইয়া আবার তাহারা শুনিবার চেষ্টা করিল কিন্তু আর-কিছুই শোনা গেল না।

গুরুপদ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, 'ব্যাটা দেখেছে এইবার। দেখেই হয়ত আঁৎকে চেঁচিয়ে উঠেছে। বুঝলি?'

সকলেই একটুখানি কৌতুক অনুভব করিল। বলিল, 'ঠিক্। তাই বটে।'

বলিয়াই আর সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া আবার তাহারা পথ চলিতে লাগিল।

পথের ধারে একটা চণ্ডীমণ্ডপে আলো জ্বালিয়া আগা-গোড়া মুড়ি দিয়া বসিয়া তখনও পর্যন্ত জনকয়েক মুরুব্বি-মাতব্বরগোছের লোক ডাক্তারবাবুর এই আকস্মিক মৃত্যুর কথা লইয়াই আলোচনা করিতেছিল, এত শীঘ্র তাহাদের শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হয়ে গেল এরই মধ্যে? সে কি রে?'

আগাগোড়া ব্যাপারটা গুরুপদ তাহাদের জানাইয়া বলিল, 'আমরা আর পারব না বাপু এই শীতের রাতে মড়া আগ্‌লে বসে' থাক্‌তে, তোমরা যাহোক্ এর ব্যবস্থা টেবস্থা কর।'

কিন্তু সকলেই তাহাদের দোষ দিতে লাগিল।

'ছি ছি, তোরা করেছিস্ কি! লোক না এলো, অপেক্ষা করতে না পারলি, —তোরা দাহ করেই ফিরে' এলি না কেন? রাত্রিকালে—মড়া ফেলে দিয়ে এলি, শেয়ালে-কুকুরে টানাটানি করবে। ছি বাবা ছি, চল্—আমরাও যাই, চল হে চল, আহা বিদেশী ব্রাহ্মণ—'

বলিতে বলিতে সেই পথেই তাহাদের আবার ফিরাইয়া লইয়া বৃদ্ধেরাও চলিল।

গুরুপদ সারারাস্তা শুধু এই কথা বলিতে বলিতে চলিল যে, না, এত বোকা-বেকুব্ তাহারা নয়, মড়াটাকে শেয়াল-কুকুরে টানাটানি কখনই করিবে না। মৃতদেহ তাহারা নিরাপদ স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছে, রঞ্জন সারারাত জাগিয়া সেখানে পাহারা দিবে।

তাহারা ফটক পার হইয়া লাইনের ধারে গিয়া দেখিল, তাহারা যাহা বলিয়াছিল ঠিক তাই। রঞ্জন পাহারা দিতেছে কি না কে জানে, তবে দেখা গেল, মৃতদেহের অত্যন্ত সন্নিকটে সে শুইয়া রহিয়াছে।

শুইয়া থাকিবার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া হাতের লণ্ঠন দুইটা তুলিয়া তাহারা যাহা দেখিল, তাহা যেমন বিস্ময়কর তেমনি ভয়াবহ! রঞ্জন বোধকরি মৃতদেহের ঢাকা খুলিয়া দেখিতে গিয়াছিল, এবং দেখিতে গিয়া ভয়ে সে আঁতকাইয়া চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া পড়িয়াছে।

ঘুরিয়া পড়িয়া আর উঠিতে পারে নাই।

দারুণ ভয়ে তাহার হৃৎস্পন্দন সহসা বন্ধ হইয়া গেছে।

বন্ধু গুরুপদ ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'সেই যে শব্দ—বলেছিলাম না!—আমার অনুমান কখনও ব্যর্থ হয় না।'

* * * * *

রঞ্জন বলিত, 'নাতনীটা শুধু ঘুমোতেই এসেছে।'

সে-কথা সত্য।

কালীর ঘুম তখনও ভাঙ্গে নাই। বাহিরে যে এতবড় একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেছে তাহার বিন্দুবিসর্গও সে জানে না।

না জানাই ভালো।

আহা ঘুমোক্!

দোষ কাহারও দেওয়া চলে না।

মেয়ে মস্ত ডাগর হইয়াছিল, তাহার উপর চেহারাটা তাহার এমন বিশ্রী যে, যাহারা দেখিতে আসে, একবার মাত্র দেখিয়াই 'খবর দেবো' বলিয়া সেই যে চলিয়া যায়—খবরও দেয় না, ফিরিয়াও আসে না।

কাজেই বুড়া বাপকে তাহার রাজী হইতে হইয়াছিল।

এদিকে হরিগোপালের অবস্থাটাও একটুখানি খুলিয়া বলি। হরিগোপাল তাহার বিধবা মায়ের ওই একটিমাত্র পুত্র—আদুরে গোপাল। পৈতৃক বাড়ী একখানি ছিল। বাপের মৃত্যুর পর দেনার দায়ে বাড়ীখানি বন্ধক পড়িয়াছে। মা ভাবিয়াছিল—ছেলে তাহার বড় হইয়া লেখাপড়া শিখিয়া রোজগার করিয়া বন্ধকী বাড়ী ছাড়াইয়া ফেলিবে। কিন্তু রোজগার করা দূরে থাক, ছেলে তাহার বছর-দুই ইস্কুলে গিয়া সেই যে ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করিল—ব্যস্, ইহার উহার সঙ্গে আড্ডা মারিয়া, ঝগড়া করিয়া, বিড়ি টানিয়া ফুর্তি করিয়া দিন কাটাইতে লাগিল—ইস্কুলের নাম পর্যন্ত আর মুখে আনিল না।

মা ভাবিল, ছেলে এইবার বড় হইয়াছে,—কুলীনের ছেলে, ছেলের বিবাহ দিয়া কোন রকমে হাজার দেড়েক টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেই বন্ধকী বাড়ীটা সে ছাড়াইয়া লইবে।

কিন্তু কাজের বেলা দেখিল, এত সুন্দর কুলীনের ছেলের জন্য দেড় হাজার দূরের কথা, দেড় শ' টাকাও কেহ দিতে চায় না।

শেষ বেলা রাজী হইলেন ওই বুড়া ভদ্রলোক—হারাধন চাটুজ্যে। হারাধন দেখিলেন, আর কিছু না হোক, ছেলেটি দেখিতে ভালো। বুড়ী এক মা ছাড়া বাড়ীতে তাহার কন্যার রূপগুণের নিন্দা করিবার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি আর কেহ নাই। সুতরাং বিবাহ যদি দিতে হয় ত' এইখানে দেওয়াই ভাল।

হরিগোপালের মা দেখিল, নগদ দু'হাজার টাকা আর কেহ যখন দিতেই চায় না, তখন হোক্-গে কালো-কুৎসিত মেয়ে, ছেলের বিবাহ এইখানে দেওয়াই উচিত।

কাজেই উভয় পক্ষের সম্মতিতে বিবাহ ঠিক হইয়া গেল এইখানেই। কলিকাতা শহর। হরিগোপাল থাকে শ্যামবাজারে, আর হারাধন চাটুজ্যে থাকেন শ্যামপুকুরে। বেশি দূরের পাল্লাও নয়। মেয়েকে যখন তখন তিনি দেখিয়া আসিতে পারিবেন।

কিন্তু বিবাহের পরদিন সামান্য একটা গণ্ডগোল বাধিল।

গণ্ডগোল টাকাকড়ির ব্যাপার লইয়া। হরিগোপাল বরযাত্রী বন্ধুবান্ধব লইয়া বিবাহ করিতে আসিয়াছে। মেয়েটি দেখিতে ভাল নয় সকলেই জানে। কাজেই কালো-কুৎসিত মেয়ে দেখিয়াও কেহ কোনও উচ্চবাচ্য করিল না। বিবাহ নির্বিঘ্নে চুকিয়া গেল।

হরিগোপালের মা তাহাকে বারবার বলিয়া দিয়াছিল, 'আমি ত' বাবা বিয়েবাড়ী যেতে পারি না, সবাই বারণ করছে। দেখিস যেন টাকাগুলি বেশ করে গুনে বাজিয়ে দেখেশুনে নিস্। অত অত টাকা যেখানে-সেখানে রাখিসনি যেন।'

কলিকাতা শহরের বিবাহ। আহারাদির পর বরযাত্রীরা একে একে সকলেই চলিয়া গেল। বরকর্তা বলিয়া পাড়ার যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন একজোড়া থান কাপড় বিদায়ী পাইয়া তিনি অসুস্থতার অছিলায় বিদায় লইলেন। রহিল শুধু হরিগোপাল নিজে।

আগামী কল্য প্রাতে কুশণ্ডিকা চুকিয়া গেলে বধূ লইয়া সে বাড়ী ফিরিবে।

হারাধন বলিলেন, 'টাকাগুলি আমি ঠিক করেই রেখেছি বাবা, রাত্রে এই বিয়ের গোলমালে নিজের কাছে কোথায় রাখবে, তার চেয়ে কাল সকালে বুঝিয়ে দেবো।'

হরিগোপাল নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিল।

কিন্তু পরদিন কুশণ্ডিকা চুকিতেই হরিগোপাল বলিল, 'টাকা?'

'হ্যাঁ বাবা, দিচ্ছি, এসো আমার সঙ্গে।' বলিয়া হারাধন তাঁহার জামাতাকে বাড়ীর ভেতর লইয়া গিয়া অতি সন্তর্পণে কোমরে বাঁধা একটি চাবি বাহির করিয়া কাঠের একটি বাক্স খুলিলেন। তাহার পর নোটের তোড়া বাহির করিয়া একটি একটি করিয়া গনিয়া নোটগুলি হরিগোপালের হাতে দিয়া বলিলেন, 'তুমিও একবার গুনে ত্যাখো, বাবা।'

হরিগোপাল দেখিল একহাজার টাকা। বলিল, 'আর এক হাজার?'

হারাধন বলিলেন, 'দেবো বাবা, আর এক হাজার দু'চারদিনের মধ্যেই দেবো। মেয়ে আমার রইলো তোমার কাছে, টাকা যাবে কোথায়? টাকা দেবো।'

নূতন শ্বশুর। হরিগোপাল গণ্ডগোল গোলমাল কিছুই করিতে পারিল না। মুখ ভারী করিয়া বৌ লইয়া বাড়ী ফিরিল।

হরিগোপালের মা তারাসুন্দরী ভাবিয়াছিল একটি মাত্র ছেলে, বৌ-ভাতে কিছু খরচ তাহাকে করিতেই হইবে। করিলেও দু'হাজার টাকার মধ্যে দেনা শোধ করিয়াও কিছু থাকিবে নিশ্চয়ই।

কিন্তু বৌ-ভাতের খরচ তাহাকে ওই হাজার টাকা হইতেই করিতে হইল। বাকি রহিল বাড়ী ছাড়ানো।

অথচ দিনের পর দিন যাইতে থাকে, টাকা আর হারাধনের কাছ হইতে আসে না।

হরিগোপাল দু'তিনবার শ্বশুরের কাছে গিয়া খালি হাতে ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'টাকা দিলে না মা, এবার তুমি একবার যাও।'

তারাসুন্দরী শেষে নিজেই গেল।

টাকা অবশ্য সেও আনিতে পারিল না, তবে নূতন বৈবাহিকের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করিয়া ইহাই স্থির করিয়া আসিল যে, টাকা না পাইলে মেয়েকে সে কিছুতেই আর পাঠাইবে না। হারাধন তাহাই চাহিতেছিলেন। মনে-মনে আশ্বস্ত হইয়া মনে-মনেই বলিলেন, 'বাঁচা গেল।'

বিবাহের সময় সাজসজ্জা রং-ঢংএ যাহা ঢাকা ছিল, দু'দিন পার হইতে না হইতেই কালো-বৌ কমলিনীর সে আবরণ অনাবৃত হইয়া গেল। দেখা গেল, মাথায় চুল তাহার একেবারেই নাই। যাও বা আছে তাও আবার চিরুনি দিয়া আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে গোছা গোছা উঠিয়া আসে।

তারাসুন্দরী বৌ-এর চুল দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। বলিল, 'একি বৌমা! তোমার না মস্ত বড় খোঁপা দেখেছিলাম!'

কমলিনী মাথা হেঁট করিয়া ধীরে-ধীরে বলিল, 'অসুখের পর থেকে চুলগুলো উঠে যাচ্ছে। ভাল একটা তেল মাখতে হবে।'

পুরাপুরি টাকা পাইলে তারাসুন্দরী হয়ত এ-সব সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু এখন আর সহ্য হয় না। বলিল, 'তা ফুলেল তেল মাখতে হয়, তোমার সেই চামার বাপ-মিন্সেকে বোলো, এনে দেবে।'

এই বলিয়াই সে মাটি হইতে কালো রঙের বলের মত পাকানো ন্যাকড়ার বাণ্ডিলটা হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া বলিল, 'ও মা, এইটে দিয়ে বুঝি খোঁপাটা বড় করেছিলে? আর এই এত-এত পরচুলো!'

ন্যাকড়ার বলটা টিপ করিয়া বৌ-এর গায়ের উপর ছুঁড়িয়া দিয়া বলিল, 'তোমাদের দোষ নেই মা, আমার কপাল!'

পাড়াপড়শী মেয়েরা বৌ দেখিয়া ঠোঁট উল্‌টাইয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়। টাকার কথাটা কেহ জানে না, তাই অনেকে মুখের উপরেই বলে, 'বলি হ্যাঁ মা, তোমার দশটা-পাঁচটা নয়, একটি ছেলে, আর তারই বৌ করলে কিনা—'

কথাটা তাহাকে শেষ করিতে না দিয়াই তারাসুন্দরী বলে, 'সেকথা আর বোলো না মা! ও-মেয়ে কি মিন্সে আমায় দেখিয়েছিল গা! দেখালে এক মেয়ে, বিয়ে দিলে আর এক মেয়ের সঙ্গে। আমি এখন বোবা হয়ে বসে আছি মা!'

কিন্তু কমলিনী এ-সব সহ্য করিয়া চুপ করিয়া থাকিবার মেয়ে নয়। পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া বলিয়া উঠিল, 'মিছে কথা বোলো না মা, বাবা তোমাকে অন্য মেয়ে দেখায়নি, দেখিয়েছিল আমাকেই। বিয়ে তুমি দিলে কেন, আমি কালো-কুচ্ছিত, আমার রূপ নেই গুণ নেই, বিয়ে তুমি না দিলেই পারতে! আমার বাবার টাকা আছে, সেই টাকার লোভে কত কত বড়লোকের ছেলে আমাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতো।'

তারাসুন্দরী বলে, 'শোনো মা শোনো, বিয়ের কনের মুখের কথা শোনো! চুপ করে থাক বলছি, নইলে পোড়া কাঠ দিয়ে তোমার ও প্যাঁচার মত মুখ আমি ভেঙ্গে দেবো।'

'হ্যাঁ, ভেঙ্গে সবাই ছায়! দিয়ে ছাখো না একবার!'

পাড়ার একটি মেয়ে বৌ-এর কাছে আগাইয়া গিয়া তাহাকে ঘরের ভিতর টানিয়া আনিয়া বলিল, 'ছি! ও-রকম করে কথাগুলো বোলো না বৌ! লোকে নিন্দে করবে যে। তুমি একটু খোসামুদি করে শাশুড়ীর মন জুগিয়ে চলো, বুঝলে? আখেরে তোমারই ভাল হবে।'

বৌ কি বুঝিল কে জানে। চুপ করিয়া রহিল।

প্রতিবেশিনীর কথাটা বোধকরি কমলিনীর মনে ধরিয়াছিল, তাই সেইদিনই রাত্রে সে হরিগোপালের সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিল। বলিল, 'হ্যাঁগা, শুনলাম আমার চেহারা ভাল নয় বলে আমাকে তোমার ভাল লাগে না!'

বিবাহের পর হইতে হরিগোপাল মনের দুঃখেই দিন কাটায়। ভাল করিয়া বৌ-এর সঙ্গে কোনোদিনই কথা বলে না। সেদিন বৌ-এর এইরকম কথা শুনিয়া ভাবিল বুঝি সে এত দিনে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়াছে। হয়ত তাহার জন্য মনে মনে অনুতাপ করিতেছে। বলিল, 'তোমার বাবার কাণ্ডটা দেখলে! দু'হাজার টাকা দেবো বলে একহাজার টাকার বেশি দিলে না! ভেবেছিলাম—বাড়ীটা ছাড়াব—কিন্তু—'

কথাটা কমলিনী তাহাকে শেষ করিতে দিল না। বলিল, 'আচ্ছা, বাবাকে আমি বলব দাঁড়াও।'

হরিগোপাল চুপ করিয়া রহিল।

কমলিনী বলিল, 'কিন্তু হ্যাঁগা, আমাকে তোমরা সব খারাপ খারাপ বল, কিন্তু আমার খারাপ কোনখানটা শুনি? লোকের কোমরটা সরু, এইখানটা মোটা এইখানটা সরু, আর আমার ছাখো ত' সব সমান, সব নিটোল। তবে হ্যাঁ, আমার গায়ের রং আর এই চুল......তা এ'দুটো এমন ছিল না, হয়েছে আমার অসুখের পর থেকে। আমার রং ছিল খুব ফর্সা, আর চুল?—দেখলে তোমার মাথা ঘুরে যেতো, চুল ছিল এই—এইখান পর্যন্ত। আবার হবে দেখো। এক শিশি ভাল তেল এনে দিও।'

চুপ করিয়া কথাগুলা হরিগোপাল সবই শুনিল। মুখের হাসি সে কোনো রকমে চাপিয়া রাখিয়া বলিল, 'থামো। রূপের বড়াই আর কোরো না তুমি! রূপ তোমার নেই। রূপও নেই গুণও নেই।'

কমলিনী যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ধারণা রূপ তাহার আছে। কেমন করিয়া যে সে ধারণা তাহার হইয়াছে কে জানে। এমন করিয়া মুখের উপর এই স্পষ্ট সত্যকথাটা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না। বলিল, 'হ্যাঁ, তা তোমরা বলবে বইকি! মায়ে-ব্যাটায় ষড়যন্ত্র ক'রে, 'যেদিন থেকে এসেছি সেদিন থেকে বলতে আরম্ভ করেছ রূপ নেই রূপ নেই! বাবা রে বাবা, আর পারিনে বাবা! বলি—নিজের রূপটার দিকে একবার তাকিয়ে

দেখেছ? আমার বাবাকে এক ছোঁড়া নাপিত রোজ কামাতে আসে, তোমার চেহারাটা ঠিক তার মত। আমার রূপ নেই! আমার মত সুন্দরী মেয়ে তুমি যে পেয়েছ এই ঢের! বলি—কোন রূপবতী রাজকন্যে তোমাকে বিয়ে করতো শুনি?'

হরিগোপাল শুইয়া ছিল, কথাগুলা শুনিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। বলিল, 'খবরদার বলছি, চুপ করে থাক, নইলে—'

'নইলে কি করবে শুনি?'

'কি করব?' বলিয়া ঠাস করিয়া তাহার গালে এক চড় মারিয়া বলিল, 'দূর হয়ে যা এখান থেকে, বেরো বলছি আমার চোখের সুমুখ থেকে!'

চড় খাইয়া কমলিনী চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।—'ওরে বাবারে, এ কোন্ ডাকাতের হাতে এসে পড়লাম রে!' বলিয়া এমনি বিনাইয়া বিনাইয়া প্রাণপণে সে চেঁচাইতে লাগিল যে, পাশের ঘর হইতে তারাসুন্দরী ছুটিয়া ত' আসিলই, এমন কি পাড়াপড়শী সকলেরই ঘুম ভাঙিয়া গেল।

তারাসুন্দরী দরজায় ধাক্কা দিয়া বলিল, 'দরজা খোল গোপাল, আমি একবার দেখি ও সর্বনাশীকে!'

'তুমি আর মেয়ে পেলে না মা, ছি ছি ছি ছি!' বলিতে বলিতে হরিগোপাল উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল।

তারাসুন্দরী ঘরে ঢুকিয়া বৌ-এর কাছে গিয়া বলিল, 'ক্ষ্যামা দাও মা, এই গলায় কাপড় নিয়ে জোড়হাত করে বলছি তোমাকে, দুপুর রাত্তিরে এমন ষাঁড়ের মতন গলা বের করে আর চেঁচিও না! কেলেঙ্কারীর আর বাকি কিছু রাখলে না মা, ছি। ছি! এমন বৌও ঘরে আনলাম! ছিঃ!'

কমলিনী বলিল, 'হ্যাঁ, মেরে তোমরা খুন করে দেবে আর আমি চুপ করে রইবো, না? না রইলেই নয়।'

তারাসুন্দরী বলিল, 'তাই বলে এমনি পাড়ার লোককে শুনিয়ে শুনিয়ে কেলেঙ্কারী করবে? কে তোমাকে মেরেছে, কে?'

কমলিনী বলিল, 'ওই তোমার ওই চামার ছোটলোক ব্যাটা মেরেছে, আবার কে মারবে!'

'ফের্!' বলিয়া হরিগোপাল আগাইয়া আসিল। বলিল, 'দেবো এখুনি মুখটাকে ভেঙে হারামজাদী!—ফুট করে আস্তে-আস্তে একটা চড় মেরেছি মা,

আর কিছু করিনি। আমায় বলে কি-না, তোমার চেহারাটা, আমাদের বাড়ী একটা নাপিত আসে, সেই তার মতন।'

তারাসুন্দরীকে আর বেশি কিছু বলিতে হইল না। বলিল, 'আর তুই বুঝি বিদ্যাধরী রূপবতী রাজকন্যে, না!' বলিয়া আগাইয়া গিয়া দুইটা আঙুল দিয়া বৌ-এর গালের উপর চিমটি কাটিয়া ধরিয়া জোরে জোরে বেশ করিয়া বারকতক নাড়া দিয়া বলিল, 'চুপ কর্ বলছি, এখনও বলছি চুপ কর্ সর্বনাশী!'

বৌ এবার দ্বিগুণ জোরে চীৎকার করিয়া উঠিল।—'ওগো পাড়ার লোক তোমরা দেখে যাও গো! মায়ে-ব্যাটায় আমায় খুন করে দিলে গো!'

তারাসুন্দরী মুখখানা তাহার চাপিয়া ধরিল। বলিল, 'চুপ কর্, নইলে মুখে সাত হাত কাপড় গুঁজে দেবো।'

কিন্তু চুপ সে কিছুতেই যখন করিল না, তখন তারাসুন্দরী বিরক্ত হইয়া বলিল, 'কাঁদুক ও হারামজাদী, ওইখানে বসে-বসে কাঁদুক! তুই ঘুমোগে বাবা হরিগোপাল, ওর সঙ্গে আর কথা বলিস্‌নে।'

হরিগোপাল ধীরে ধীরে গিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িল। তারাসুন্দরী বৌকে গালাগালি দিতে দিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল। হরিগোপাল বলিল, 'কাল ওকে বিদেয় করে দাও মা!'

তারাসুন্দরী বলিল, 'না বাছা না, তুই জানিসনে। বিদেয় ওকে করা হবে না কিছুতেই। বাপ মিন্সে মেয়েকে তার নিয়ে যেতে চায়, হাজারটি টাকা এখনও পাওনা বাকি, সেই টাকা মিটিয়ে মেয়ে নিয়ে যেতে চায় নিয়ে যাক্ জন্মের মতন, আমার আপত্তি নেই।'

তারাসুন্দরী চলিয়া যাইবার পর, হরিগোপাল ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ একসময় তাহার ঘুম ভাঙিতেই দেখিল, দরজায় খিল বন্ধ করিয়া কমলিনী কোন সময়ে তাহার পাশে আসিয়া শুইয়াছে।

মাস দুই তিন পরেই শোনা গেল, কমলিনীর ছেলে হইবে।

তারাসুন্দরী মুখখানা ভারী করিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

হরিগোপাল তাহার মাকে শুনাইয়া শুনাইয়া আপন-মনেই বলিতে লাগিল, 'বেশ হয়েছে, আচ্ছা হয়েছে! মাকে তখন হাজারবার বললাম—বলি, দাও মা ওকে পাঠিয়ে, দাও মা বিদেয় করে, তা তখন কিছুতেই দিলে না। এখন বোঝ মজাটি!'

তারাসুন্দরী মনের দুঃখে অনেক রকমের অনেক কথাই বলিতে লাগিল। কখনও বলিল, 'সেইজন্যেই ও কৃপণ কঞ্জুষ মিন্সে হাজার টাকা খরচ করে মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিদেয় করে দিলে।'

কখনও বলিল, 'হারামজাদীর মিছে কথা না সত্যি কথা তাই-বা কে জানে!'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়া দেখিল, বৌ-এর নামে কলঙ্ক দিলে সে-কলঙ্ক নিজে-দের গায়ে আসিয়াই লাগিবে; তাহার চেয়ে কাজ নাই, চুপ করিয়া থাকাই ভাল। এই বুঝিয়াই বোধকরি কিছুদিন পরে সে-সম্বন্ধে তারাসুন্দরী আর কোনও উচ্চবাচ্যই করিল না। কিন্তু ছেলে সম্বন্ধে না করুক ছেলের মায়ের রূপ এবং গুণের আলোচনা আগেও যেমন চলিতেছিল এখনও তেমনি চলিতে লাগিল। কমলিনীও কাহাকেও ছাড়িয়া কথা কয় না। আগেকার চেয়ে এখন তাহার জোর যেন বাড়িয়াছে। এখন আবার সে এমন এক-একটা কথা বলে যে শাশুড়ীও হাত-পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসে।

ওদিকে বৌ কাঁদে, এদিকে শাশুড়ী কাঁদে, আর পুত্র হরিগোপাল তখন বারান্দায় রেলিংএর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া চীৎকার করিয়া গান ধরে:

'সাঁঝের তারকা আমি পথ ভুলিয়ে—'

আবার কোনও কোনদিন দেখা যায় বৌকে খুব খানিকটা দুম্ দুম্ করিয়া পিটাইয়া দিয়া হন্ হন্ করিয়া বাড়ী হইতে সে বাহির হইয়া যায়। বৌ চীৎকার করিয়া গালি পাড়িতে থাকে, মা ডাকে—

'যাস্‌নে হরিগোপাল, যাসনি বাবা, ফিরে আয়!'

হরিগোপাল বাহিরের দরজা হইতে চীৎকার করিয়া বলে, 'ও হারাম-জাদীকে আগে বিদেয় কর বাড়ী থেকে, তার পর আসব।'

ইহাদের এই ঝগড়াঝাঁটি চেঁচামেচির চোটে বাড়ীতে তাদের কাক-চিল বসিতে পায় না।

পাড়ার লোক জ্বালাতন হইয়া গিয়া বলে, 'এ পাড়া থেকে হরিগোপাল, হয় তুমি যাও নয় আমরা যাই।'

কিন্তু বলিহারি যাই বুড়া হারাধন চাটুজ্যেকে! একটি দিনের জন্যও নিজে তিনি মেয়েকে কোনদিন দেখিতে আসেন না। কমলিনী তাহার দ্বিতীয়ভাগ-পড়া হাতের লেখায় এক এক দিন এক-আধখানা চিঠি লিখিয়া ঝির হাতে চুরি

করিয়া নিতান্ত সন্তর্পণে তাহার বাবার কাছে পাঠাইয়া দেয়, বাবা তাহার জবাবে মুখে মুখেই যা হোক্ কিছু বলিয়া ঝিকে বিদায় করেন, নেহাত পীড়াপীড়ি করিলে কখনও বা দু' লাইন লিখিয়া পাঠান।

হরিগোপাল কোথায় কোন্ একটা কারখানায় ফিটার-মিস্ত্রীর তল্‌পেটিতে কাজ করিবার একটা চাকরি পাইয়াছে। মাসে কুড়ি টাকা বেতন। ভবিষ্যতে পঞ্চাশ টাকা হইবার আশা আছে। খাঁকিরঙের হাফ-প্যাণ্ট, শার্ট, জুতা মোজা পরিয়া তাহাকে কারখানায় যাইতে হয়।

তারাসুন্দরী পাড়ার মেয়েদের কাছে গল্প করে, হরিগোপালকে সায়েব বড় ভালবাসে, বলে, 'যাব একদিন তোমার বাড়ী। গিয়ে চা খেয়ে আসব।' হরিগোপাল বলছিল,—'না মা, আনব না সায়েবকে। এলেই হয়ত বৌ দেখতে চাইবে।'

আবার কোনদিন বলে, 'গ্যাখ দেখি মা জ্বালা, সায়েব বলছে মুখুজ্যে সাহেব, তোমাকে বিলেতে যেতে হবে। ফিরে এলে তোমাকে আমরা হাজার টাকা মাইনে দেবো।' আমি বলছি—'কাজ নেই বাবা, আমার একটি ছেলে—না কি বল মা?'

কোনও মেয়ে হয়ত কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে, 'ছেলে এখন কত মাইনে পাচ্ছে?'

তারাসুন্দরী বলে, 'কোথা পাবে মা! এখন দিচ্ছে পঞ্চাশটি টাকা। বলছে তা' আসছে মাস থেকে চড়িয়ে দেবো। দেখি কি করে।'

কমলিনী কিন্তু লোকজন মানে না। ফট্ করিয়া বলিয়া বসে, 'আ! যেমন মিথ্যেবাদী ব্যাটা, তার তেমনি মিথ্যেবাদী মা!'

ব্যস, আর যায় কোথা! শাশুড়ী-বৌএ তৎক্ষণাৎ কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যায়।

কমলিনীর একটি ছেলে হইয়াছে। জরাজীর্ণ কঙ্কালসার কাঁকলাসের মত একটা ছেলে। তাকাইলে তৎক্ষণাৎ সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লইতে হয়।

বাবাকে তাহার ছেলে দেখাইতে যাইবার জন্য কমলিনী কাঁদিতে বসে। তারাসুন্দরীর কিন্তু ধনুক-ভাঙ্গা পণ। এখনও বোধকরি সেই হাজার টাকার আশা সে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

বৌ-এর কান্নাকাটি দেখিয়া পাড়ার মেয়েরা বলে, 'আহা, কতদিন দেখেনি বাপকে, বুড়ো বাপ, কোন্ দিন মরে যাবে, দাও একবার পাঠিয়ে।'

তারাসুন্দরী বলে, 'ওকে আমি একা পাঠাতে পারি, ছেলে আমি ওর সঙ্গে দেবো না মা।'

শেষ পর্যন্ত তাহাই হয়। ছেলে যখন তিন মাসের, তখন একদিন ছেলে রাখিয়া কমলিনী যায় তাহার বাবাকে দেখিতে।

কাঁদিতে কাঁদিতে কমলিনী তাহার বাবাকে গিয়া প্রণাম করিতেই মুখ তুলিয়া হারাধন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেমন আছিস মা? আয়।'

কমলিনীর কান্না আর কিছুতেই থামে না!

হারাধন বলেন, 'কাঁদছিস কেন?'

'খোকাকে আসতে কিছুতেই দিলে না, বাবা।'

'দেবে না, তা আমি জানি।'

'জানো ত বাবা, ওদের টাকাটা দিয়ে দিলেই ত হয়!'

হারাধন ঈষৎ হাসিয়া বলেন, 'কোথায় পাব রে পাগলি! টাকাই যদি থাকবে ত' চোরের মত এমন করে লুকিয়ে বসে থাকি! তোকে একদিন দেখতে যেতে পারি না!'

'তবে তুমি বলেছিলে কেন বাবা?'

'অমন সবাই বলে। কেন, তাতে হয়েছে কি? তুই ত' শ্বশুরবাড়ী পেয়েছিস—ব্যস, আর কি চাই?'

কমলিনী আবার কাঁদিতে লাগিল। বলিল, 'মার খেয়ে-খেয়ে গঞ্জনা খেয়ে-খেয়ে আমার জীবন গেল বাবা। এমন শ্বশুরবাড়ী থাকার চেয়ে না-থাকাই ভাল। ছেলেটাকে যদি সঙ্গে দিত ত' সত্যি বলছি বাবা, আমি আর সেখানে যেতাম না।'

হারাধন বলিলেন, 'দূর পাগলি, ছেলে হয়েছে এইবার সব গোলমাল চুকে যাবে। ছাখ, শাশুড়ী-মাগী ত' বুড়ো হয়েছে, ও আর—'

হঠাৎ বোধকরি নিজের কথাটা মনে পড়িতেই তিনি অন্য কথা পাড়িলেন।—'হরিগোপাল শুনলাম নাকি চাকরি পেয়েছে?'

ঘাড় নাড়িয়া কমলিনী বলিল, 'হুঁ।'

'কত মাইনে?'

'কুড়ি টাকা।'

'কুড়ি টাকা? সে কি রে?'

কমলিনী ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া গেল।

বাড়ীতে মা নাই। মায়ের বদলে আছে একটা বহুকালের পুরানো ঝি। সংসারের কাজকর্ম সে-ই চিরদিন দেখাশোনা করে।

কমলিনী তাহার মায়ের জন্য খানিকটা কাঁদিল। তাহার পর এদিক ওদিক খানিকটা ঘোরাফেরা করিয়া ছোট ভাইটাকে তাহার কাছে ডাকিয়া গল্প করিতে বসিল।

গল্প শেষ হইলে আবার সে তাহার বাবার কাছে আসিয়া বলিল, 'বাবা, আমি চললাম।'

'এরই মধ্যে যাবি? খোকাকে একবার আনতে পারিস না?'

'আসব যেদিন সেদিন আর এখান থেকে যাব না, বাবা। চব্বিশ ঘণ্টা শাশুড়ী বলে, ছেলের আবার বিয়ে দেবো। সত্যি বলছি বাবা, সেখানে আমার কোনও সুখ নাই।'

হারাধন বলিলেন, 'হুঁ। বিয়ে অমনি দিলেই হলো কি-না। ছেলে রয়েছে, একটা নালিশ ঠুকে দিলেই খোরপোশ আদায় হয়ে যাবে। তখন বুঝবে মজা।'

কমলিনী বলিল, 'সেই ভাল বাবা, তাহ'লে আচ্ছা জব্দ হয়।'

'আচ্ছা সে দেখা যাবে পরে। তুই কি একাই যাচ্ছিস্ নাকি সেখানে?'

কমলিনী বলিল, 'না বাবা, নন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।'

বলিয়া সে তাহার বাবাকে আর একটি প্রণাম করিল।

হারাধন বলিলেন, 'এসো মা। সুখী হও।'

কারখানা হইতে হরিগোপাল সেদিন বাড়ী ফিরিয়াই বলিল, 'আমাদের আপিসের বড়বাবু আজ আমাকে কি বলছিল জানো মা? বলছিল, মুখুজ্যে-সাহেব, শুনছি নাকি তুমি আবার একটি বিয়ে করবে? বললাম, হ্যাঁ করব। তখন বললে, চল একদিন তোমাকে একটি মেয়ে দেখিয়ে আনি। ভারী সুন্দরী একটি মেয়ে আছে।'

তারাসুন্দরী বলিল, 'আমাদের ওই মা-লক্ষ্মীর গুণ-গরিমে সবই শুনেছে বোধহয়।'

হরিগোপাল বলিল, 'শুনেছে বই-কি! না শুনলে বলে কখনও ?'

'বেশ ত'। যা একদিন দেখে আয়। বলিস্ ত' আমিও না হয় যেতে পারি।'

হরিগোপাল বলিল, 'আমি আগে একদিন দেখে আসি। তারপর যেয়ো।'

কথাটা কমলিনী শুনিয়াছিল। শুনিয়াও কি জানি কেন, কোনো রকমের গোলমাল হাঙ্গামা কিছুই করিল না। পরদিন আহারাদির পর তারাসুন্দরী একটা কাঁথা সেলাই করিতেছিল, কমলিনী তাহার ছেলেকে কোলে লইয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'আমি আজ বাপের বাড়ী যাব, মা।'

এমন করিয়া এত কোমলকণ্ঠে কথা সে বড় একটা কয় না। তারাসুন্দরীও তাহাকে পাঠাইবার কথাই ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল, হরিগোপালের আবার নূতন বিবাহের সম্বন্ধ যখন আসিতেছে তখন ইহাকে পাঠাইয়া দেওয়াই উচিত। পাঠাইয়া না দিলে বিবাহ হয়ত ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। তাই সেও আর এবার বাধা দিবার চেষ্টা করিল না। বলিল, 'যাবে ত' যাবে, আমাকে আবার বলছো কি ?'

কমলিনী বলিল, 'এবার কিন্তু আমি ছেলে নিয়েই যাব।'

কাপড়ের উপর ছুঁচ চালাইতে চালাইতে তারাসুন্দরী বোধকরি অন্যমনস্ক হইয়াই বলিয়া উঠিল, 'কেন ?'

কমলিনী বলিল, 'কেন আবার! ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছ, আমি এ-সময় থেকে করব কি? বরণডালা নিয়ে বৌ ঘরে তুলব, না, কী বলতে চাও তোমরা ?'

'ও, তুমি বুঝি সব শুনেছ ?'

'হ্যাঁ শুনেছি বই কি! তোমরা ত' আর চুপি চুপি বলনি! আমায় শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছ।'

তারাসুন্দরী বলিল, 'হ্যাঁ, তা বলেছি বটে।'

দু'জনেই চুপ করিয়া ছিল। তারাসুন্দরীই প্রথমে কথা বলিল, 'তাহলে এখন আর এ-বাড়ী আসতে চাও না, না ?'

কমলিনী বলিল, 'কি জন্যে আসব? এখন ত' আমার আর আসবার দরকার নেই।'

তারাসুন্দরীও ঠিক এই কথাটাই তাহাকে বলিবে বলিবে ভাবিতেছিল। ভাবিতেছিল—হয়ত' তাহাকে বলিতে হইবে—তুমি আর এখন এ-বাড়ী আসিও না।

ভালই হইল। কথাটা সে নিজেই বলিল।

সেইদিনই বৈকালে, হরিগোপাল তখনও কারখানা হইতে ফিরে নাই, কমলিনী তাহার নিজের জিনিসপত্র কাপড়-জামা সব কিছু একটা ট্রাঙ্কে বোঝাই করিয়া ছেলে কোলে লইয়া বাপের বাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই বোধকরি শাশুড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

শাশুড়ীও কোনও আপত্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'চল।'

তারাসুন্দরী বলিল, 'দাঁড়াও বাছা, আমি একা যাব না। পাশের বাড়ীর বৌকে একবার ডাকি।'

পাশের বাড়ীর ঝিকে ডাকিয়া ঠিকানা দিয়া তাহার ট্রাঙ্কটা আগেই পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাহার পর সে বাড়ীর বৌকে সঙ্গে লইয়া তারাসুন্দরী চলিল কমলিনীকে পৌঁছাইয়া দিতে। ছেলে লইয়া কমলিনী তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছিল। তারাসুন্দরী বলিল, 'আমাদের সঙ্গে সঙ্গে গা ঘিঁষে ঘিঁষে কি জন্যে চললে বাছা, চল না পা চালিয়ে একটুখানি এগিয়ে।'

কমলিনী হন্ হন্ করিয়া আগাইয়া গেল।

তারাসুন্দরী তখন পাশের বাড়ীর বৌ-এর দিকে তাকাইয়া বলিল, 'বৌ বলে ওকে পরিচয় দিতে লজ্জা করে মা! দ্যাখো না, চলন দ্যাখো না, মাগো মা, এ কি ভদ্দরলোকের মেয়ে!—হ্যাঁ মা, তোর ক'বচ্ছর বিয়ে হয়েছে?'

পাশের বাড়ীর বৌ বলিল, 'চৌদ্দ বছর।'

'দেখলে? তোমায় দেখলে চৌদ্দবছরের-বৌ কেউ বলবে? আর ওই দ্যাখো আমার এক বছরের-বৌ।'

কমলিনী তাহার বাপের বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া পিছন ফিরিয়া আর তাকাইয়াও দেখিল না, তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল।

তারাসুন্দরী তাহাকে গালাগালি দিতে দিতে বাড়ী ফিরিতেই দেখিল, হরিগোপাল ফিরিয়াছে।—'দিয়ে এলাম বাছা বিদেয় করে, আমাকে কিছু বলতে হ'লো না, ও নিজেই গেল।'

হরিগোপাল জিজ্ঞাসা করিল, 'ছেলে কোথায়?'

'ছেলে রেখে কি করব বাছা। ছেলে থাকলে তোর সেই আপিসের বড়বাবু বিয়ে হয়ত দিতে চাইবে না।'

হরিগোপাল হাসিতে লাগিল। বলিল, 'ও। কথাটা তুমি বুঝি সত্যি মনে করেছ, মা? আমি সেদিন ওকে শোনাবার জন্যে মিছে করে বানিয়ে বানিয়ে বলেছিলাম।'

তারাসুন্দরী বলিলেন, 'তা বেশ করেছিলি। এখন সত্যিই চেষ্টা ত্থাখ। আপদ ত' বিদায় হয়েছে।'

হরিগোপালের বিবাহের চেষ্টা সত্যই চলিতে লাগিল। কিন্তু সর্বনাশ, যে-ই আসে আর-একটা বিবাহের কথা শুনিয়া ফিরিয়া যায়। সতীনের উপর মেয়ে দিতে কেহই রাজী নয়। শুধু রাজী না হইলেও বা কথা ছিল, কিন্তু সেদিন এক ভদ্রলোক হরিগোপালকে দেখিতে আসিয়া আর-একটা বৌ এখনও বাঁচিয়া রহিয়াছে শুনিয়া তাহাকে রীতিমত তিরস্কার করিয়া গেল। বলিল, 'ছি ছি, আজকালকার যুগে দুটো বিয়ে! হ্যাঁ বাবা হরিগোপাল, তুমি কি মানুষ, না জানোয়ার?'

হরিগোপাল বলিল, 'বেশ ত, মেয়ে এখানে দেবেন না—ব্যস, ফুরিয়ে গেল, জানোয়ার বলছেন কেন?'

ভদ্রলোক হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'জানোয়ার বলছি সাধে বাবাজি? আজকালকার যুগে, ওই দুটো বিয়ে, ছি ছি, লোকে শুনলে বলবে কি! একজন নারীর উপর অত্যাচার করা হয়। না বাবা, মেয়ে আমি এখানে কিছুতেই দেবো না।'

এমনই যে-ই আসে সে-ই ফিরিয়া যায়। বিবাহ তার কিছুতেই হয় না।

হরিগোপালের এমনি অবস্থা, তখন অকস্মাৎ একদিন তাহার হাতে আদালতের এক শমন আসিয়া উপস্থিত।

খোরপোশের দাবী জানাইয়া কমলিনী আদালতে নালিশ করিয়াছে। বিচারের দিন হরিগোপাল আদালতে গিয়া হাজির হইল। দিনের পর দিন পড়িতে লাগিল।

তিন দিনের দিন বিচার শেষ হইল।

কমলিনীর কান্নায় হাকিমের শিক্ষিত মন এবং দয়ালু অন্তঃকরণ দুইই একেবারে গলিয়া জল হইয়া গেল। হরিগোপালের কোনও কথাই তিনি

শুনিতে চাহিলেন না। কমলিনীর দশ টাকা করিয়া মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

তারাসুন্দরীর শূন্য গৃহ এখনও খাঁ খাঁ করিতেছে। এ যুগে এক স্ত্রী বর্তমানে আর এক স্ত্রী গ্রহণ পাপ এবং অপরাধ—হরিগোপাল তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিয়াছে এবং বুঝিতে পারিয়াছে বলিয়াই বোধকরি বিবাহ তাহার এখনও হয় নাই।

বিবাহ হোক আর না হোক, খাইয়া-না-খাইয়া কমলিনীর দশটি টাকা প্রতি মাসে নিয়মিত তাহাকে যোগাইয়া চলিতে হয়। তবে বড়ই দুঃখের বিষয়, কমলিনীর সে পুত্রসন্তানটি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছে।

সত্য-মিথ্যা

শহরের নূতন পাড়ায় নূতন বাড়ীতে উঠিয়া আসিয়া বড় বিপদে পড়িলাম। স্ত্রীর শরীর অসুস্থ। একজন ঝি না হইলে আর চলে না, অথচ ঝি পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল।

পরশু একটি মেয়ে আসিয়াছিল। সঙ্গে তাহার তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। কোলেরটি ছেলে, বড় দুইটি মেয়ে। চেয়ারে বসিয়া পিছন ফিরিয়া একখানা চিঠি লিখিতেছিলাম, হঠাৎ দেখি, কালোরঙের কুশ্রী কদাকার কঙ্কালসার ছোট একটি মেয়ে আমার টেবিলের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া দাঁড়াইল। বলিল, 'বাবু লিখছে রে। এই দুলী, আয় দেখবি আয়!'

ডাক শুনিয়া ঠিক তাহারই মত দেখিতে আর-একটি মেয়ে ছুটিয়া আসিল। —'কই দেখি।'

স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া তাকাইলাম। দেখি, সুমুখের ঘরের মেঝেয় বসিয়া সে তখন মেয়েটাকে বুঝাইয়া বলিতেছে, 'না মা, তোমার দু'তিনটি ছেলেমেয়ে, আমি একজন ঝাড়া-হাত-পা নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ চাই।'

মেয়েটা বলিতেছে, 'ছেলেরা আমার খুব সুস্থির সুবুদ্ধি মা, তার জন্যে তোমায় কিছু ভাবতে হবে না।'

এমন সময় পিছন দিক হইতে আমার জামায় টান পড়িতেই মুখ ফিরাইয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। দেখিলাম, টেবিলের উপর দোয়াতটা তাহারা উল্টাইয়া ফেলিয়াছে, কালো কালিতে টেবিল-ঢাকা সাদা কাপড়টা নষ্ট হইয়াছে, চিঠি নষ্ট হইয়াছে এবং কে ফেলিয়াছে, এই লইয়া তাহারা দুই বোনে ঝগড়া বাধাইয়াছে। চেয়ারটা সরাইয়া লইয়া রাগিয়াই বোধকরি তাহাদের কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, বড় মেয়েটা তৎক্ষণাৎ তাহার পরনের নোংরা কাপড়টা সেই কালির উপর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'বেশ বাবু বেশ, ফেলেছি ত' তুলে দিচ্ছি, তুমি বোকো না বলছি, হ্যাঁ।'

তাহাদের কি আর বলিব। স্ত্রীকে ডাকিলাম। বলিলাম, 'শোনো।'

স্ত্রী আসিতেই টেবিলটা তাহাকে দেখাইয়া বলিলাম, 'ওর দ্বারা হবে না, ওকে যেতে বল।'

মেয়েটা কিছুতেই যাইতে চায় না। বলে, 'কেন হবে না বাবু? ছেলেমানুষ ওই একটুখানি কালি ফেলেছে বলে রেগে গেলে? দাও—আমি সাবান দিয়ে কেচে এনে দিচ্ছি, দাও।'

আমার স্ত্রী নারায়ণী শেষে অনেক করিয়া বুঝাইয়া তাহাকে বিদায় করিল।

তাহার পরেও দু'একজন আসিল গেল, কিন্তু কেহই শেষ পর্যন্ত টি'কিল না।

আমরা দুটি মাত্র মানুষ, স্বামী আর স্ত্রী, না আছে ছেলে, না আছে মেয়ে,—তবু তাহারা দু'বেলা ঠিকার কাজ করিতেও আট-দশ টাকা চাহিয়া বসে।

ঝি ছাড়িয়া দিয়া একজন চাকরের সন্ধান করিতে লাগিলাম। এমন সময় সন্ধ্যায় একদিন বাড়ী ফিরিয়া শুনিলাম, ভাল একজন ঝি পাওয়া গিয়াছে, ছেলেপুলে নাই, নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ, সকাল-সন্ধ্যা ঠিকার কাজ করিবে, মাসিক বেতন মাত্র চার টাকা।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় পেলে?'

নারায়ণী বলিল, 'আপনিই এলো। এই ত' এতক্ষণ বসে বসে গল্প করছিল। কাল সকালে আসবে।'

কিন্তু সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইল না। রাত্রির আঁধার তখনও কাটে নাই—আমার দরজার সুমুখে সরকারী গ্যাসের আলোটা জ্বলিতেছে, সদর দরজায় ঘন-ঘন কড়া নড়িয়া উঠিতেই জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কে?'

নারীকণ্ঠে জবাব আসিল, 'আমি মোহিনী।'

নারায়ণী উঠিয়া দাঁড়াইল।—'ওই ত' আমাদের ঝি।'

বলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল। জানলার পথে তাকাইয়া দেখিলাম, কেরোসিনের একটি জ্বলন্ত কুপী হাতে লইয়া সাদা কাপড় পরা লম্বা ছিপছিপে একটি মেয়ে ঘরে আসিয়া ঢুকিল।

নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'এখনও রাত রয়েছে যে মোহিনী, এখন কি তুমি কাজ করতে এলে?'

ঘাড় নাড়িয়া মোহিনী বলিল, 'হ্যাঁ দিদিমণি, কাজ করতে এলাম। আমায় আবার আরও দশ ঘর বেড়াতে হবে কিনা! সকালে এসে জল ধরে দিয়ে যাব, কাপড়-চোপড় কেচে দিয়ে যাব। এখন শুধু এঁটো বাসন ক'টা মেজে দিয়ে যাই, বাটনা বেটে দিয়ে যাই—'

বলিতে বলিতে সে রান্নাঘরের দিকে চলিয়া গেল। রান্নাঘর বেশি দূরে নয়, সব কথাই শুনিতে পাইতেছিলাম। ভাণ্ডার হইতে নারায়ণী বোধকরি বাটিবার মসলা বাহির করিয়া দিল। বলিল, 'বাটনা এই শিলের কাছে রইল, মোহিনী। কাজকর্ম সেরে, যাবার সময় আমায় তুমি ডেকে দিয়ে যেয়ো, বুঝলে? নইলে সদর দরজাটা হাঁ হাঁ করবে।'

মোহিনী বলিল, 'বেশ দিদিমণি, তুমি শোওগে যাও।'

নারায়ণী ফিরিয়া আসিল। বলিল, 'যাক্, আমায় আর বাসন মেজে মরতে হবে না। ঝি-টি ভালই পাওয়া গেছে।'

এঁটো বাসন মুক্ত করিতে করিতে কথাটা বোধ হয় মোহিনী শুনিতে পাইল। বলিল, 'হ্যাঁ দিদিমণি, আমি যে ঘরে কাজ করি সবাই আমাকে ভাল বলে। আমার কাজ খুব পরিষ্কার কিনা, নোংরা কাজ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না।'

নারায়ণী শুইয়া পড়িয়াছিল। বলিল, 'বেশ।'

কিন্তু মোহিনী চুপ করিল না। বাসন মাজিতে মাজিতে সে বলিতে লাগিল, 'ওই যে ধনা মিস্তির গলি ঢুকতেই বাঁ-হাতি ফটকওলা বাড়ীখানা,—ওই যে গো উঠোনে চাঁপাগাছ আছে, বুঝেছ দিদিমণি, ওই বক্সিদের বাড়ী কাজ করি। তা ওদের ছোট বৌ কি বলে জানো দিদিমণি, বলে, আমরা বাসা ছেড়ে দিতে পারি কিন্তু মোহিনীকে কখনও ছাড়ব না।'

নারায়ণী একবার 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিয়া রহিল।

মোহিনীর বাসন মাজার শব্দ পাইতেছিলাম। হঠাৎ মনে হইল সে যেন কাহার সঙ্গে কথা কহিতেছে।

নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ওর সঙ্গে কি আর কেউ এসেছে নাকি?'

নারায়ণী বলিল, 'কই না, ওকে ত একাই দেখলাম।' বলিয়াই সেও কান পাতিয়া খানিকক্ষণ শুনিয়া বলিল, 'কার সঙ্গে কথা কইছ মোহিনী?'

মোহিনী বলিল, 'কার সঙ্গে আর কথা কইব দিদিমণি, এখন কি আর কেউ

ঘুম থেকে উঠেছে। বলছিলাম, কড়াইএ তোমার দাগ পড়েছে, এ পোড়া আর কিছুতেই উঠতে চায় না। তেল মাখিয়ে রেখো দিদিমণি, তাহ'লে দাগ পড়বে না।'

বলিলাম, 'তোমার মোহিনী বোধ হয় একটু বেশি কথা বলে।'

'তাই ত দেখছি।' বলিয়া নারায়ণী হাসিয়া উঠিল।

মোহিনী বলিল, 'হাসছো যে দিদিমণি?'

সর্বনাশ। কেন হাসিতেছে তাহাও বলিতে হইবে।

নারায়ণী বলিল, 'না, হাসিনি। তুমি কাজ কর।'

'হ্যাঁ, হাসোনি। হাসি আমি পষ্ট শুনতে পেলাম।'

নারায়ণী এবং আমি—দু'জনেই এবার না হাসিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।

মোহিনী বলিল, 'আমি বাবা পষ্ট শুনেছি। হাসিনি কি বললেই হলো।—এই হাসির জন্যে শ্বশুরবাড়ীতে আমি একবার ভারি বিপদে পড়েছিনু দিদিমণি, সে ভারি মজার কথা। এইখানে উঠে আসতে পার ত বলি। বাবুর কাছে বলতে পারব না। নজ্জা করবে।'

নারায়ণী হাসিয়াই বলিল, 'কাল শুনব মোহিনী, আজ থাক্।'

মোহিনী বলিল, 'কালকে আমায় তাহ'লে একবার মনে করিয়ে দিও দিদিমণি, আমার আবার এমনি পোড়া মন, কোনও কথা মনে থাকে না ছাই।'

নারায়ণী চুপি চুপি বলিল, 'তুমি ঠিকই বলেছ। তা এ একরকম আমার ভালই হ'লো, কথা কইবার একটা লোক পেলাম।'

ধুপ করিয়া শিল নামানোর শব্দ পাইলাম। বাসন-মাজা শেষ করিয়া এইবার বোধ হয় সে বাটন বাটিতে বসিল। বসিয়াই বলিল, 'ও মা। এ শিল তুমি কি ক'রে রেখেছ গো দিদিমণি? এ যে একেবারে তেলা হয়ে গেছে। ওই যে শিলকাটাওয়ালারা রাস্তায় হেঁকে হেঁকে যায়, কাল একবার ওদের একজনকে ডেকে শিলটা তোমার কাটিয়ে নিও। তাহ'লে মসলা বেটে দেবো একেবারে চন্ননের মত। মিত্তিরদের দিদিমণি বলে, আমায় এমনি মসলা বাটতে শিখিয়ে দেবে মোহিনী? বলি, কেন শিখিয়ে দেবো না? শিলটা তুমি কাটিয়ে রেখো। তাই না শুনে ও কি করলে জানো দিদিমণি?

শিলকাটাওয়ালাদের না ডেকে শিলের ওপর নাম পর্যন্ত লিখিয়ে নিলে। তুমিও লেখাতে পারো দিদিমণি। পাঁচটি পয়সা বেশি নেবে কিন্তু। একধারে বাবুর নাম, একধারে তোমার নাম।'

এই বলিয়া সে নিজের রসিকতায় নিজেই মশগুল হইয়া হাসিতে লাগিল।

শেষ রাত্রে ঘুম আর হইল না। নারায়ণীকে বলিয়া দিলাম, 'মোহিনীকে তুমি সকালেই আসতে বলো। আমার ত' আর আপিস নেই যে দেরি হয়ে যাবে।'

কিন্তু মোহিনীর বোধকরি তাহাতে আপত্তি ছিল। কারণ শেষ রাত্রি হইতে কাজ আরম্ভ না করিলে গল্প এবং কাজ একসঙ্গে এই দুইটা ব্যাপার সহজে তাহার শেষ হইতে চায় না। অথচ এই শেষরাত্রে কাজ করিবার জন্য দরজা খুলিয়া দিতে সকলেরই আপত্তি। মোহিনী সেদিন সেকথা স্পষ্টই বলিয়া ফেলিল।

বলিল, 'সব বাড়ীতেই এই কথা বলে, দিদিমণি। কেন বল ত? তোমরা সবাই দিদিমণি, ভারি ঘুম-কাতুরে।'

মোহিনীকে পাইয়া স্ত্রী আমার একজন কথা কহিবার লোক পাইয়াছে সত্য, কিন্তু বিপদও আমাদের কম হয় নাই।

স্ত্রীর সঙ্গে হয়ত কোনও গোপনীয় কথা কহিতেছি, মোহিনী জিজ্ঞাসা করিল, 'কি কথা হচ্ছিল দিদিমণি?'

কি কথা হইতেছিল তাহাও বলা যায় না, 'আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথায় তুমি কান দিও না' বলিতেও লজ্জা করে। নারায়ণী বলে, 'সে তুমি বুঝবে না, মোহিনী।'

রান্নাঘরের চৌকাঠের গোড়ায় মোহিনী চুপ করিয়া বসে। বসিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলে, 'আমাদেরও অমনি ছিল দিদিমণি। তেনারা খুব বড়লোক ছিল কিনা! আমাকে কুটোটি কেটে দুটি করতে হ'তো না। চব্বিশ ঘণ্টা বসে থাকতাম আর অমনি ফুস্থর-ফুস্থর গুজুর-গুজুর! কথা আর আমাদের শেষ হ'তেই চাইতো না দিদিমণি, বুঝলে? ননদরা বলতো, কি এমন কথা তোরা দিবারাত্তির কইছিস বল ত' বৌ! বলতাম, 'থাম্ লো থাম্, তোরা চুপ কর।'

নারায়ণীর শুনিতে বেশ ভাল লাগে। বলে, 'তারপর?'

এমন চমৎকার শ্রোতা বোধকরি মোহিনী তাহার জীবনে অল্পই পাইয়াছে, তাই সে তাহার ঠিকার কাজ ভুলিয়া গিয়া আবার বলিতে শুরু করে, 'বাবু যেমন তোমার ভাল-ভাল কাপড় জামা এনে দেন দিদিমণি, অমনি সব কাপড় জামা, এ বেলায় একরকম ওবেলায় একরকম। নিজের কখনও কাপড় কাচতে হতো না। তুমি যেমন ছেড়ে রেখে দাও, আমিও তেমনি বাঁধাপুকুরের ঘাটে দিয়ে আসতাম ছেড়ে। ঝি একদিন বললে কি শুনবে দিদিমণি, বললে, একখানা কাপড় এইবার আমি চুরি করব বৌঠাকরুণ। এই না শুনে উনি করলেন কি, ঝিকে ডেকে পাঠালেন। বললেন, 'কি গো মেয়ে, অনেকদিন বকশিশ পাওনি, নয়? আচ্ছা।' ব'লে পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ঝন্ করে ফেলে দিয়ে বললেন, 'নিয়ে যাও'—এমনি সব কাণ্ডকারখানা করেছি দিদিমণি, সে কথা তোমায় আর কি বলব।'

নারায়ণী রান্না করিতে করিতে বলে, 'সে সব তোমার কি হ'লো মোহিনী?'

'তবে আর তোমায় বলছি কেন দিদিমণি, কপাল পুড়লে মানুষের যা হয় আমারও ঠিক তাই হলো। আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল, আর পাঁচ-ভূতে সব লুটে-পুটে নিলে।'

নারায়ণী বোধ হয় তাহা বিশ্বাস করিল না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কি জাত বললে সেদিন? কোমর,—না? মাটির হাঁড়ি-কলসি তৈরি করে সেই কোমর ত?'

মোহিনী ঘাড় নাড়িয়া বলিল, 'হ্যাঁ, দিদিমণি, আমরা জাত-কোমরের মেয়ে। কিন্তু হাঁড়ি-কলসি আমার বাপের বাড়ীতে কেউ কেউ তৈরি করতো বটে, শ্বশুর-বাড়ীতে কিন্তু ও-সব পাট ছিল না। কেন থাকবে বল দিদিমণি, বড়লোক ছিল যে!—এই যে বন্তু দিদিমণি,—ঝি বাসন মাজতো ত' ক'খানা থালা, ক'খানা ঘটি-গেলাস, ক'খানা বাটি, তার কোনও হিসেব-কেতাব ছিল না। তিন-তিনটে ঝি অনবরত বাসন মাজছে ত' মাজছেই—'

আমার নিজের ছেলেপুলে নাই। পাশের বাড়ীর ছোট একটি তিন-চার বছরের ছেলেকে নারায়ণী বড় ভালবাসে। সেদিন কিসের জন্য ছেলেটাকে

একটুখানি তিরস্কার করিতেই কাঁদিতে কাঁদিতে সেই যে সে বাহির হইয়া গেছে, দু'দিন আর আসে নি।

তিন দিনের দিন হঠাৎ কি ভাবিয়া ছেলেটা বাড়ী ঢুকিতেই নারায়ণী বলিল, 'হ্যাঁরে সন্টু, আচ্ছা নিমকহারাম বাবা! ছি ছি, পরের ছেলেকে ভাল আবার কেউ বাসে!'

মোহিনী বাটনা বাটিতেছিল, কথাটা শুনিবামাত্র হাতের নোড়া তাহার শিলের উপরেই থামিয়া রহিল। বলিল, পরের ছেলে মানুষ করার জ্বালা দিদিমণি আমায় আর বলো না। আমি বেশ ভাল জানি। শাশুড়ী গেল মরে, ছোট একটি দেওরকে মানুষ করলাম কোলে-পিঠে করে। তা সে হয়ত আর আমার কথা ভাবেও না দিদিমণি!'

বলিতে বলিতে তাহার দুই চোখের কোণ বাহিয়া দর্ দর্ করিয়া অশ্রুর ধারা গড়াইয়া আসিল।

নারায়ণী তাহার কাছে চুপ করিয়া সবই শোনে, আর আমার কাছে আসিয়া বলে, 'বাবা রে বাবা, মোহিনীর গল্প শুনে শুনে আমি গেলাম! কত আজগুবি কথা যে ও বানিয়ে বানিয়ে বলে—'

বলি, 'আহা বলুক, বলেই যদি সুখ পায় ত' বলতে দিও।'

সুখ বোধ হয় সে পায়। তাহা না হইলে বলিবে কেন?

বাজার হইতে সেদিন একটা বড় মাছ লইয়া আসিয়াছিলাম। মোহিনী সেটা কুটিতে কুটিতে গল্প আরম্ভ করিল। বলিল, 'এমনি এমনি মাছ দিদিমণি আমি কত বিলিয়ে দিয়েছি। শ্বশুরবাড়ীর বাঁধা-পুকুরে মাছ ধরানো হচ্ছে, আমি খিড়কির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখছি! জেলে-মিনসে বললে,—'ও কি গো, বৌ-ঠাকরুণ যে ওখানে দাঁড়িয়ে? বললাম,—ওই যে উত্তর দিকের পাড়ে কারা দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাখো ত'? বললে, বামুনপাড়ার অনন্ত আর রাখু-ঠাকুর, বৌ-ঠাকরুণ, ওদের দেখছ কি, ওরা মাগ্‌না মাছ চাইতে এসেছে। বললাম, দাও ওদের দু'জনকে দু'টো মাছ। জেলে-মিনসে হেসে বললে, 'তা তুমি যখন এসে দাঁড়িয়েছ বৌ-ঠাকরুণ, তখনই জানি অর্ধেক আমাদের বিলোতেই যাবে।'

এমনি করিয়া যখনই সে সুযোগ পায় তখনই তাহার ঐশ্বর্যের গল্প ফাঁদিয়া বসে। নারায়ণী শোনে আর মনে-মনে হাসে।

তবে একদিন সে আমায় বলিয়াছিল, 'মেয়েটার স্বভাব কিন্তু বড় ভাল। কোনোদিন কোনো জিনিস ও চুরি করে নিয়ে যায় না। কাপড় কাচতে গিয়ে দেখেছে হয়ত আমার কাপড়ের খুঁটে টাকা-পয়সা বাঁধা, তক্ষুণি তা ফিরে দিয়ে গেছে। খেতে ওর এত লজ্জা, খেতে বললেও খায় না। অথচ প্রায়ই বলে,—কাজ করতেই সময় যায় দিদিমণি, রান্নার আর সময় পাইনে।'

তা সে শুধু কাজ করিলে সময় হয়ত যথেষ্টই পাইত, কিন্তু গল্প করিতে গিয়াই দেরি হইয়া যায়, অথচ বানাইয়া বানাইয়া তাহার সেই ঐশ্বর্যের গল্প যেন না করিলেই নয়।

তাহার গল্পের কথা বলিতে বলিতে নারায়ণী এক এক দিন হাসিয়া হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। বলে, 'বেশ মজার মানুষটি পাওয়া গেছে কিন্তু। তবে কাজের কামাই সে কোনোদিন করে না। ওই শুঁট্‌কি শরীর নিয়ে খাটতেও ত' পারে।'

তাহার শরীরের দিকে কোনোদিন তাকাইয়া দেখি নাই। সেদিন দেখিলাম। দেখিলাম—কঙ্কালসার জরাজীর্ণ পাতলা ছিপছিপে মেয়েটি, গায়ের রঙ কালো, মুখের চেহারা দেখিয়া বয়স তাহার অনুমান করা কঠিন।

নারায়ণী বলে, 'আমি যখন প্রথম দেখলাম তখনও এমন ছিল না। দিন-দিন না খেয়ে খেয়ে এমনি হয়ে যাচ্ছে।'

বলি, 'আহা, কাল থেকে তুমিই চারটি করে খেতে দিও বেচারাকে।'

নারায়ণী বলে, 'খেতে ওর বড় লজ্জা। তা হোক্, কাল থেকে দেবো।'

শুনিলাম, মোহিনীকে অনেক সাধ্য-সাধনা করিয়া নারায়ণী খাওয়াইয়াছে। কিন্তু খাইতে খাইতে তাহার শ্বশুরবাড়ীতে খাইবার যে গল্প সে করিয়া গেছে তাহা শুনিয়া আমিও হাসি সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

তাহার পরদিন ছিল রবিবার।

বেলা আটটা বাজিয়া গেল মোহিনী তবু আসিল না।

ন'টা বাজিল, দশটা বাজিল,—তখনও না।

বাধ্য হইয়া নারায়ণীকে নিজেই কাজকর্ম করিতে হইল। বলিল, 'বেড়াতে বেড়াতে একবার দেখে এসো দেখি। বলছিল এই কাছেই কোন্ একটা হিন্দুস্থানী বস্তিতে ও থাকে।'

বলিলাম, 'হয়ত কোথাও গল্পে মেতেছে। ওবেলাও যদি না আসে ত' দেখা যাবে সন্ধান করে।'

বৈকালেও আসিল না। বাধ্য হইয়া মোহিনীর সন্ধানে বাহির হইলাম।

বস্তি ত' অনেক আছে, কিন্তু কোন্ হিন্দুস্থানী বস্তিতে যে তাহার সন্ধান করিব জানি না। তবু বাহির হইলাম।

বেশি ঘুরাঘুরি করিতে হইল না।

সুমুখের গলিতে ঢুকিয়া খানিক দূর যাইতেই বাঁ-হাতি একটা বস্তি পাওয়া গেল। সুমুখে ধোপা-বাড়ী। দুইটা গাধা ও একটা ছাগল বাঁধা রহিয়াছে। এক বৃদ্ধা মহিলা কাপড়ের স্তূপ বাঁধিতেছিল, জিজ্ঞাসা করিলাম, 'এখানে মোহিনী বলে কেউ থাকে জানো?'

বুড়ি একবার আমার মুখের পানে তাকাইল। তাহার পর কোনও কথা না বলিয়া আঙুল বাড়াইয়া পাশের দরজাটা দেখাইয়া দিল। দরজার কাছেই দেখিলাম, অনেকগুলি হিন্দুস্থানী মেয়ে সরকারী একটি জলের কলের পাশে ভিড় করিয়া কোলাহল করিতেছে। তাহাদেরই কাছ হইতে একটুখানি দূরে মাটির একটি কলসি সুমুখে নামাইয়া, দেখিলাম—বসিয়া আছে আমাদের মোহিনী।

কাছে গিয়া দাঁড়াইতেই সে শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, 'বাবু!'

বলিয়াই বোধকরি সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিল না, মাথায় হাত দিয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িল। বলিল, 'কাল রাত্তির থেকে জ্বর হয়েছে বাবু, ভেবেছিলাম, দিদিমণিকে একবার বলে আসি, কিন্তু মাথাটা খালি ঘুরে ঘুরে পড়ে যাচ্ছি বাবু, দাঁড়াতে পারছিনি। জল এক কলসি না ধরলে নয় তাই—'

বলিলাম, 'সেই খবরটাই নিতে এসেছিলাম। তোমার দিদিমণি পাঠালে।'

মোহিনী বলিল, 'ভাল থাকি ত' কাল আমি যাব বাবু।'

বলিলাম, 'যেয়ো।'

তিন চার দিন হইল মোহিনী আসে নাই। আমিও আর খবর লইতে পারি নাই। জ্বর তাহার সম্ভবত বাড়িয়াছে।

ঘরের কাজকর্ম নারায়ণী নিজেই করিতেছিল। মোহিনী যতদিন না আসে

ততদিনের জন্য আর-একটা ঝি রাখিব কিনা নারায়ণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম। নারায়ণী বলিল, 'থাক, তার কাজ সে এসেই করবে।'

সেদিন বলিলাম, 'আর কিছু না হোক্, মোহিনীর আজগুবি গল্প তোমায় দিনকতক শুনতে হয়নি।'

নারায়ণী গম্ভীরভাবে চুপ করিয়া রহিল। খানিক পরে কহিল, 'আর একবার খোঁজ নিও।'

বলিলাম, 'গল্প না শুনতে পেয়ে তোমার বুঝি কষ্ট হচ্ছে?'

নারায়ণী তেমনি গম্ভীরভাবে জবাব দিল, 'হুঁ।'

'তুমি কি তার কথাগুলো সব বিশ্বাস কর, নারায়ণী?'

নারায়ণী সে কথার জবাব না দিয়াই অন্যত্র চলিয়া গেল।

দুর্বল নারী হয়ত-বা আর-এক নারীর অবিশ্বাস্য আত্মম্ভরিতার ইতিহাসকে দুঃখের কাহিনী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছে।

কিন্তু আমি জানি—উহার একটি কথাও সত্য নয়। হয়ত' সে তাহার অসুখ হইতে উঠিয়া আসিয়াই দিদিমণিকে বলিবে, 'এমনি একবার এক অসুখের সময় দিদিমণি, পঞ্চাশটা ঝি আমার সেবা করেছিল।'

আচ্ছা, আপনিই বলুন ত, ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে?

কিন্তু সেই যে কথায় আছে: সত্য ঘটনা অনেক সময় আমাদের কল্পনাকেও পরাস্ত করে।

আমার অদৃষ্টেও ঠিক তাহাই ঘটিয়া গেল।

সেদিন বৈকালে বাড়ী হইতে বাহির হইব ভাবিতেছি, এমন সময় একজন অপরিচিত ছোকরা আমার বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কাকে চান?'

কিছু বলিবার আগে ছোকরাটি বাড়ীর দরজার কাছেই বসিয়া পড়িল। দেখিয়া মনে হইল সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। খানিক থামিয়া সে আমার মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, 'আচ্ছা বলতে পারেন মশাই, মোহিনী বলে' কোনও মেয়ে আপনাদের পাড়ায় কারও বাড়ীতে কখনও কাজ করেছিল?'

'কেন বলুন দেখি?'

ছোকরাটি আবার মুখ তুলিয়া বলিল, 'আপনি ব্রাহ্মণ ?'

'হ্যাঁ।'

হাত বাড়াইয়া সে আমার পায়ের ধূলা মাথায় ঠেকাইয়া বলিল, 'আমায় আপনি আপনি বলবেন না, আমি কুম্ভকার।'

হঠাৎ মনে পড়িল, মোহিনীও বলে, সে জাত-কোমরের মেয়ে।

'মোহিনী কি তোমার আত্মীয়া হয় ?'

সে যাহা বলিল তাহাতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলাম।

মোহিনী এতদিন ধরিয়া যাহা বলিয়াছে মিথ্যা বলে নাই। বড়লোকের বাড়ী বিবাহও তাহার হইয়াছিল সত্য, দাসদাসী খাটাইয়া একদিন সে সুখে বাস করিয়াছে তাহাও মিথ্যা নয়। কিন্তু তাহার এত সুখেও বিধাতা বাধ সাধিয়াছে। মোহিনীকে কোনও কথা না জানাইয়াই স্বামী তাহার আবার আর-একটি সুন্দরী মেয়ে বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়াছিল। সে আজ প্রায় সতেরো-আঠারো বছর আগেকার কথা। ব্যস্, সেই যে মোহিনী অভিমান করিয়া সব-কিছু ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছে আর কোনদিন সেখানে ফিরিয়া যায় নাই। আজ এই এতদিন পরে—ছোট যে দেওরটিকে সে তাহার কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল, আজ সে বড় হইয়া সন্ধান করিয়া করিয়া তাহার সেই ভ্রাতৃবধূর অভিমান ভাঙাইতে আসিয়াছে।

বলিলাম, 'চল। আজ কয়েকদিন থেকে তার জ্বর হয়েছে বোধহয়।'

ছোকরাটিকে লইয়া সেই হিন্দুস্থানী বস্তিতে গিয়া হাজির হইলাম। দরজার কাছে কয়েকজন হিন্দুস্থানী বসিয়া বসিয়া জটলা করিতেছিল। আমরা মোহিনীর সন্ধানে গিয়াছি শুনিয়াই তাহারা মারমূর্তি হইয়া আমাদের যেন মারিতে আসিল।—বলিল, 'মোহিনী তোমাদের নিজের লোক বাবু, আর এতদিন পরে আজ এসেছ তার খবর নিতে ?'

তাহার পর যে সংবাদ শুনিলাম, সে মর্মান্তিক সংবাদ যেন না শুনিলেই ভাল হইত। শুনিলাম, কাল রাত্রে সে নাকি একাকিনী তাহার ওই কুঁড়ে ঘরটির মাঝখানে মরিয়া কাঠ হইয়া পড়িয়াছিল, এই সব হিন্দুস্থানী প্রতিবেশীরাই দয়া করিয়া শ্মশানে গিয়া তাহার সেই হাড় কয়খানার সদ্গতি করিয়া দিয়া আসিয়াছে।